হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

১৩

সম্পাদনা
গীতা দত্ত
সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সুচিপত্র :

ছত্রপতির ছোরা

॥ এক ॥

সুন্দরবাবুর শাস্তিভোগ

—'আজ সাত দিন আপনার দেখা নেই। আজ সাত দিন চায়ের আসরে আপনার আসন খালি পড়ে আছে! সুন্দরবাবু, এজন্যে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।'

—'কী শাস্তি দিতে চাও জয়ন্ত?'

—'সুকঠোর শাস্তি! আজ একাসনে বসে গলাধঃকরণ করতে হবে সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট আর সাতটা এগ-পোচ!'

—'ওঃ! তাহলে তো সুন্দরবাবু আনন্দের সপ্তমস্বর্গে আরোহণ করবেন! ভারী শাস্তি দিতে চাও তো জয়ন্ত!' মানিক বললে হাসতে হাসতে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের ছেঁড়া কথায় কান পেতো না জয়ন্ত! তোমার শাস্তি যে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দ্যাখো, দস্তুরমতো ম্লানমুখে আর দুঃখিত ভাবেই ওই শাস্তি আমি গ্রহণ করব। আনন্দিত হব কী, মুখ টিপে একটুখানি হাসব না পর্যন্ত।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে চেয়ারে বসে পড়ুন। শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হোন।'

—'হুম! আমি প্রস্তুত।'

—'এত দিন আসেননি কেন?'

—'পরে বলব। আগে শাস্তি দাও। সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট, সাতটা এগ-টোস্ট। উঃ, কল্পনাতীত শাস্তি!'

মিনিট সাতেকের মধ্যে সাত-সাতখানা করে টোস্ট আর এগ-পোচ বদনবিবরের মধ্যে নস্যাৎ করে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবারে তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সপ্তপেয়ালা চায়ের সদ্ব্যবহার করব। কী জানতে চাও জয়ন্ত?'

—'এতদিন কী করছিলেন?'

—'তদন্ত।'

—'নতুন মামলা বুঝি?'

—'হুঁ। এমন মামলা যে সামলানো দায়।'

—'কী রকম?'

—'খুনের মামলা কিন্তু একেবারে সূত্রহীন—অর্থাৎ খুনি কুত্রাপি সূত্র-টুত্র কিছুই রেখে যায় নি। অগাধ জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছি ভায়া!'

—'মামলাটার বিবরণ শুনতে পাই না?'

—'শুনবে বইকি, শুনবে বইকি! শোনাবার জন্যেই তো আমার শুভাগমন। আচ্ছা, একটু সবুর করো। আর মোটে দু-পেয়ালা চা বাকি আছে। রোসো, এক এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে দি। হুম, এখন তোমার মত কী মানিক? আমি কি রীতিমতো হর্ষহীন বিমর্ষ মুখে জয়ন্তের দেওয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করলুম না? আমি কি একবারও হেসেছি—একবারও আনন্দ প্রকাশ করেছি? অতএব সাবধান, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না।'

মানিক বললে, 'আজ একটা ব্যাপার আপনি প্রমাণ করলেন বটে।'

—'কী?'

—'পুলিশ কেবল জবরদস্তি করতেই জানে না, খাসা অভিনয় করতেও জানে।'

—'অভিনয়?'

—'হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণির অভিনয়। আপনি ইচ্ছা করলে শিশির ভাদুড়ির অন্নও মারতে পারেন।'

—'জয়ন্ত, তোমার স্যাঙাতটি হচ্ছে অতিশয় হাড়-ঢেঁটা। ও আমাকে আবার নতুন দিক দিয়ে আক্রমণ করতে চায়। এবার কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করব।'

মানিক কৃত্রিম অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'দোহাই সুন্দরবাবু, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—আপনি দয়া করে একটিবার ক্রুদ্ধ হোন!'

সুন্দরবাবু থতোমতো খেয়ে বললেন, 'মানে?'

—'মানে হচ্ছে এই। আপনি ক্রুদ্ধ হলেই আপনাকে নিয়ে বেশি মজা করা যায়।'

—'আমাকে নিয়ে মজা?'

—'হ্যাঁ দাদা!'

—'আমাকে নিয়ে মজা করতে চাও?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'তাহলে আমি কিছুতেই ক্রুদ্ধ হব না।'

—'তবে হাস্য করুন।'

—'না, আমি আর ক্ষুব্ধ কি ক্রুদ্ধও হব না, হাস্যও করব না।'

—'তবে মুখটি বুজে চুপটি করে বসে থাকুন।'

—'না, আমি মুখটি বুজে চুপটি করে বসেও থাকব না। আমি এখন জয়ন্তের কাছে আমার মামলার কথা বলব।'

মানিক নাচার ভাবে বললে, 'তথাস্তু।'

॥ দুই ॥

হত্যানাট্যের পাত্র-পাত্রী

সুন্দরবাবু বললেন! 'জয়ন্ত তুমি বসন্তপুরের স্বর্গীয় জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনেছ?'

—'শুনেছি। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।'

—'হ্যাঁ তাঁর দুই পুত্র—হীরেন্দ্রনারায়ণ, দীনেন্দ্রনারায়ণ। এক কন্যা সৌদামিনীদেবী। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরেন্দ্র চিরকুমার, কনিষ্ঠ দীনেন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই বিপত্নীক হয়ে এক পুত্র রেখে মারা পড়েন, ছেলেটির নাম দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নানাদিক দিয়ে গুণী হয়েও অত্যন্ত একরোখা ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হত না। ব্যাপার ক্রমে এমন চরমে ওঠে যে, হীরেন্দ্র আর দীনেন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যান। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন কন্যা সৌদামিনীদেবীকে। সৌদামিনীর বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে মারা পড়েন। তারপর জননী হবার আগেই বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই সৌদামিনী হন বিধবা।'

জয়ন্ত বললে, 'এ যে দেখছি দুর্ভাগ্যের ইতিহাস!'

—'হ্যাঁ, এর সমাপ্তিও বিয়োগান্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের একখানা অট্টালিকা আছে। বিধবা হবার পর থেকে সৌদামিনী সেইখানেই বাস করে আসছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে মাসিক হাজার টাকা করে সাহায্য পেতেন। তিনি মাঝে মাঝে ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করেও যেতেন। কনিষ্ঠ দীনেন্দ্রের পুত্র দ্বিজেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর পিতামহের বাড়িতেই বাস করেন, বলা বাহুল্য যে সৌদামিনীর ইচ্ছানুসারেই। সৌদামিনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই ভ্রাতুষ্পুত্রই। এখন আমার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক কী শোনো: আজ আট দিন হল, সৌদামিনীদেবী হঠাৎ মারা পড়েছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অপঘাত-মৃত্যু।'

—'হত্যাকাণ্ড?'

—'হ্যাঁ! একদিন সকালে দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে সৌদামিনীর মৃতদেহ—বক্ষে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। হত্যাকারী যে কে, ধরবার কোনও উপায়ই নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমি একটিমাত্র সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি। কেবল এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, হত্যাকারী বাড়ির বাইরে থেকে আসেনি।'

—'এমন আন্দাজের কারণ?'

সৌদামিনীর শয়নগৃহের প্রত্যেক জানালা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের দরজা রাত্রে অর্গলবদ্ধ থাকত না বটে, কিন্তু সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হলে আরও দুটি এমন ঘরের ভিতর দিয়ে আসতে হয়, যার প্রত্যেকটিতেই থাকে অন্য অন্য লোক।'

—'আপনি কি সন্দেহ করেন, বাড়ির লোকই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী?'

—'বাড়ির সব লোককেই প্রশ্ন করে বুঝেছি, তারা প্রত্যেকেই সন্দেহের অতীত।'

—'বাড়ির লোকদের কথা বলুন।'

—'প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও সৌদামিনী একান্ত সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করতেন। প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে বাসিন্দা আছে মাত্র গুটিকয়। তিন মহলা বাড়ি। প্রথম দুটো মহল একরকম তালাবন্ধ থাকে বললেই চলে। একটিমাত্র মহলই ব্যবহার করতেন সৌদামিনী। যে-ঘরের ভিতর দিয়ে সৌদামিনীর ঘরে ঢোকা যায়, সেখানে থাকে তাঁর নিজস্ব পুরাতন দাসী। বয়স পঞ্চান্ন, নাম উমাতারা। সে সাধারণ দাসী নয়, গরিব কায়স্থের মেয়ে, বিধবা। ঘটনার দিন সে পাড়ার এক বিয়ে বাড়িতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রাত একটার সময়ে ফিরে আসে। সৌদামিনীদেবী তখন জীবিত ছিলেন কি না সে বলতে পারে না, কারণ নিজের ঘরে ফিরে এসেই সে শোয় আর ঘুমিয়ে পড়ে। সেই-ই সকালে উঠে প্রথমে সৌদামিনীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

তার ঘরের দরজা দিয়েই আসা যায়, পবিত্রবাবুর ঘরে। তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর—এই পরিবারের কাজ করছেন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। এখন নায়েবের পদে মোতায়েন। একরকম ঘরেরই লোক আর অত্যন্ত বিশ্বাসী। নিঃসন্তান। সহধর্মিনী সুরবালার সঙ্গে এই বাড়িতেই বাস করেন। কথায়-বার্তায় হাব-ভাব-ব্যবহারে অতিশয় অমায়িক। তিনিও পাড়ার ওই বাড়িতে গিয়ে খানিকক্ষণ থিয়েটার দেখে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। সুরবালার বয়স বিয়াল্লিশ। তিনি হাঁপানি রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। ঘটনার দিন বাড়িতেই ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘরের পাশেই একখানা ছোট্ট ঘর। সেখানে থাকে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী। বিধবা। রান্নাবান্নার ভার তার উপরেই। নাম বিন্দুবালা। সঙ্গে থাকে তার অবিবাহিতা কন্যা সিন্ধুবালা। বয়েস পনেরো। রান্নাঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে।

মহলের একদিকে তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। বয়স পঁচিশ। সুশিক্ষিত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছে। কাব্যব্যাধিগ্রস্ত, মাসিকপত্রে কবিতা লেখে। খবর নিয়ে জেনেছি সচ্চরিত্র। স্বভাব কিঞ্চিৎ রোমান্টিক। মাসে দুশো টাকা হাত-খরচা পায়। পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

বাকি রইল আর একজনের কথা। নাম তার মানসী। বয়স বিশ বৎসর। পরমাসুন্দরী। সুমধুর প্রকৃতি। সুশিক্ষিতা। সৌদামিনীর স্বামীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে একান্ত অসহায় হয়ে পড়াতে সৌদামিনী তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আজ দুই বৎসর সে এখানে বাস করছে। উঠতে-বসতে তাকে ছাড়া সৌদামিনীর একদণ্ডও চলে না। আগে নায়েব পবিত্রবাবুই ছিলেন সৌদামিনীর ডানহাতের মতন, মানসী আসবার পর থেকেই তাঁর প্রভুত্ব ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পবিত্রবাবুর কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, এজন্যে তিনি মনে মনে মানসীর উপরে বিশেষ খুশি নন। তা এটা স্বাভাবিক।

বাড়ির ভিতরে বাস করে এই কয়জন লোক। আর আছে দুজন দারোয়ান, তিনজন বেয়ারা, দুজন মালি, সকলেই পরীক্ষিত, পুরাতন লোক। তারা রাত্রে বাড়ির ভিতরেও থাকে না। তাদের জন্যে বাড়ির বাইরে, বাগানের ভিতর আলাদা ঘর আছে। আর তারা কীসের লোভে নরহত্যা করবে? সৌদামিনীর ঘর থেকে মূল্যবান কোনও জিনিসই চুরি যায়নি। একজন ঠিকে ঝি আছে, বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যায়।

যে-সব বাড়ির লোকের কথা বললুম, সৌদামিনীর জীবনের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত। সৌদামিনী বেঁচে থাকলেই লাভ। সৌদামিনীর মৃত্যুর পর তাদের চাকরি যাবার সম্ভাবনা। সম্পত্তি পেয়ে দ্বিজেন কী করবে না করবে, কে বলতে পারে? মানসী চাকরি করে না বটে, কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুর পর আবার তার অবস্থা হয়েছে অসহায়। সে দ্বিজেনের কেউ নয়! দ্বিজেন তার ভার গ্রহণ করবে কি না সন্দেহ!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুতে দ্বিজেন কি লাভবান হবে না?'

—'মানিক, অপরাধীদের নিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, দুষ্ট লোক কি আমার চোখে ধুলো দিতে পারে? অপরাধীদের টাইপই আলাদা। দ্বিজেনের সম্বন্ধে নানা জনের কাছ থেকে খবরাখবর দিয়ে আমি তার কোনও দোষই আবিষ্কার করতে পারিনি। বিশেষ দ্বিজেনের মুখের উপরেই আছে তার মনের উজ্জ্বল পরিচয়। এমন শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'সৌদামিনীর দাদা হীরেন্দ্রনারায়ণ কী রকম লোক?'

'খোঁজ নিয়েছি। সুবিধের লোক নয়, মাতাল, জুয়াড়ি। একা থাকে, অথচ হাজার টাকা মাসোহারা পেয়েও নিজের খরচ কুলোতে পারে না। সৌদামিনীর মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগেও সে বোনের কাছে আরও টাকা চাইতে এসেছিল, কিন্তু টাকা পায়নি। তাই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। হীরেন রাগ করে চলে যায়। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ করবার উপায় নেই।'

—'কেন?'

—'প্রথমত, খুনি বাইরে থেকে এসেছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ভগ্নীহত্যা করে হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে যাবে কেন? সৌদামিনীর মৃত্যুতে সঙ্গে সঙ্গেই তার হাজার টাকা মাসোহারা বন্ধ হবার সম্ভাবনা।'

—'এখন সৌদামিনী সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন।'

—'পারি। মৃত্যুকালে সৌদামিনীর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। একহারা শুকনো চেহারা, কিন্তু খুব শক্ত। আরও পনেরো-বিশ বছর অনায়াসে যমকে কলা দেখাতে পারতেন। বাপের মতন তিনিও ছিলেন বিষম একরোখা, কোপন-প্রকৃতি। ভালো-মন্দ যা-কিছু স্থির করতেন, তার আর নড়চড় হবার জো ছিল না। বাড়ির লোকের কারুর তুচ্ছ ত্রুটিবিচ্যুতিও সহ্য করতে পারতেন না, একেবারে আগুন হয়ে উঠতেন। তার উপরে ছিলেন বেজায় রাশভারী

মানুষ, মানসী আর পবিত্রবাবু ছাড়া আর কেউ সহজে তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। বাড়ির প্রত্যেকেই তাঁকে ভয় করত, কেউ ভালোবাসত বলে মনে হয় না।'

—'এতদিনে নিশ্চয়ই শব-ব্যবচ্ছেদ হয়েছে?'

'তা হয়েছে বই কি!'

'হত্যাকারী কী রকম অস্ত্র ব্যবহার করেছে?'

'ডাক্তারের মতে ছোরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে ছোরা-টোরা কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'পদচিহ্ন, আঙুলের ছাপ?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'ডাক্তারের মতে সৌদামিনী মারা পড়েছেন কখন?'

—'আন্দাজ রাত এগারোটা কি বারোটা।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, মামলাটা বেশ অসাধারণ। বুড়ি মেরে অকারণে কেউ খুনের দায়ে পড়তে চায় কেন?'

—'হুম, আমারও তো ওই প্রশ্ন!'

—'কিন্তু বুড়িকে নিশ্চয়ই কেউ অকারণে খুন করেনি। তলে তলে মস্ত একটা রহস্য আছে। আমি এইরকম রহস্যময় মামলাই পছন্দ করি।'

সুন্দরবাবু জোরে মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'আমি কিন্তু মোটেই পছন্দ করি না। সূত্রহীন মামলা ঘাড়ে পড়লে পুলিশকে কেবল নাকানি-চোবানি খেয়ে মরতে হয়।'

—'সূত্রহীন মামলা প্রমাণিত করে অপরাধীর চাতুর্য। কিন্তু কে বললে এ মামলাটা সূত্রহীন?'

—'সূত্র আছে কুত্র, দেখিয়ে দাও দেখি?'

—'সূত্র আছে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির ভিতরে।'

—'কী ছাই বলো! আজ ক-দিন ধরে বাড়ির ভিতরটা কি আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি? সেখানে সূত্রের নামগন্ধও নেই।'

—'তাহলে হত্যাকারী বাইরের লোক!'

—'অসম্ভব!'

—'দেখা যাক। আপনি এক কাজ করতে পারেন?'

—'বলো।'

—'বললেন, নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির দুটো মহলে কেউ বাস করে না। আমি আর মানিক ওই দুটো মহলের কোনও একটায় হপ্তাখানেক থাকতে পারি, এমন ব্যবস্থা কি হয় না?'

—'খুব সহজেই হয়। ধরতে গেলে দ্বিজেনই এখন বাড়ির মালিক! আমি প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই সে নারাজ হবে না।'

—'তবে তাই করুন।'

—'ওখানে গিয়ে থাকলেই কি সূত্র বেরিয়ে পড়বে মাটি ফুঁড়ে?'

—'মাটি ফুঁড়ে না বেরোক, মানুষের মন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তো? অপরাধী যদি বাড়ির ভিতরে থাকে তাহলে আমি তাকে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারব।'

॥ তিন ॥

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

কলকাতার উপকণ্ঠ বটে, কিন্তু জায়গাটার মধ্যে আছে পল্লিগ্রামের ছাপ।

মাঠের পর মাঠ সবুজ, মাঝে মাঝে তাল-নারিকেল কুঞ্জ, বড়ো বড়ো বনস্পতির ভিড়। একদিকে কালীঘাট থেকে এগিয়ে এসেছে আদিগঙ্গার একটি শীর্ণ ধারা। তার ঝির ঝিরে জলে ঝিক মিক করছে সূর্যকরচূর্ণ! অনেক দূরে দূরে দেখা যায় এক একখানা বাড়ি। তারা মনের ভিতরে মনুষ্য-বসতির স্মৃতি জাগায় বটে, কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে না নিরালা শ্যামল পল্লিশ্রী।

জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, দিনের বেলায় এমন জায়গায় ওই ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলিকে দেখতে খুব শান্ত, খুব সুন্দর। কবি আর শিল্পীরা নাকি ওই রকম সব বাড়িতেই বাস করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এমনি নিরালা, নির্জন, অন্ধকার গভীর রাত্রে ওই বাড়িগুলো শহরের যে-কোনও বাড়ির চেয়ে ভয়াবহ আর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

—'এ কথা কেন বলছ?'

—'এই রকম সব বাড়িতেই বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আর সুবিধা থাকে বেশি। এ-সব জায়গায় অপরাধীরা যথেষ্ট অসঙ্কোচে কাজ করতে পারে। তাই এমন সব বাড়ি দেখলে আমার মনে কবিত্ব জাগে না, জাগে আতঙ্ক।'

মানিক হেসে বললে, 'অপরাধ-তত্ত্ব ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার মনের গড়ন বদলে যাচ্ছে।'

—'হয়তো তাই মানিক, হয়তো তাই।'

একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, তার চারিধারে বাগান। ফটক দিয়ে জয়ন্তের মোটর বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে নরেন্দ্রনারায়ণের শহরতলির প্রাসাদ।'

মানিক বললে, 'এক সময়ে হয়তো এটা প্রাসাদই ছিল, কিন্তু এখন ওর মধ্যে প্রাসাদত্ব কিছুই নজরে পড়ে না। কত বৎসর সংস্কার হয়নি কে জানে! বাগানেও নেই বাগানত্ব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ, সৌদামিনীদেবী ও-সব বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। কেবল যে

মহলে নিজে বাস করতেন, একটু-আধটু নজর দিতেন তার দিকেই। ওই যে, আমাদের মোটরের শব্দ পেয়ে দ্বিজেন নিজেই নীচে নেমে এসেছে।'

গাড়ি এসে থামল গাড়িবারান্দার তলায়। একটি তরুণ যুবক এসে নমস্কার করে বললে, 'সুন্দরবাবু, এঁরাই কি দয়া করে আমাদের এখানে অতিথি হবেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এঁদেরই নাম জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু। জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়।'

দ্বিজেন্দ্র বললে, 'দুনিয়ার ভালো-মন্দ কিছুই ব্যর্থ হয় না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যেই এঁদের মতন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য অর্জন করলুম।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমি হয়তো আবার এখানকার কারুর না কারুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াব!'

দ্বিজেনের মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি সে হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসিটা ভালো করে জমল না।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'দ্বিজেনবাবু, আমার বন্ধুরা ঠাঁই পাবেন কোন মহলে?'

দ্বিজেন বললে, 'সদর মহলে। ঠাকুরদাদার আমলে এখানে অনেক অতিথি-অভ্যাগতদের আগমন হত। অনেকেই পাঁচ-দশ দিন থেকে যেতেন, তাঁদের জন্যে যে ঘরগুলো নির্দিষ্ট ছিল, তারই দু-খানা ঘর, ওঁদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। একেবারে সেইখানেই চলুন।'

গোড়া থেকেই জয়ন্ত লক্ষ করছিল দ্বিজেনের চেহারা, ভাবভঙ্গি ও সাজসজ্জা। সুন্দর সুমিষ্ট মুখশ্রী, ছিপছিপে সুগঠিত দেহ, পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জায় শৌখিনতা নেই, আছে রুচির পরিচয়। মৌখিকভাবে শিশুসুলভ সরলতা থাকলেও চিন্তাশীলতার অভাব নেই। কণ্ঠস্বর মার্জিত। অপরাধীদের মধ্যে এ-শ্রেণির লোক দেখা যায় না।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা বিশেষত্ব আকৃষ্ট করলে জয়ন্তের দৃষ্টিকে। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গি কেমন সঙ্কুচিত এবং তার চক্ষে কেমন একটা সন্দেহের ছাপ। জয়ন্তের মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল—কেন, কেন, কেন?

দ্বিজেনের সঙ্গে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান-শ্রেণি—তার পাশের দেওয়াল বড়ো বড়ো তৈলচিত্রে অলঙ্কৃত। বড়ো বড়ো হলঘর, দামি দামি ছবি, মস্ত মস্ত আয়না, পাথরের বা পিতলের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি, সোফা, কৌচ, গদিমোড়া চেয়ার, নানা আকারের টেবিল ও বিজলিবাতির ঝাড়া প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। ঐশ্বর্যের কোনও মালমশলার অভাব নেই, কিন্তু অনাদরে ও মার্জনার অভাবে সমস্তই যেন একান্ত শ্রীহীন বলে মনে হয়। যেখানে রয়েছে এমন সব মূল্যবান আসবাব, তাদেরই উপরে এবং আশেপাশে চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-ধূলি, মাকড়সার জাল এবং আরও যত কিছু মালিন্য ও কলঙ্ক।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সৌদামিনীদেবী পিতার সম্পত্তির মালিক হয়েও তার সদ্ব্যবহার করেননি কেন?'

দ্বিজেন বললে, 'বিধবা হবার পর থেকেই আমার পিসিমা সংসারের উপরে সমস্ত আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

—'কিন্তু আপনি আছেন তো?'

—'পিসিমা বলতেন, 'আমি বেঁচে থাকতে কেউ যেন আমার বাবার শখের জিনিসে হাত না দেয়।' তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যাবার সাহস ছিল না।'

—'অথচ আপনিই তাঁর উত্তরাধিকারী!'

দ্বিজেন শুষ্ক মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'না, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী নই।'

সচমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী।'

—'আমি আগে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর নই।'

—'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।'

দ্বিজেন ম্লান হাসি হেসে বললে, 'মৃত্যুর তিন দিন আগে পিসিমা এক নতুন উইল করে সমস্ত সম্পত্তি জ্যাঠামশাইকে দিয়ে গিয়েছেন।'

—'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এ কথা এতদিন আমাকে বলেননি কেন?'

—'আমি নিজেই সঠিক খবর জানতুম না। দিন-তিনেকের জন্যে আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম—নতুন উইল হয় সেই সময়ে আমার অজ্ঞাতসারেই। তারপর কাল আমাদের অ্যাটর্নিবাবু হরিদাস চৌধুরির মুখে এই খবরটা জানতে পেরেছি।'

—'তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন মারা পড়েন, তখনও আপনি এ খবর জানতেন না?'

—'না।'

সুন্দরবাবু নিজের মনে মনেই কী যেন ভেবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'আপনার জ্যাঠামশাই নতুন উইলের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন?'

—'না।'

—'কেন?'

—'শুনেছেন তো পিসিমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের টাকা নিয়ে মতান্তর হয়েছিল? তার দুই-এক দিন পরেই জ্যাঠামশাই কারুকে কিছু না জানিয়েই কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছেন; কবে ফিরবেন তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই নতুন উইল বা পিসিমার মৃত্যুর খবর এখনও তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়নি।'

—'আপনাদের অ্যাটর্নির ঠিকানা কী?'

দ্বিজেন ঠিকানা দিলে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ আসি জয়ন্ত! একটা জরুরি তদন্ত আছে! কাল আবার আসব।'

॥ চার ॥

কায়ার ছায়া

দু-খানি পাশাপাশি মাঝারি আকারের ঘর জয়ন্ত ও মানিকের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেক ঘরের দু-দিকেই বারান্দা—একটি ভিতরকার আঙিনার দিকে, আর একটি বাইরেকার বাগানের দিকে।

দ্বিজেন বললে, 'এ ঘর দু-খানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনারা অবাক হবেন না। এ দু-খানা আপনাদের বাসোপযোগী করে তোলবার ভার নিয়েছিলেন নায়েবমশাই নিজেই। আপনারা আসছেন শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কেন?'

—'নায়েবমশাইয়ের মতে সরকারি পুলিশ কোনোই কর্মের নয়। আপনারা একটু চেষ্টা করলেই নাকি খুনির ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না।'

—'আপনারা কি এ কথা বিশ্বাস করেন?'

—'করি।'

—'আপনার বিশ্বাস হয়তো ভ্রান্ত।'

—'না জয়ন্তবাবু, আপনার অদ্ভুত শক্তির কথা কে না জানে? অসাধারণ আপনার প্রতিভা! কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনাদের ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

—'হয়েছে।'

ঠিক এই সময়েই ঘরের ভিতরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা। শ্যাম বর্ণ। মিষ্ট স্মিত মুখ। সমুজ্জল দৃষ্টি। নিরহঙ্কার ভাবভঙ্গি। বয়স প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের সীমারেখায় এসে উপস্থিত হয়েছে বটে কিন্তু মাথার চুলে ও দাড়ি গোঁফে দেখা দেয়নি এখনও শুভ্রতার চিহ্ন।

তিনি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্বাগত জয়ন্তবাবু! স্বাগত মানিকবাবু! আমাদের কী সৌভাগ্য! নমস্কার, নমস্কার!'

জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করে বললে, 'আসুন পবিত্রবাবু!'

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনলেন আর আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

'মন্ত্রবলে নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি আপনি আমাদের উপস্থিতির খবর পেয়েছেন এইমাত্র।'

'কী আশ্চর্য! সত্যিই তাই!'

'আরও বুঝতে পারছি, খবর পেয়েই দুধের বাটি রেখে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছেন।'

দুই চক্ষু সভয়ে বিস্ফারিত করে পবিত্রবাবু বললেন, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! মশাই, আপনি যাদুকর!'

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, 'না মশাই, আমি একান্ত সাধারণ ব্যক্তি।'

—'না, না, আপনি অসাধারণ মানুষ, তৃতীয় নেত্রের অধিকারী।'

—'চোখ আমার দুটির বেশি নয়, তবে দুটো চোখকেই সর্বদা আমি সজাগ রাখি বটে। শুনুন তবে। আমি জানি এ বাড়িতে দুজন মাত্র ভদ্রলোক থাকেন—দ্বিজেনবাবু আর আপনি। কাজেই আপনিই যে পবিত্রবাবু, সেটা বোঝা একটুও কঠিন নয়।'

—'ঠিক, ঠিক! কিন্তু—'

—'আগে শুনুন। আমাদের দেখবার জন্যে আপনি আগ্রহান্বিত ছিলেন—নয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত! ধরতে গেলে আমি আপনার পথ চেয়েই বসেছিলুম।'

—'কে আপনাকে খবর দিলে যে আমরা এসেছি?'

—'বেয়ারা।'

—'তখন আপনি দুগ্ধপান করছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালে আমি চায়ের বদলে একটু গরম দুই খাই। কিন্তু কী আশ্চর্য আপনি—'

—'কিছুই আশ্চর্য নয়, আপনার গোঁফের ডগায় এখনও দুধের দাগ লেগে রয়েছে। এখানে আসবার আগ্রহ আপনার এত বেশি, আপনি মুখ ধোবার, দাগ মোছবার সময় পর্যন্ত পাননি। খুব তাড়াতাড়ি—প্রায় ছুটেই আপনি এসেছেন, কারণ ঢোকবার সময়ে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল দ্রুত। তাড়াতাড়ি—প্রায় দুটো মহল পার হতে হয়েছে, এই বয়সে একটু হাঁপাবেন বই কি!'

চমৎকৃতভাবে পবিত্রবাবু বললেন, 'রহস্যটা আপনি খুব সোজা করে আনলেন বটে, কিন্তু তবু বলব, অদ্ভুত! এক-মুহূর্তে এত বেশি দেখা আর ভাবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব! দেখছ তো দ্বিজেন, কত সহজে ইনি কত অজানা কথা জানতে পারেন! আপনার আগমনে আমরা ধন্য হলুম, ধন্য হলুম!'

—'ক্ষান্ত হোন পবিত্রবাবু, এত বেশি প্রশংসা-বাণে বিদ্ধ করলে আমরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ব।'

—'আপনাদের জন্যে চা আর জলখাবার আনতে বলে দি?'

—'না, ধন্যবাদ। ছোটো হাজারি বাড়িতেই সেরে এসেছি।'

—'দুপুরে কী-রকম খাবার খাবেন?'

—'আপনাদের যা খুশি। আমাদের এটা খাই না, ওটা খাই না বলার অভ্যাস নেই। যা পাই তাই খাই।'

—'বেশ, তাহলে আগে আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থাটাই করে আসি। তারপর আপনার

সঙ্গে প্রাণ খুলে ভালো করে আলাপ করব।' পবিত্রবাবু যেমন দ্রুতপদে এসেছিলেন, চলে গেলেন তেমনি দ্রুতপদেই।

জয়ন্ত একটা গোলটেবিলের সামনে বসে পড়ে সামনের আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'বসুন দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

জয়ন্তের কণ্ঠস্বর শুনে দ্বিজেন একটু বিস্মিতভাবে তাকালে তার মুখের পানে। তারপর টেবিলের ওধারের নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

দ্বিজেনের মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর কাছে আপনি বললেন, সৌদামিনীদেবী যে নতুন উইল করেছেন, তিনি মারা যাবার পরেও তার সঠিক খবর আপনার জানা ছিল না।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সঠিক খবর মানে নিশ্চিত খবর তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু অনিশ্চিত—অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোনও খবর কি আপনি পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন প্রথমটা ইতস্তত করে তারপর বললে, 'নিশ্চিত বা অনিশ্চিত কোনও খবরই আমি পাইনি। তবে নতুন উইল যে হতে পারে এটুকু আন্দাজ করেছিলুম।'

—'কেন? স্পষ্টাস্পষ্টি বলুন, কেন?'

অতিশয় অসহায়ের মতো দ্বিজেন নতমুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন, এটা বলে রাখা উচিত মনে করছি। একটু চেষ্টা করলেই অন্য উপায়ে আপনার গুপ্তকথা নিশ্চয়ই আমি জানতে পারব।'

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর নিতান্ত নাচারের মতো দ্বিজেন বললে, 'ব্যাপারটা একেবারেই ঘরোয়া। এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্কই আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন না।'

—'তবু আমি শুনতে চাই।'

দ্বিজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ, শুনুন। সুন্দরবাবুর মুখে মানসীর পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ। শুনেছি তিনি সুরূপা আর সুশিক্ষিতা।'

—'কিন্তু ও তো তার বাইরের পরিচয়। মানসীর মনের পরিচয় পেলে আপনি তাকে দেবী বলে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না।'

—'বেশ মানলুম।'

—'মানসী আজ দুই বৎসর আমাদের এখানে বাস করছে। পিসিমাকে দেখাশোনা করবার সমস্ত ভারই থাকত তার উপরে। কিন্তু সত্যকথা বলতে কী, বাড়ির সবাই জানে

পিসিমার প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, মুখ ছিল অতিশয় তিক্ত। অনাথা মানসীকে কেবল আশ্রয় দিয়েই তিনি তাঁর উচ্চমনের পরিচয় দেননি, মানসীর ভবিষ্যতের সম্বলের জন্য পুরাতন উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর কটু কথায় রূঢ় ব্যবহারে মানসীকে বড়োই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হত—এমনকি প্রায়ই সে গোপনে না কেঁদেও থাকতে পারত না। এ বাড়িতে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার লোকও আর কেউ ছিল না। দু-দিনের মধ্যেই সে পিসিমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এজন্যে সবাই তাকে হিংসা করত। নায়েবমশাইয়ের মতো অমায়িক লোকও নিজের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ন হওয়াতে তার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। সে সহানুভূতি পেত কেবল আমার কাছ থেকেই। সে নিজের মন খোলবার আর সান্ত্বনার কথা শোনবার সুযোগ লাভ করত।

'আমারও অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন তো? ছেলেবেলাতেই হারিয়েছি পিতামাতাকে। সংসারে আত্মীয় বলতে জেনেছি কেবল পিসিমাকেই। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসতেন তাঁর নিজের প্রকৃতি অনুসারেই—যা নয় মোহনীয়, নয় সহনীয়। কখনও শুনিনি তাঁর মুখ থেকে আদরের কথা। আমিও সন্তর্পণে তাঁর কাছ থেকে থাকতুম দূরে দূরে। এ সংসারে আমার মনের মানুষ বলতে কেউ ছিল না—আমি সাবালক হয়ে উঠেছি দাসদাসী-কর্মচারীদের প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যেই। আমার অভাব-অভিযোগ শুনতেন কেবল নায়েবমশাই-ই। তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবীও আমাকে ভালোবাসেন, যত্ন করেন। ছেলেবেলায় তাঁর কোলে চড়েছি বলেও স্মরণ হয়। কিন্তু তাঁরাও কেউ আমার আত্মীয় নন।

'অনাথা মানসী আর অনাদৃত আমি—আমরা দুজনেই যে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হব, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দুজনের মন বুঝতুম কেবল আমরা দুজনেই। নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতুম সুবিধা পেলেই। ক্রমে আমাদের সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যে আমরা স্থির করলুম, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। জয়ন্তবাবু, এইখান থেকে আমাদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

'পিসিমার কাছে যেদিন আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, তিনি বিষম রাগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'এ বিবাহ হতে পারে না, হতে পারে না, হতে পারে না!'

'আমি যত বোঝাই, তিনি তত বেঁকে দাঁড়ান। এইটেই ছিল তাঁর চিরকেলে স্বভাব—তাঁর সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। কেবল তাঁর কেন, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই নাকি প্রকাশ করেছেন ওই-রকম স্বভাব। হয়তো ওটা আমাদেরই রক্তের গুণ বা দোষ। কাজেই আমিও বংশ ছাড়া নই। পিসিমা যত বেঁকে দাঁড়ান, আমার সংকল্প তত দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'পিসিমার আপত্তির প্রধান কারণ—মানসী অনাথা, গরিব, বংশগৌরব থেকে বঞ্চিত—

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। সেই সেকেলে যুক্তি—খাপ খায় না যা নব্যযুগের সাম্যবাদের সঙ্গে। আমি বললুম, 'ও যুক্তি আমি মানি না, মানসী ছাড়া আর কারুকে বিবাহ করব না!'

পিসিমা বললেন, 'তাহলে তোমাকে আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব।' আমি বললুম, 'তাই সই', তার কয়েকদিন পরেই পিসিমার মৃত্যু।

'জয়ন্তবাবু, আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যে নতুন উইল হবার সম্ভাবনা আছে, এটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম কি না? তা পেরেছিলুম বইকি! পিসিমা ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ; যা ধরতেন, তা আর ছাড়তেন না। আপনি আর কিছু জানতে চান?'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, 'আপাতত আর কিছু জানতে চাই না। হ্যাঁ, একটা কথা। মানসীদেবী কি পর্দানসীন মহিলা?'

—'মানে?'

—'তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা আর বাক্যালাপ করতে পারবেন?'

—'অনায়াসে। কিন্তু মানসীর সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে না দিলেও চলবে।'

—'সে বেচারির সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'সে-বিচার করব আমি। জানেন দ্বিজেনবাবু, গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সকলকেই সন্দেহ করা। আপনাদের দাস-দাসী দারোয়ানরা পর্যন্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়।'

দ্বিজেন চেয়ার ত্যাগ করে বললে, 'বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। মানসীকে কি এখনই পাঠিয়ে দেব এখানে?'

—'না। আজ আপনার মুখে যা শুনলুম আগে তাই পরিপাক করি। মানসীদেবীর সঙ্গে আলাপ করব কাল সকালে।'

দ্বিজেন নমস্কার করে চলে গেল। তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

মানিক বললে, 'ভাই জয়ন্ত, এতদিনেও সুন্দরবাবু যা করতে পারেননি, তুমি একবেলাতেই তা পেরেছ।'

—'কী রকম?'

—'অন্ধকার ভেদ করে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছ।'

—'পেরেছি কি? আমার তো তা মনে হয় না। এই তো সবে গৌরচন্দ্রিকা, আসল উপন্যাস এখনও শুরুই হয়নি।'

—'কিন্তু তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ।'

—'কী আবিষ্কার?'

—'এতদিন হত্যাকাণ্ডটা ছিল উদ্দেশ্যহীন। এইবারে উদ্দেশ্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।'

—'যথা?'

—'ঠিক স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে সন্দেহ হচ্ছে যেন, ওই নতুন উইলের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের একটা যোগাযোগ আছে।'

—'হয়তো আছে। হয়তো নেই। আমার পরিকল্পনা এখনও কোনও নির্দিষ্ট আকার পায়নি।'

—'মানুষ হিসাবে দ্বিজেন সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারলে?'

—'এক আঁচড়েই মানুষ চেনা যায় না ভাই! মোটামুটি দ্বিজেনকে আমার ভালোই লাগল। সরল, উদার, ভদ্র। যে স্বীকারোক্তি করলে তার মধ্যে কোনও মারপ্যাঁচ নেই। কিন্তু আমি এখন ভাবছি আর একটা কথা। ওই জানলাটার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে গোপনে কে এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিল?'

মানিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি? পুরুষ, না স্ত্রীলোক?'

—'তা বোঝা গেল না। পর্দাটা পুরু আর গাঢ় রঙের। কিন্তু বাইরের আলো আর জানলার পর্দার মাঝখানে আমি কোনও মানুষের স্পষ্ট ছায়া দেখেছি। দ্বিজেনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াটাও সরে গেল। কার কায়া থেকে এই ছায়ার জন্ম? আমি জানতে চাই, আমি জানতে চাই!'

॥ পাঁচ ॥

ছত্রপতির ছোরা

পরদিন। প্রভাতি চায়ের আসর। জয়ন্ত আছে, মানিক আছে, আর আছেন সুন্দরবাবু আর পবিত্রবাবু। দ্বিজেনও হয়তো সেখানে হাজির থাকত, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়েছে কোনও জরুরি কাজে।

কথায় কথায় পবিত্রবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরি দেখেছেন?'

—'না।'

—'আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন?'

—'অত্যন্ত!'

—'রাজার লাইব্রেরিতে অনেক দামি দামি কেতাব আছে। মস্ত লাইব্রেরি। দেখবেন তো চলুন।'

—'চলুন।'

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধেৎ, লাইব্রেরি দেখে লাভ? এখন কেউ যদি খুনিকে দেখাতে পারে তবেই আমি খুশি হই।'

পবিত্রবাবু হেসে বললেন, 'খুনিকে দেখাবার ভার তো আপনাদেরই উপরে!'

লাইব্রেরিঘরটা প্রকাণ্ড। তার চারিদিকেরই দেওয়ালের অনেকখানি পর্যন্ত ঢেকে দাঁড় করানো আছে সারি সারি আলমারি এবং আলমারির থাকগুলো রোগা আর মোটা কেতাবে কেতাবে ঠাসা।

জয়ন্ত বইগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি এখানে কোনও হালের বই নেই।'

পবিত্রবাবু বললেন, 'রাজার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই লাইব্রেরির জন্যে বই কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়, আমিই তখন এ বাড়িতে আসিনি।'

ঘরের মাঝখানে রয়েছে লম্বা একটা কাচের ডালাওয়ালা কাষ্ঠাধার। সেইদিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত শুধোলে, 'ওটা কী?'

—'শো-কেস।'

—'কী আছে ওর মধ্যে?'

—'সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার শখ ছিল রাজার। ওর মধ্যে সেইগুলোই সাজানো আছে।'

—'বড়ো চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ তো!' জয়ন্ত কৌতূহলী হয়ে কাষ্ঠাধারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের হরেক-রকম অস্ত্র—ধনুক-তির, তরবারি, ছোরা-ছুরি, খড়্গ, কুঠার ও বর্শা প্রভৃতি আরও কত কী! প্রত্যেক অস্ত্রের গায়ে তেরঙা গোলাপি ফিতার সঙ্গে সংলগ্ন এক-একখানা কার্ড—তার উপরে দুই-এক লাইনে লেখা অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জয়ন্ত লক্ষ করলে, এক জায়গায় ফিতায় সংলগ্ন কার্ডের উপরে লেখা রয়েছে—'ছত্রপতির ছোরা', কিন্তু তার সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। সে পবিত্রবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট করলে।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন পবিত্রবাবু। বিস্ফারিত চক্ষে সবিস্ময়ে বললেন, 'এ কী ব্যাপার। বাড়িতে হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও যে ছোরাখানাকে দেখেছি যথাস্থানে! কোথায় গেল সেখানা? কে চুরি করলে?'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ছত্রপতির ছোরা ব্যাপারটা কী?'

—'ছত্রপতি শিবাজি নাকি ছোরাখানা ব্যবহার করতেন। তাই ওই নাম।'

এতক্ষণে সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হুম, হুম! বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক! আপনি ঠিক বলছেন, হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও ছোরাখানা এইখানেই ছিল?'

পবিত্রবাবু বললেন, 'তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আমার বেশ মনে আছে। সৌদামিনীদেবীর হুকুম ছিল, তাঁর পিতার বহু যত্নে সংগ্রহ করা বইগুলি যেন কীটপতঙ্গের অত্যাচারে নষ্ট না হয়ে যায়, বেয়ারাদের সাহায্যে আমি যেন হপ্তায় একবার করে লাইব্রেরিঘর পরিষ্কার করি। দেখছেন না, এ মহলের অন্যান্য ঘরের মতো এ ঘরখানাও দুর্দশাগ্রস্ত নয়?'

'হুম! তোমার মত কী জয়ন্ত?'

—'আমারও ওই মত। ছোরা চুরি যাওয়া সন্দেহজনক।'

—'সৌদামিনীদেবী মারাও পড়েছেন ছোরার আঘাতেই।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। বাইরের কোনও চোর এ ছোরা চুরি করেনি।'

পবিত্রবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'আপনারা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করতে পারে কে? আর কেনই বা করবে? আমরা যে সকলেই তাঁর আশ্রিত। যে ডালে বসে সে ডাল কেউ কাটে? না জয়ন্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন—আমার মাথা ঘুরছে, আমার পা অবশ হয়ে আসছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি চললুম—আমি চললুম!' মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত করুণভাবে দুইবার মাথা নাড়লে। সুন্দরবাবুর মুখও অত্যন্ত গম্ভীর।

মানিক বললে, 'এতদিন পরে পাওয়া গেল একটা নিরেট প্রমাণ। অপরাধী তাহলে এই বাড়ির ভিতরেই আছে। চলো জয়ন্ত, আমাদের ঘরে গিয়ে বসি।'

ঘরে ফিরে এসে তিনজনেই খানিকক্ষণ বসে রইল বোবার মতো।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। বললেন, 'আমার কী বিশ্বাস জানো জয়ন্ত?'

—'বলুন।'

—'আসল হত্যাকারী বাড়ির লোক না হতেও পারে।'

—'এমন কথা কেন বলছেন?'

—'আসল হত্যাকারী হয়তো বাইরে থেকেই এসেছে, কিন্তু তাকে সাহায্য করেছে বাড়ির কোনও লোক।'

—'বুঝেছি। আপনি বোধ হয়, আসল হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন হীরেন্দ্রনারায়ণকেই?'

—'তাছাড়া আর কে? সে লোক ভালো নয়, হত্যাকাণ্ডের সাত দিন আগে টাকার জন্যে সে সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। সে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। আমার তো তার উপরেই সন্দেহ হয়। বাড়ির কোনও লোক যে-কারণেই হোক তাকে সাহায্য করেছে। রাত্রে গোপনে দরজা খুলে দিয়েছে। অস্ত্র পাওয়া যাবে কোন ঘরে হীরেন তা জানত। 'ছত্রপতির ছোরা'র দ্বারা কাজ হাসিল করে এখন সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান সঠিক হলে বলতে হবে যে, হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। সে তখনও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সৌদামিনীদেবী তাকেই দান করেছেন সমস্ত সম্পত্তি!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়।'

সুন্দরবাবু উৎসাহিত হয়ে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তাহলে এখন আমি উঠলুম ভাই! দেখা যাক এই নতুন সূত্রটা ধরে কতদূর অগ্রসর হতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'আর আমরাও দেখি বাড়ির ভিতরে হীরেনের কোনও সহকারীকে আবিষ্কার করতে পারি কি না!'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ। সে বললে, 'বাবুজি, দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!'

—'কে দিদিমণি? মানসীদেবী?'

—'আজ্ঞে।'

—'তাঁকে আসতে বলো।'

ভৃত্যের প্রস্থান। অনতিবিলম্বে মানসীর প্রবেশ।

রূপসী বটে! চোখ-ভুরু-নাক যেন সুপটু শিল্পীর লিখন। রং যেন গোলাপি স্বপ্ন। দেহের গঠন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ। কে বলবে একে দরিদ্র, অনাথা, বংশগৌরবহীনা? ভাবভঙ্গির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে পরম আভিজাত্য! মহিমময়ী!

জয়ন্ত এতটা আশা করেনি। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

মানসী বললে, 'আমাকে এখানে আসতে বলেছেন?'

জয়ন্ত বাধো বাধো গলায় বললে, 'ঠিক আপনাকে এখানে আসতে বলিনি। আমরাই আপনার কাছে যেতে পারতুম। জানেন তো অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করবার জন্যে আমরা এখানে এসেছি! আপনার কাছ থেকে কেবল দু-চারটে কথা জানতে চাই।'

মানসী ম্লান হেসে বললে, 'আপনি না ডাকলেও আমাকে কিন্তু আজ আপনার কাছে আসতেই হত।'

জয়ন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন?'

—'সে কথা পরে বলব। আমি আগে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।'

॥ ছয় ॥

রুমাল, সায়া, রক্ত

জয়ন্ত বললে, 'মানসীদেবী, হত্যার রাত্রের কথা আপনি যা জানেন বলুন।'

মানসী বললে, 'আমি যেটুকু জানি সুন্দরবাবুকে সব খুলে বলেছি। আপনি কি তা শোনেননি?'

'শুনেছি! কিন্তু পরের মুখে শোনা আর নিজের কানে শোনা এক কথা নয়।'

—'বেশ, শুনুন। সৌদামিনীদেবী অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও রাত নয়টার সময়ে ঘুমোতে যান। তাঁর পাশের ঘরে থাকে উমাতারা, আর তার পরের ঘরখানিতে থাকেন পবিত্রবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবী। কিন্তু সেদিন প্রথম রাত্রে দু-খানা ঘরই খালি ছিল। এ পাড়ার কোনও বিয়েবাড়িতে থিয়েটার ছিল, পবিত্রবাবু আর উমাতারা তাই দেখতে গিয়েছিলেন আর সুরবালাদেবী গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে।

'মাঝে মাঝে আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরে। সে-রাত্রেও কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করবার পর উঠে পড়লুম। ভাবলুম, ও-মহলের লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশুনো করে আসি। ঘুম না হলে আমি তাই করতুম—এটা ছিল আমার অনিদ্রা রোগের চিকিৎসার মতো। ঘর থেকে বেরিয়ে ও-মহলের দিকে অগ্রসর হতে হতে দেখি, সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন পবিত্রবাবু।

'জিজ্ঞাসা করলুম, 'থিয়েটার ভেঙে গেল?' তিনি বললেন, 'রাত একটার আগে ভাঙবে বলে তো মনে হয় না। আমার ভালো লাগল না, তাই চলে এলুম, উমাতারা শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তুমি এখনও ঘুমোওনি?' আমি বললুম, 'অনিদ্রাকে তাড়াবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।' তিনি আমার অভ্যাস জানতেন। একটু হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

'লাইব্রেরিতে ছিলুম ঘণ্টাখানেক। চিকিৎসা ব্যর্থ হল না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ফিরলুম নিজের ঘরের দিকে। আসতে আসতে দূর থেকেই মনে হল, এ মহলের বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন একটা সাঁৎ করে সরে গেল। কিন্তু কাছে এসে কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারই চোখের ভ্রম।

'দ্বিজেনবাবুর ঘরের কাছ পর্যন্ত আসতেই ঘরের ভিতর থেকে তিনি বললেন, 'কে যায়?' আমি সাড়া দিলুম। তিনি বললেন, 'এত রাতে তুমি বাইরে!' বললুম, 'অনিদ্রা ব্যাধির ওষুধ খোঁজবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলুম।' তিনি হেসে উঠে বললেন, 'ওষুধ পেলে?' আমি বললুম, 'পেয়েছি। আমার ঘুম এসেছে।' তিনি বললেন, 'তাহলে তাড়াতাড়ি ঘরে যাও। আর পারো তো ঘুমকে বলে দিয়ো সে যেন আমার কাছেও আসে। কারণ আমারও তোমার দশা।' তারপর আমি ঘরে এসেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে রাত্রের আর কোনও কথাই আমি জানি না।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে আপনার কী রকম সম্পর্ক?'

—'সম্পর্ক একটা ছিল, তবে নামমাত্র। কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভবপর তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। আমার মতন একটি লোক না হলে তাঁর চলত না। আমার আগেও আরও কয়েকজনকে তিনি সঙ্গিনীরূপে থাকবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন

বটে, কিন্তু তারা কেউ তাঁকে দু-তিন মাসের বেশি সহ্য করতে পারেনি। আমি যে তা পেরেছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সহ্য করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না, আমি অনাথা। তবু তিনি যে একসময়ে আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় মনে মনে তিনি অসাড় ছিলেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তাঁর দান থেকে আমি হয়েছি বঞ্চিত। তার কারণও আপনি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছেন।'

—'দেখুন মানসীদেবী, আমরা এমন প্রমাণ পেয়েছি যার উপরে নির্ভর করে বলা চলে যে, হত্যাকারী বা তার সহকারী আছে এই বাড়ির ভিতরেই। এ সম্বন্ধে আপনার কোনও মতামত আছে?'

মানসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থেমে থেমে বললে, 'আমার মতামত? আমার কী মতামত থাকতে পারে? এ-সব আমার ধারণাতেও আসে না। এ বাড়িতে এমন ভয়ানক মানুষ কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু কী রকম লোক?'

মানসীর দুই ভুরু সঙ্কুচিত হল—কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠাধর। অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, 'আপনারা কি তাকেই সন্দেহ করেন?'

—'যদি বলি, করি?'

—'তাহলে মস্ত ভ্রম করবেন।'

—'কেন?'

—'দ্বিজেনবাবু হচ্ছেন দেবতা।'

—'হ্যাঁ, আপনার কাছে।'

—'না যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই-ই ওই কথা বলবে। প্রাণীহত্যার বিরোধী বলে তিনি আমিষ পর্যন্ত খেতে পারেন না। তিনি করবেন নরহত্যা! এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

—'না। কিন্তু বললেন যে, আমি না ডাকলে আপনাকে আজ আমার কাছে আসতে হত। কেন?'

—'আজ এমন একটা ব্যাপার হয়েছে যার কোনও অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'ব্যাপারটা কী?'

—'আমার ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তার ভিতরে আটপৌরে কাপড়-চোপড় রাখি। আজ সকালে খানকয় কাপড়ের ভিতর থেকে এই রুমালখানা পেয়েছি।' মানসী একখানা রুমাল বার করে এগিয়ে ধরলে।

জয়ন্ত রুমালখানা নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়েই সোজা হয়ে উঠে বসল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'মানিক, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রুমাল!'

মানিক হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলে রুমালখানা। বললে, 'এর উপরে যে রক্তের দাগ আছে!'

—'হুঁ, কয়েকটা রক্তের ছোপ আর একটা আঙুলের ছাপ।'

মানসী চিন্তিতভাবে বললে, 'এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আমার জামাকাপড়ের আলমারিতে ওই রক্তমাখা রুমালখানা কোত্থেকে এল? ও রুমাল তো আমার নয়!'

—'রুমালের কোণে ওই ধোপার চিহ্ন?'

—'ও চিহ্ন আমাদেরই ধোপার।'

—'তাহলে এখানা বাড়ির কোনও লোকেরই সম্পত্তি। কিন্তু এর মালিক যে কে সেটা বিশেষ করে বোঝবার উপায়ই নেই। এ রকম সাধারণ রুমাল রাম-শ্যাম সবাই ব্যবহার করে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাম-শ্যামের রুমাল নিজে মানসীদেবীর আলমারির ভিতরে বেড়াতে আসেনি, কে ওখানা রাখতে পারে ওখানে?'

জয়ন্ত বললে, 'তার পরের প্রশ্ন কেনই বা ওখানে রাখবে?'

মানিক বললে, 'আরও একটা প্রশ্ন, রুমালখানা রক্তাক্ত কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, পরে এ সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলেও চলবে। আপাতত এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে মানসীদেবীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে এই রুমালখানাই আমাদের মামলার একটা প্রধান সূত্র হয়ে উঠবে না?'

মানসী সভয়ে বলে উঠল, 'আপনি কী বলছেন! আপনি কি বলতে চান সৌদামিনীদেবীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রুমালের কোনও সম্পর্ক আছে?'

—'থাকা অসম্ভব নয়।'

—'কেউ কি আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ওখানা আমার আলমারির ভিতরে রেখে গিয়েছে?'

—'তাও অসম্ভব নয়।'

—'তবে আমি কী করব?'

—'আপনি কিছুই করবেন না, একেবারে চুপ মেরে যান। রুমালখানা কখনও যে চোখেও দেখেছেন সে-কথা পর্যন্ত ভুলে যান।'

—'আর কারুকে ওর কথা বলব না?'

—'কারুকে না, কারুকে না। এমনকি দ্বিজেনবাবুকেও না।'

—'তাঁর কোনও বিপদ হবে না তো?'

—'মনে তো হয় না। আমি লক্ষ করে দেখেছি তিনি ব্যবহার করেন রঙিন রুমাল।'

—'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু; তিনি বরাবরই রঙিন রুমাল ব্যবহার করে থাকেন।'

—'তাহলে এইখানেই সাঙ্গ হোক রুমাল পর্ব। এইবারে মানসীদেবী, ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি, হত্যাকাণ্ডের পর আপনার ঘরে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কি না?'

—'না।'

—'মনে করে দেখুন, মনে করে দেখুন। ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক, আমার কাজে লাগতে পারে।'

অল্পক্ষণ নীরবে ভাবতে ভাবতে মানসীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, 'আপনার কথায় আর-একটা ছোটো ব্যাপার মনে পড়ছে। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালেবেলায় ওই জামা-কাপড়ের আলমারির ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে দেখেছিলুম তিন ফোঁটা রক্ত!'

—'তিন ফোঁটা রক্ত?'

—'হ্যাঁ, ঠিক তিন ফোঁটা।'

—'তারপর?'

—'কিন্তু সেজন্যে আমি বিস্মিত হইনি। আমার বিশ্বাস, কোনও আহত ইঁদুর কি বিড়ালের গা থেকেই সেই রক্তবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি জল ঢেলে দাগগুলো তুলে ফেলেছিলুম। ওই তিন ফোঁটা রক্তের কথা নিশ্চয়ই আপনার কাজে লাগবে না জয়ন্তবাবু!'

—'নিশ্চয়ই লাগবে। তিন ফোঁটা কেন, মাত্র এক ফোঁটা রক্তই আমার কাছে মহামূল্যবান! আলমারির ভিতরে রক্তাক্ত রুমাল, আলমারির বাইরে তিন ফোঁটা রক্ত! এই দুই রক্তচিহ্নের মধ্যে কি যোগাযোগ নেই? থাকা উচিত, থাকা উচিত!'

মানসী অস্বস্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, 'আপনার সব কথাই হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে!'

—'হোক। তা নিয়ে আপনি একটুও মাথা ঘামাবেন না মানসীদেবী! আপনি কেবল মাথা ঘামিয়ে দেখুন, আর কোনও তুচ্ছ ঘটনার কথা আমাকে বলতে পারেন কি না!'

—'উঁহু, আর কিছুই ঘটেনি।'

—'ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন!'

—'না জয়ন্তবাবু। ...হ্যাঁ, একটা ব্যাপার...না, না, সেটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার!'

—'তবু আমি শুনতে চাই।'

—'আমার একটা সায়া খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'সায়াটা কোথায় রেখেছিলেন?'

—'ঘরের আলনায়।'

—'কবে রেখেছিলেন?'

—'হত্যাকাণ্ডের দিনে। বৈকালে।'

—'কবে খুঁজেছিলেন?'

—'হত্যাকাণ্ডের পরের দিনেই।'

—'সকালে না বিকালে?'

—'সকালে।'

—'তাহলে হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকাল থেকে রাত্রের মধ্যেই সায়াটা আপনার ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে?'

—'আপনি দেখিয়ে দিলেন বলেই তাইতো এখন মনে হচ্ছে! বাড়িতে যে ভীষণ ঘটনা ঘটেছে, সায়াটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম।'

—'আর কোনও তুচ্ছ ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ছে?'

মিনিট তিন ভেবেচিন্তে মানসী নিশ্চিন্তভাবে বললে, 'না, আর কিছুই ঘটেনি।'

—'বেশ, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। নমস্কার।'

মানসী চলে গেলে পর জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে কী ভাবলে। তারপর বললে, 'মানসীদেবীর ঘরে যে সব ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে, স্থানকালপাত্র হিসাবে সেগুলো কতখানি বিস্ময়কর, ভালো করে ভেবে দ্যাখো মানিক। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ে বা তার [illegible] আগে কি কিছু পরে মানসীর ঘর থেকে হারিয়েছে একটা সায়া, ঘরের আলমারির [illegible] পাওয়া গিয়েছে রক্তের দাগ আর হয়তো সেই সময়েই আলমারির ভিতরেও ঢুকেছে একখানা রক্তাক্ত রুমাল। আপাতত এগুলো অর্থহীন বলে বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু অর্থের সন্ধানও যেন এখনই পাওয়া যায়। মানসীর অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভব হত্যাকাণ্ডের রাত্রেই তার ঘরের ভিতরে একজন বাইরে লোকের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রশ্ন—কে সে? শত্রু না মিত্র না হত্যাকারী? যেই-ই হোক, সে চুরি করেছে অসামান্য কিছু নয়—সামান্য একটা সায়া মাত্র। প্রশ্ন—কেন? স্ত্রীলোকের একটা সায়া তার কোন কাজে লাগতে পারে? অথবা সায়াটা বিশেষ করে মানসীর বলেই তার কাছে কি মূল্যবান? সায়াটা গেল কোথায়? অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কোনও কার্যসাধনের জন্যে সায়াটা কি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে? মানসীর ঘরের ওই রক্তের দাগ। প্রশ্ন—কার সে রক্ত? সৌদামিনীদেবীর না যে ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে তার নিজের? যারই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা কিছু করছিল। প্রশ্ন—কী করছিল? রক্তাক্ত রুমালখানা স্থাপন করছিল আলমারির ভিতরে? কেন, কেন, কেন? নিজের রক্তাক্ত রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে রাখলে তার কী উপকার বা মানসীর কী অপকার হবার সম্ভাবনা? পাগলা-গারদের বাসিন্দার মন বোঝবার চেষ্টার মতো এই শেষ প্রশ্নটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টাও হবে সমান দুশ্চেষ্টা!' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে হঠাৎ আবার চিৎকার করে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল—'হয়েছে, হয়েছে!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'খেপে গেলে নাকি? কী হয়েছে হে?'

—'আলমারির ভিতরে সে হস্তচালনা করেছিল মানসীর কোনও অনিষ্টসাধনের জন্যেই!'

—'রক্তাক্ত রুমালখানা ওখানে রাখার কারণ কি তাই?'

—'নিশ্চয়ই নয়! তার রক্তাক্ত রুমাল তো মানসীর বিরুদ্ধে না লেগে তার নিজের বিরুদ্ধেই কাজে লাগবে! রুমালখানা আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল তার অজ্ঞাতসারেই।

এ ছাড়া ও রুমালের কোনও মানেই হয় না!'

—'কিন্তু জয়ন্ত, আলমারির মধ্যে মানসীর পক্ষে অনিষ্টকারক কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?'

—'কেন যে পাওয়া যায়নি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝব, বুঝব, শীঘ্র তাও বুঝব! মানিক হে, জল বেশ ফুটে উঠেছে, ভাত সিদ্ধ হতে আর বিলম্ব হবে না!'

॥ সাত ॥

দ্বিজেনের সৌভাগ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। বাগানে আলো-আঁধারির খেলা। বড়ো বড়ো গাছের বুকের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের বেলাশেষের কলরব। আজকে চাঁদের ছুটির দিন। একটু পরেই অমাবস্যা পাতবে অন্ধকারের আসর।

গোলটেবিলের ধারে বসে পবিত্রবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খেলছে দাবাবোড়ে। মানিক হচ্ছে নির্বাক দর্শক। উপর-চাল বলে দেবার উপায় নেই, কারণ তাহলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে জয়ন্ত।

একবার, দুইবার, তিনবার জয়ন্ত করলে কিস্তি-মাত। বললে, 'আমি একাসনে বসে চব্বিশ ঘণ্টা দাবা খেলতে পারি। কিন্তু আপনার কি আর খেলবার শখ আছে?'

—'আপত্তি নেই।' বললেন পবিত্রবাবু।

আবার ঘুঁটি সাজানো হল। পবিত্রবাবু প্রথম চাল চালতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দ্বিজেনের প্রবেশ।

জয়ন্ত স্মিত মুখে বললে, 'আসুন দ্বিজেনবাবু। বসুন। দাবার ছকের উপরে আমাদের দুজনের যুদ্ধ দর্শন করুন। ...কিন্তু না, আপনার মুখের ভাব তো ক্রীড়াকৌতুক দেখবার মতো নয়। হয়েছে কী?'

দ্বিজেন বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

—'গোপনে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

—'পবিত্রবাবু, তাহলে আজ আর যুদ্ধ নয়, আপাতত সন্ধি! আপনি না হয় মানিকের সঙ্গে বাগানে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা গল্প করে আসুন।'

মানিক ও পবিত্রবাবুর প্রস্থান।

—'তারপর দ্বিজেনবাবু? এইবারে আপনি নির্ভয়ে কথার ঝুলি ঝাড়তে পারেন।'

—'আজ দুটি খবর শুনবেন জয়ন্তবাবু। একটি শুভ, আর একটি অশুভ।'

বাগানের দিকের বারান্দার উপরে ছিল তিনটে জানালা, একটা দরজা। একটিমাত্র জানালা খোলা ছিল। সেই জানালাটার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে একটা পাউডারের কৌটো তুলে নিয়ে বললে, 'একটু সবুর করুন দ্বিজেনবাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।' সে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

মিনিট দেড়েক পরে ঘরে এসে আসন গ্রহণ করে জয়ন্ত বললে, 'আগে শুভ খবরটা কী শুনি।'

—'আমিই আবার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি।'

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, 'কেমন করে?'

—'জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছেন।'

—'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'হঠাৎ?'

—'হ্যাঁ, হার্ট ফেল করে।'

—'কোথায়?'

—'এলাহাবাদে।'

—'কিন্তু আইনত সম্পত্তির অধিকারী তিনি। কোনও উইল করে আপনাকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন?'

—'না, তিনি সম্পত্তির অধিকারীই হননি।'

—'কী রকম?'

—'পিসিমার নতুন উইল হবার আগেই তিনি মারা পড়েছেন। কলকাতা থেকে কোনও কাজে তিনি পশ্চিমে যাচ্ছিলেন। ট্রেন যখন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছয় সেই সময়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।'

—'এ খবর আপনি কবে পেয়েছেন?'

—'সবে আজকেই।'

—'এত দেরিতে খবর পেলেন কেন?'

—'তাঁর দেহ শনাক্ত করতে দেরি হয়। পুলিশ অনেক সন্ধান নেবার পর জানতে পারে, তিনি আমাদের আত্মীয়।'

—'বুঝলুম। সুসংবাদ বটে কিন্তু তবু আপনার মুখে আনন্দের লক্ষণ নেই কেন? জ্যাঠামশাইকে আপনি কি খুব ভালোবাসতেন?'

—'ভালোবাসার পথ তিনি রাখেননি। আমার কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিতের মতো। আমি পিসিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে আমাকে তিনি দারুণ ঘৃণা করতেন। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। কেবল আমি নই, এ বাড়ির সকলেই ছিল তাঁর

চক্ষুশূল। তিনি সম্পত্তির মালিক হলে এখানকার সকলকেই বিদায় নিতে হত। তাঁর মৃত্যুতে আমি আঘাত পাইনি। অবশ্য মৃত্যু মাত্রই দুঃখজনক, কিন্তু আত্মীয় বিয়োগে লোকে যেমন ব্যথা পায়, তাঁর মৃত্যুতে তেমন কোনও ব্যথা আমি অনুভব করিনি।'

—'তবে আপনার মুখ অমন বিরস কেন?'

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে করুণ স্বরে বললে, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আমি বোধ হয় সম্পত্তি ভোগ করবার কোনও সুযোগই পাব না।'

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, 'সে কী!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হতভাগ্য।'

—'এ আত্মলাঞ্ছনার অর্থ কী?'

—'বলছি। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, হত্যাকারীর কোনও সন্ধান আপনি পেয়েছেন কি?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'উঃ, বড্ড গুমোট মনে হচ্ছে! দাঁড়ান, জানালার পর্দাটা খুলে দিয়ে আসি, ঘরের ভিতরে বাইরের বাতাস চলা-ফেরা করুক।'

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ, কী বলছেন দ্বিজেনবাবু! খুনির সন্ধান আমরা পেয়েছি কি না? হ্যাঁ, আমরা জানি যে খুনি এই বাড়িরই লোক।'

—'অসম্ভব, খুনিকে আপনারা জানেন না!'

—'হঠাৎ অতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন দ্বিজেনবাবু? খুনির আরও কোনও কোনও কীর্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

—'কী রকম কীর্তি?'

—'আমরা জানি যে এখানকার হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালে মানসীদেবীর ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া যায়।'

দ্বিজেন বিকৃত স্বরে বললে 'হতেই পারে না, হতেই পারে না।'

—'মানসীদেবী নিজেই এ কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।'

—'মানসী মিথ্যা কথা বলেছে।'

—'কেন তিনি মিথ্যা কথা বলবেন?'

—'তা আমি জানি না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলেছে। বেশ, আপনারা আর কী জানেন, বা জানেন বলে মনে করেন?'

—'খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাও আমাদের অজানা নেই।'

দ্বিজেন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন অস্ত্র?'

—'ছত্রপতির ছোরা।'

—'এই নিন ছত্রপতির ছোরা!' দ্বিজেন একখানা কোষবদ্ধ ছোরা টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

॥ আট ॥

হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি

জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে ছোরাখানা তুলে নিলে এবং ভাবহীন মৌনমুখে পরীক্ষা করতে লাগল।

খাপ রৌপ্যখচিত চামড়ায় তৈরি। ছোরার হাতল হাতির দাঁতের, তার উপরে মূল্যবান পাথর-বসানো সোনার কাজ। ফলা নীল ইস্পাতের, সাত ইঞ্চি লম্বা। ফলার উপরে শুকনো রক্তের দাগ।

ছোরাখানা আবার কোষবদ্ধ করে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে জয়ন্ত বেশ সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'ছোরাখানা কোথায় পেলেন?'

—'ঠাকুরদাদার লাইব্রেরি থেকে।'

—'এতদিন এ খানা কোথায় ছিল?'

—'আমার কাছে।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। ওই ছোরা দিয়ে আমি পিসিমাকে খুন করেছি।'

পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে জয়ন্ত নীরবে দ্বিজেনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল মর্মভেদী দৃষ্টিতে—যেন সে তার মনের সমস্ত গুপ্তকাহিনি বাইরে আকর্ষণ করে আনতে চায়! তারপর নীরস হাস্য করে বললে, 'কেন এ পাপ করলেন?'

দ্বিজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'করব না? কেন করব না? পিসিমা কি আমার মুখ তাকিয়েছিলেন? তিনি আমাকে পথের ভিখারি করতে চেয়েছিলেন বিনা অপরাধে! কেবল আমাকে নয়, মানসীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে আবার কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেন আমি হাত-পা গুটিয়ে এ-সব অত্যাচার সহ্য করব? কোনও মানুষই তা পারে না। পিসিমা বৃদ্ধা, বিধবা, সন্তানহীনা। পৃথিবীর পক্ষে একেবারে ব্যর্থ জীব। তাঁকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিলে পৃথিবীর কোনও অপকারই হবে না। আমাদের জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে তাঁকে হত্যা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অবশ্য যদি তখন জানতুম যে তার আগেই নতুন উইল হয়ে গেছে, তাহলে বোধ হয় অকারণে হত্যা করে আমার হাত করতুম না কলঙ্কিত। কিন্তু তখন আমি তা জানতুম না—আমি তা জানতুম না!'

জয়ন্ত অবিচলিতভাবে বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আপনার কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হত্যা করেছি বটে, কিন্তু যুক্তিহীন হত্যা করিনি।'

—'এখন কী করবেন?'

—'আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব।'

—'তার কী ফল হবে জানেন?'

—'জানি। ফাঁসি।'

—'ওই কি আপনার কামনা?'

—'দোষ স্বীকারের পর কোনও খুনি জীবনের আশা করে?'

—'আপনার মৃত্যুর পর মানসীদেবীর কী অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখেছেন বোধ হয়?'

অন্তরের মধ্যে যেন চরম আঘাত পেয়ে দ্বিজেন শিউরে উঠল। ভগ্ন স্বরে বললে, 'সে কথা ভাবলেও আমি পাগল হয়ে যাব।'

—'মানসীদেবী এ কথা শুনলে কী বলবেন?'

—'আত্মহত্যা করবে।'

—'তবে?'

—'দোহাই জয়ন্তবাবু, এখন আর মানসীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি তাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই!'

—'ভোলা কি এতই সহজ?'

—'না, সহজ নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী?'

—'কোনও উপায়ই কি নেই?'

—'কোনও উপায় নেই, কোনও উপায় নেই!...না, না, এক উপায় আছে বটে। কিন্তু, কিন্তু তা অসম্ভব!'

—'কী অসম্ভব দ্বিজেনবাবু?'

—'আপনি কি আমাকে মুক্তি দিতে রাজি আছেন?'

—'অপরাধ স্বীকারের পরেও আপনি আমার কাছ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছেন!'

—'নিজের জন্যে করছি না, মানসীর জন্যে করছি। আমার মরাবাঁচার উপরেই তার মরা-বাঁচা নির্ভর করছে জয়ন্তবাবু!'

—'সব বুঝি। কিন্তু কী করে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি?'

—'আপনি সরকারি গোয়েন্দা নন। আমি অনুভব করতে পারছি, আমার উপরে আপনার সহানুভূতি আছে।'

—'কিন্তু কী করে আপনাকে মুক্তি দেব তাই বলুন।'

—'আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না, আমি খুনি।'

—'তা জানে না বটে। কিন্তু পুলিশকে ওই কথা জানানোই হচ্ছে আমার কর্তব্য।'

—'পুলিশের শক্তিতে আমার আস্থা নেই। আপনি যদি মামলার ভার ত্যাগ করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাব।'

—'কিন্তু অক্ষম বলে আমার দুর্নাম হবে।'

—'যেটুকু দুর্নাম হবে তার বিনিময়ে আপনি কিছু লাভ করতেও পারেন।'

—'কী লাভ?'

—'অর্থ।'

—'তার মানে?'

—'জয়ন্তবাবু, ভেবে দেখুন। দু-দিন পরেই আমি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হব। আপনি যদি এই মামলাটা ছেড়ে দেন, তাহলে কোন দিক দিয়ে লাভবান হবেন, বুঝতে পারছেন?'

—'আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চান।'

—'ঘুষ নয় জয়ন্তবাবু, আমার কৃতজ্ঞতার দান।'

—'উত্তম। কত টাকা আপনি দিতে পারেন?'

—'আপনিই বলুন।'

—'পাঁচ হাজার টাকা?'

—'আরও বাড়িয়ে বলুন।'

—'দশ হাজার টাকা?'

—'তাও উল্লেখযোগ্য হল না।'

—'পনেরো হাজার টাকা?'

—'আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি—যদিও আমার জীবনের দাম আরও ঢের বেশি হওয়া উচিত।'

—'টাকাটা কবে দেবেন?'

—'তারিখ না দিয়ে আজকেই আমি চেক লিখে দিচ্ছি। সম্পত্তি হাতে এলেই আপনার টাকা পাবেন।'

—'তাই সই। লিখুন চেক।'

দ্বিজেন হেঁট হয়ে চেক লিখতে বসল। জয়ন্ত হাসলে মুখ টেপা হাসি।

—'আপনি আমাকে বাঁচালেন জয়ন্তবাবু। চেকখানা গ্রহণ করুন। এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছিলুম।'

—'এইবারে চোখে আলো দেখতে পেয়েছেন শুনে সুখী হলুম। অতঃপর প্রথমেই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।'

—'আজ্ঞা করুন।'

—'ছত্রপতির ছোরাখানা আবার যথাস্থানে রেখে আসুন।'

—'এখনই রেখে আসছি। নমস্কার।'

—'নমস্কার।'

॥ নয় ॥

ঘুষখোর জয়ন্ত

দ্বিজেনের প্রস্থানের পর জয়ন্ত মিনিট-পাঁচেক চুপ করে বসে রইল। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, 'মানিক!'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, 'আসছি।'

অনতিবিলম্বে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, 'এই যে সুন্দরবাবু। কতক্ষণ?'

'বেশ খানিকক্ষণ। মানিকের মুখে শুনলুম দ্বিজেনের সঙ্গে তোমার নাকি গোপন পরামর্শ চলছিল?'

—'ঠিক পরামর্শ নয় সুন্দরবাবু, খুনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে গেল।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'খুনি! কে খুনি?'

—'দ্বিজেন।'

—'দ্বিজেন খুনি!'

—'তাই তো সে বলে গেল।'

—'আর তাকে তুমি ছেড়ে দিলে?'

—'তা দিলুম বই কি!'

—'দিলুম বললেই হল? রোসো, দেখছি তাকে!' সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত।

—'আরে মশাই, শ্রবণ করুন, 'শনৈঃ পন্থাঃ শনৈ কন্থাঃ শনৈঃ পর্বতলঙঘনম্!' ধীরে দাদা, ধীরে!'

—'না, না, ধীরে-টিরে নয়, আমার এখন বেগে ধাবমান হওয়া উচিত দ্বিজেনের দিকে।'

—'আমি কারুকেই দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে দেব না।'

—'দেবে না কী রকম?'

—'সে আমাকে কী দিয়েছে দেখুন।'

—'চেক?'

—'হ্যাঁ, পঁচিশ হাজার টাকার চেক।'

—'হুম, ঘুষ!'

—'ঠিক তাই।'

—'হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার বন্ধুর কী অধঃপতন হয়েছে দ্যাখো।'

মানিকের মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ অভিযোগের ভাব।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'যা মন্দার বাজার পড়েছে, লোভ সামলাতে পারলুম না ভাই!'

মানিক প্রায়-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত তোমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

সুন্দরবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'পোড়ার মুখে হাসতে লজ্জা করছে না তোমার?'

—'আগে আমার সব কথা শুনুন। তারপর বিচার করুন আমার হাসা উচিত কি না!'

—'যা বলবার বলো। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার সব কথা শোনবার পরও দ্বিজেনকে আমি গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।'

মানিক বললে, 'আমারও ওই মত।'

জয়ন্ত বললে, 'ছিঃ বন্ধু, তুমিও শত্রু-শিবিরে?'

—'আমি ঘুষখোরের বন্ধু নই।'

জয়ন্ত সশব্দে ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'বেশ, তাহলে আমার কথাই শোনো।' সে দ্বিজেনের সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করে গেল। কখনও সবিস্ময়ে, কখনও ক্রুদ্ধ ভাবে, কখনও ঘৃণাভরে সুন্দরবাবু শ্রবণ করলেন তার কথা।

জয়ন্ত বললে, 'এই তো ব্যাপার। এখন আমার কী করা উচিত?'

মানিক বললে, 'গলায় দড়ি দাও।'

—'সুন্দরবাবুর মত কী?'

—'তোমার কী করা উচিত, আমি কী জানি? তবে আমার যা করা উচিত তাই করতে চললুম।'

—'কোথায় চললেন মশাই?'

—'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে।'

—'যাবেন না, যাবেন না!'

—'আলবত যাব, আলবত যাব!'

—'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না!'

—'কেন, তুমি ঘুষ খেয়েছ বলে?'

—'না, অন্য কারণে।'

—'কারণটা কী শুনি।'

—'দ্বিজেন হত্যাকারী নয়!'

জয়ন্তের মুখের পানে চেয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন সুন্দরবাবু। মানিকেরও সেই ভাব।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, দ্বিজেন হচ্ছে নিরপরাধ। কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।'

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'তবে কি এতক্ষণ তুমি মশকরা করছিলে? দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেনি?'

—'দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেছে।'

—'পাগলের মতো তুমি কী বলছ জয়ন্ত!'

—'মানসীদেবীর আলমারির ভিতরে যে রক্তমাখা রুমালখানা পাওয়া গেছে সেখানা তো এখন আপনার কাছেই আছে?'

—'আছে।'

—'সেখানা সাধারণ সাদা রুমাল। দ্বিজেন ওরকম রুমাল ব্যবহার করে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে রুমালখানা খুনিরই সম্পত্তি। দ্বিজেন খুনি হলে মানসীকে বিপদে ফেলবার জন্যে রুমালখানা কখনওই তার আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ মানসীকে সে ভালোবাসে, তাকে বিবাহ করবার জন্যে সে সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হতে বসেছিল। মানসীকে সে বিপদে ফেলতে পারেই না। আর ওই রুমালখানা তার নিজের হলেও ওখানা সে আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ তাহলে তার নিজেরই বিপদের সম্ভাবনা। যেচে বিপদে পড়বে বলে কেন সে নিজের রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে স্থাপন করবে?'

মানিক বললে, 'তোমার তো বিশ্বাস রুমালখানা তার মালিকের অজ্ঞাতসারেই আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু রুমালের মালিক হত্যাকাণ্ডের পরে মানসীর আলমারির ভিতরে হাত চালাতে গিয়েছিল কেন, অনুমান করতে পারেন সুন্দরবাবু?'

—'উহুঁ! না, না, আলমারির ভিতর থেকে হয় সে কিছু নিতে, নয় ওখানে কিছু রাখতে গিয়েছিল।'

—'মানসীর আলমারিতে হত্যাকারীর পক্ষে দরকারি কী থাকতে পারে? মানসীর একটা সায়া সেইদিনই হারিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল আলমারির বাইরে আলনার উপরে। আমার মনে হয় হত্যাকারী কিছু রাখতেই গিয়েছিল।'

—'সেটা কী হতে পারে?'

—'হয়তো ছত্রপতির ছোরা।'

—'আরে, ছোরাখানা তো আছে দ্বিজেনের কাছে!'

—'তা থাকতে পারে।'

—'আর সে নিজের মুখেই তো তোমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেও গিয়েছে!'

—'তা করতে পারে।'

—'তবু বলবে সে অপরাধী নয়?'

—'তবু বলব সে অপরাধী নয়। তার মুখ-চোখ, ভাবভঙ্গি, কথার ধরন-ধারণ সব

প্রকাশ করে দিচ্ছিল, সে অপরাধী নয়। এত অভিজ্ঞতার পরও কি আমার মানুষ চেনবার শক্তি হয়নি? দ্বিজেন মিছে কথা বলছিল।'

—'এমন বিপজ্জনক মিছে কথা কেউ কখনও বলে জয়ন্ত? এ তো আত্মহত্যার শামিল!'

—'দ্বিজেন কেন যে এমন আশ্চর্য মিছে কথা বলে গেল, তার কারণও আমি আন্দাজ করতে পারছি।'

—'কারণটা কী বলো না!'

—'এখনও বলবার সময় হয়নি।'

—'দ্বিজেন যদি নিরপরাধ হয়, তাহলে এই খুনের জন্যে দায়ী কে হতে পারে? হীরেন্দ্রনারায়ণ? কিন্তু সে তো এখন আমাদের নাগালের বাইরে!'

—'খুনি সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা করতে পারছি। কিন্তু ধারণা এখনও প্রকাশ করবার মতো স্পষ্ট হয়নি।'

—'তুমি কি মনে করো, দ্বিজেন তার পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার জন্যেই এমন নির্বোধের মতো মিছে কথা বলছে?'

—'ওসব কথা এখন থাক। আপাতত এক কাজ করতে হবে আপনাকে। এই বাড়ির প্রত্যেক লোকের ডানহাতের আঙুলের ছাপ তুলে নিতে হবে—এমনকি ঝি-চাকর-দারোয়ান সকলেরই।'

—'আজই?'

—'আজই। তারপর সেগুলো নিয়ে কী করতে হবে, আপনাকে বলা বাহুল্য। কিছু বক্তব্য থাকলে ফোনে জানাবেন। কাল সন্ধ্যার আগে আবার এখানে আপনার দেখা পেতে চাই। খুব সম্ভব সেই সময়েই হত্যাকারীকে আপনার গ্রাসে সমর্পণ করতে পারব।'

—'বলো কী হে, তুমি এতটা নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। এইবারে আমার সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করবেন?'

—'আচমকা এ আবার কী খেয়াল?'

—'চলুন না। ঘুঘু দেখাতে পারব না বটে, কিন্তু ফাঁদ দেখাতে পারব।'

—'তোমার সবই হেঁয়ালি। চলো।'

বাইরে গিয়ে সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করে বললেন, 'বাবা, বাইরে তো দেখছি খালি অমাবস্যার অন্ধকার!'

—'এই যে, আমি অন্ধকারে আলোকপাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।' একটা জানালার কাছে এগিয়ে জয়ন্ত টর্চ টিপে নীচে ফেললে আলো।

—'দেখুন সুন্দরবাবু।'

—'জানালার তলায় সাদা মতন কী ছড়ানো রয়েছে হে?'

—'পাউডারের গুঁড়ো। গুঁড়োর মাঝখানে কী দেখছেন?'

—'আরে পায়ের দাগ না?'

—'হ্যাঁ, হত্যাকারী কিংবা তার সহকারীর পদচিহ্ন।'

—'হুম!' বলে সুন্দরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিস্ফারিত চক্ষে পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মানিক বললে, 'ছোটো খালি পায়ের দাগ। দেখে মনে হয় স্ত্রীলোকের পা।'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিচার করব ছাঁচ তোলবার পর।'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'ঠিক এইখানেই যে কারুর আবির্ভাব হবে, তুমি কেমন করে জানলে জয়ন্ত?'

—'কোনও মূর্তি আগেও এখানে আড়ি পাততে এসেছেন। আন্দাজে ধরেছিলুম, আজও তিনি দয়া করে আসবেন। অন্য জানালা দুটো বন্ধ করে ওইটেই খালি খোলা রেখেছিলুম, যাতে ওইখানেই তাঁর উদয় হয়। তবে বেশিক্ষণ তাঁকে দাঁড়াতে দিইনি, পর্দা সরাতেই তিনি চম্পট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

॥ দশ ॥

অভিনয়ের আয়োজন

পরের দিন সকালবেলায় জয়ন্ত চা পানের পর বাড়ির ভিতরদিকের বারান্দায় পায়চারি করছে, এমন সময়ে দুইজন বেয়ারার সঙ্গে পবিত্রবাবুর আবির্ভাব।

জয়ন্ত শুধোলে, 'কী পবিত্রবাবু, বেয়ারা নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

—'আর কোথায়, লাইব্রেরিতে! আজ যে লাইব্রেরি সাফ করবার দিন।'

—'আপনি তো খুবই কর্তব্যপরায়ণ দেখছি। সৌদামিনীদেবী স্বর্গে, পৃথিবীতে বসে এখনও আপনি তাঁর আদেশ পালন করছেন!'

—'হপ্তায় একদিন করে লাইব্রেরি সাফ করাতে হবে, এই ছিল তাঁর আদেশ। এখনও তাঁরই অন্ন খাচ্ছি, তাঁর আদেশ পালন করব না। কিন্তু এ বাড়িতে আমার অন্ন এইবারে বোধহয় উঠল। সৌদামিনীদেবীকে খুন করে কোন পাষণ্ড আমারও সর্বনাশ করলে!'

—'কেন পবিত্রবাবু?'

—'নতুন মনিব আমার মতো বুড়ো ঘোড়াকে আর কি কাজে বহাল রাখতে চাইবেন? সৌদামিনীদেবীর মৃত্যু, আমাদেরও সর্বনাশ! সবই নিয়তির খেলা! আসি মশাই!' অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পবিত্রবাবু অগ্রসর হলেন লাইব্রেরির দিকে।

পবিত্রবাবুর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, নতুন মনিব বলতে উনি কাকে বুঝেছেন? হীরেন্দ্রনারায়ণ না দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ?

লাইব্রেরি ঘরের ভিতর থেকে পবিত্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল—'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু!'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'কী পবিত্রবাবু?'

—'শিগগির একবার এদিকে আসুন!'

শীঘ্র যাবার কোনও চেষ্টাই করলে না জয়ন্ত। ব্যাপারটা আন্দাজ করে মনে মনে হেসে সে ধীরে ধীরে লাইব্রেরির ভিতর গিয়ে হাজির হল। যা ভেবেছে তাই! শো-কেসের পাশে পবিত্রবাবু থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'কী হল মশাই? আপনি সৌদামিনীদেবীর প্রেতাত্মা দেখেছেন নাকি?'

—'তা দেখলেও আমি এতটা অভিভূত হতাম না। কিন্তু যা তাঁকে প্রেতাত্মায় পরিণত করেছে, চোখের সামনে আমি তাই-ই দেখছি।'

—'মানে?'

—'ছত্রপতির ছোরা। হত্যার দিন যা অদৃশ্য হয়েছিল, হত্যার পরে আবার তা যথাস্থানে ফিরে এসেছে!'

—'কী করে জানলেন যে ওই ছোরা দিয়েই সৌদামিনীদেবীকে খুন করা হয়েছে?'

—'সেদিন তো আপনারাই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন!'

—'তা বটে। কিন্তু সে কেবল সন্দেহ। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলিনি।'

—'কিন্তু ঠিক ঘটনার দিনে ছোরাখানা চুরিই বা গেল কেন, আর চোরে আবার তা ফিরিয়েই বা দিলে কেন?'

—'এটা ভাববার কথা বটে।'

—'তবে কি হত্যাকারী এখনও এই বাড়ির ভিতরেই বাস করছে?'

—'থাকতেও পারে।'

—'বাপরে, বলেন কী মশাই?'

—'ছোরাখানা শো-কেসের ভিতর থেকে বার করুন দেখি!'

পবিত্রবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'আমি মরে গেলেও পারব না!'

—'কেন?'

—'যদি ওর উপরে এখনও সৌদামিনীদেবীর রক্ত লেগে থাকে? ও ছোরা স্পর্শ করলেও মহাপাপ!'

—'তাহলে ও ছোরা ছুঁয়ে কাজ নেই। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুন। আমি বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।'

পবিত্রবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর জামা-কাপড় পরে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আমি একবার অ্যাটর্নি হরিদাস চৌধুরির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

যথা সময়ে হরিদাসবাবুর কাছে গিয়ে জয়ন্ত আত্মপরিচয় দিলে।

সাদর সম্ভাষণ করে হরিদাসবাবু শুধোলেন, 'আমি আপনার কী করতে পারি?'

—'সৌদামিনীদেবীর নতুন উইলখানা একবার দেখতে চাই।'

—'অনায়াসে দেখতে পারেন। কিন্তু জানেন তো সেখানা ব্যর্থ উইল? হীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা পড়েছেন?'

—'জানি।'

উইল এল। তার উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে জয়ন্ত বললে, 'একজন সাক্ষী তো দেখছি আমাদের পবিত্রবাবু। দ্বিতীয় সাক্ষীটি কে?'

হরিদাসবাবু বললেন, 'আমার কেরানি।'

—'সৌদামিনীদেবীর প্রথম উইলখানা এখনও আছে তো?'

—'আছে বটে, কিন্তু এতদিন ওর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়।'

—'কেন?'

—'উইলখানা তাঁকে আর একবার দেখিয়ে আমাকে নষ্ট করে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই সেখানা এখনও বর্তমান আছে।'

—'সে উইলখানাও একবার দেখতে পাই কি?'

—'সেখানা আপনার কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

—'তবু একবার দেখতে দোষ কী?'

—'তবে দেখুন।'

পুরাতন উইলখানা আনানো হল। জয়ন্ত সেখানা পাঠ করে ফিরিয়ে দিলে।

হরিদাসবাবু হেসে বললেন, 'দেখছেন তো, ওখানা আপনার পক্ষে একেবারে অকেজো কাগজ?'

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর শামুকদানী বার করে দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'না হরিদাসবাবু, উইলখানা দেখবার সুযোগ পেয়ে বড়োই উপকৃত হলুম!'

—'উপকৃত হলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত!'

—'কোন দিক দিয়ে যে উপকৃত হলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'সেটা এখনও বলবার সময় হয়নি, ক্ষমা করবেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, প্রথম উইলখানা দেখতে পেলুম বলেই আমার এখানে আসা সার্থক হল। আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখালেন। ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ! নমস্কার!'

বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত দেখলে মানিকের সঙ্গে দাবা খেলবার জন্যে ছকের উপরে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন পবিত্রবাবু।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'পবিত্রবাবু, নতুন উইলের সময়ে আপনি যে সাক্ষী ছিলেন, এ কথা তো জানতুম না!'

পবিত্রবাবু বললেন, 'ও কথা তো এ বাড়ির সবাই জানে। এ বাড়িতে আমি ছাড়া উইলের সাক্ষী হবে কে? আমি হচ্ছি সৌদামিনীদেবীর বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী।'

—'বুঝলুম। কিন্তু, দ্বিজেনবাবুকে আপনি একরকম কোলে-পিঠে করেই মানুষ করেছেন। তাঁকে কি আপনি ভালোবাসেন না?'

পবিত্রবাবু বললেন কী, ভালোবাসি না আবার? নিজের ছেলের মতো ভালোবাসি!'

—'তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন দ্বিজেনবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন, তখন আপনি তাঁকে বাধা দেননি কেন?'

—'যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম মশাই, যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম। আপনি সৌদামিনীদেবীকে তো জানেন না! তিনি ছিলেন তৈলপক্ক বাঁশের মতো—এতটুকু নোয়ানো অসম্ভব। আমাকে দ্বিজেনের পক্ষ গ্রহণ করতে দেখেই তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যে-সব কথা বললেন, আর তারপর যা করলেন, সে-সব কথা আর প্রকাশ না করাই ভালো।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কর্তব্যপালন করেছেন শুনে সুখী হলুম। যাক। এখন আপনি একটি কার্যভার গ্রহণ করবেন?'

—'কেন পারব না? আপনার অনুরোধ তো আদেশ!'

—'আজ সন্ধ্যার আগে কোনও একটা বড়ো ঘরে বাড়ির সবাইকে এনে জড়ো করতে পারবেন?'

—'পারব। কিন্তু কেন বলুন দেখি?'

—'একটা অভিনয় হবে।'

—'কারা অভিনয় করবে?'

—'আমরা সকলেই।'

॥ এগারো ॥

অপূর্ব অভিনয়

একখানা হল ঘর। একদিকে পাশাপাশি উপবিষ্ট জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু ও কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী। আর-একদিকে দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন, পবিত্রবাবু, মানসী, সুরবালা, উমাতারা, সিন্ধুবালা, বিন্দুবালা এবং বাড়ির কয়েকজন ভৃত্য ও দারোয়ান।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত, তুমিই পালা শুরু করো।'

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'দ্বিজেনবাবু অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?'

দ্বিজেন অগ্রসর হয়ে জয়ন্তের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ, ভাবভঙ্গি সঙ্কুচিত।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে?'

দ্বিজেন হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—'সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে? আপনি?'

দ্বিজেনের মুখ নীরব, মাথা নত।

জয়ন্ত কঠোর কণ্ঠে বললে, 'এখন কি ও-কথা আপনি অস্বীকার করতে চান? কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি নিজেই আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন!'

দ্বিজেন মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কিছুই বক্তব্য নেই।'

ও-পাশ থেকে পবিত্রবাবু বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! দ্বিজেন কিছুতেই হত্যাকারী হতে পারে না।'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্তব্ধ হোন পবিত্রবাবু। আপনারা কেউ আমাকে বাধা দেবেন না। দ্বিজেনবাবু যে হত্যাকারী নন আমি তা জানি।'

দ্বিজেন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালে। জয়ন্তের আসল উদ্দেশ্য যে কী, আন্দাজ করতে পারছে না সে।

জয়ন্ত বললে, 'আমি জানি দ্বিজেনবাবু হত্যাকারী নন। আমি জানি হত্যাকারী কে। দ্বিজেনবাবু আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন। নয় কি দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি আবার মুখ নামিয়ে ফেললে।

—'আর-একজনকে বাঁচাবার জন্যেই দ্বিজেনবাবু মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেনের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—'তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেন প্রাণপণে কোনওরকমে বলে উঠল, 'দয়া করুন জয়ন্তবাবু, দয়া করুন!'

অট্টহাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'দয়া! বাঘ মারতে গিয়ে শিকারি করবে দয়া! অপরাধী ধরতে এসে গোয়েন্দা করবে দয়া! ...যাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চেয়েছিলেন, তিনি কে? এখনও আপনি বলবেন না? তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি। দ্বিজেনবাবু বেশ জানেন, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী মানসীদেবী।'

দ্বিজেন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি মানসীর উপরে গিয়ে পড়ল বিদ্যুতের মতো। কিন্তু মানসীর মুখে নেই কোনও ভাবের রেখা। মূর্তির মতো স্থির তার দেহ।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আপাতত ওঁর কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে থাকে কারণের সম্পর্ক আর দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে হয় চার। দ্বিজেনবাবুরই কাছ থেকে তাঁর মন ধার নিয়ে আর মামলার অন্যান্য সূত্রগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে আমি যা পরিকল্পনা করেছি, সকলে এখন তাই-ই শ্রবণ করুন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কিছু কিছু গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম।

'দ্বিজেনবাবু মাঝরাত্রে ঘরে শুয়ে আছেন, চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময়ে বাইরে শব্দ পেয়ে সাড়া নিয়ে জানলেন, মানসীদেবীও তখন পর্যন্ত জেগে আছেন।

'সেই রাত্রেই নিহত হলেন সৌদামিনীদেবী। সকলেরই দৃঢ় ধারণা, হত্যাকারী বাড়ির বাইরের লোক নয়। সে-সময়ে সকলেই সহজে অন্য লোককে সন্দেহ করে। গতকল্যকার রাত্রের কথা ভেবে দ্বিজেনবাবুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অত রাত্রেও কেন জেগে ছিলেন মানসীদেবী।

'সন্দেহের আরও একটা বিশেষ কারণও আছে। প্রথমত সৌদামিনীদেবী প্রথম উইলে মানসীদেবীর জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। নতুন উইলে মানসীদেবীকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানসীদেবীর সঙ্গে তিনি দ্বিজেনবাবুর বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ নারাজ আর তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার দরুন দ্বিজেনবাবুকে পথের ভিখারি করেছেন। সুতরাং সৌদামিনীদেবীর উপরে মানসীদেবীর বিজাতীয় ক্রোধ আর দারুণ আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক।

'মানসীদেবী যখন অন্যান্য সকলের সঙ্গে সৌদামিনীদেবীর মৃতদেহ নিয়ে অভিভূত হয়ে আছেন, নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে দ্বিজেনবাবু তখন চুপি চুপি মানসীদেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন আর জামাকাপড়ের ভিতর থেকে আবিষ্কার করলেন রক্তমাখা ছত্রপতির ছোরা! আমার ধারণা, সেইসঙ্গে তিনি আরও কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে।

'এই অভাবিত আবিষ্কার করে দ্বিজেনবাবু যে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু মানসীদেবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটুও কমল না, বরং পুলিশের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। কেমন দ্বিজেনবাবু, আমার অনুমান বোধ হয় নিতান্ত ভ্রান্ত নয়?'

দ্বিজেন নিরুত্তর, তার অবস্থা জীবন্মৃতের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'সঞ্জীবিত হোন দ্বিজেনবাবু, আশ্বস্ত হোন! আমি জানি, আপনি মিথ্যা ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলতে পারি, মানসীদেবী হত্যা করেননি সৌদামিনীদেবীকে!'

ঘরের ভিতর শোনা গেল বহু কণ্ঠের বিস্ময়গুঞ্জন। মানসীর মূর্তি তেমনি নির্বাক, তেমনি

নিস্পন্দ—সমান অটল আনন্দে-নিরানন্দে! দ্বিজেন ফেললে আশ্বস্তির নিশ্বাস।

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে. পবিত্রবাবু কি একবার এদিকে আসতে পারবেন?'

পবিত্রবাবু উঠে এলেন। দুই ভুরু তাঁর সঙ্কুচিত।

—'পবিত্রবাবু, আজ অ্যাটর্নিবাড়িতে গিয়ে জানলুম যে, প্রথম উইলে সৌদামিনীদেবী আপনার জন্যে বরাদ্দ রেখেছিলেন বিশ হাজার টাকা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নতুন উইলে আপনার ভাগে ছিল না একটিমাত্র পয়সাও? আপনি উইলের একজন সাক্ষী, এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নতুন উইলে আপনার টাকা মারা গেল কেন, এটা প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। তাই আজ সকালে অ্যাটর্নিবাড়ি থেকে ফিরে এসেই কৌশলে আপনার কাছ থেকে গুপ্তকথাটা আদায় করে নিই। —আপনাকে বঞ্চিত করার কারণ বোধহয় আপনি করেছিলেন দ্বিজেনবাবুর পক্ষ সমর্থন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনার পক্ষে দ্বিজেনবাবুর পক্ষ সমর্থন বলতে বোঝায় আত্মপক্ষ সমর্থনও?'

—'অর্থ বুঝলুম না।'

—'নতুন উইলে সম্পত্তির মালিক হতেন হীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি আপনাকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সম্পত্তির মালিক করার অর্থ-ই হচ্ছে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়ানো।'

—'ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই দাঁড়ায় বটে।'

—'তাহলে একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে আর চাকরি খুইয়ে সৌদামিনীদেবীকে নিশ্চয়ই আপনি ধন্যবাদ দেননি?'

—'বলা বাহুল্য।'

—'তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে করেছিলেন সৌদামিনীদেবীর বক্ষে ছুরিকাঘাত?'

—'আপনি কী আজগুবি কথা বলছেন!'

—'আপনি এক ঢিলে মারতে চেয়েছিলেন দুই পাখি। সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করে নিজে নিরাপদে থাকবার জন্যে সমস্ত সন্দেহ চালনা করতে চেয়েছিলেন এমন এক নিষ্পাপ নির্দোষ মহিলার দিকে, যার উপরে আপনি তুষ্ট ছিলেন না।'

—'কার উপরে আমি তুষ্ট ছিলুম না?'

—'মানসীদেবীর উপরে। এ কথা আমি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছি।'

—'একেবারে বাজে কথা।'

—'প্রথমত আপনি ছত্রপতির ছোরাখানা মানসীদেবীর আলমারিতে রাখেন। কিন্তু তারপরই বোধ করি আপনার মনে হয়, প্রমাণটা আরও দৃঢ় করা উচিত। মানসীদেবীর আলনা থেকে

আপনি তাঁর সায়াটা নামিয়ে নেন—সেটাও রক্তলিপ্ত করতে চান। সৌদামিনী দেবীর ঘরে গিয়ে মৃতদেহের ক্ষত থেকে রক্ত সংগ্রহ করা চলত কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে লাইব্রেরি থেকে মানসীদেবী এসে পড়তে পারতেন। আর-একটু দেরি করলেই সত্যসত্যই আপনি সেইদিনই হাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতেন, কারণ মানসীদেবী তখন নিজের ঘরের দিকেই আসছিলেন, আর আসতে আসতে দূর থেকে আপনার পলায়মান মূর্তি দেখেও চিনতে পারেননি। খুব চটপট কাজ সারবার জন্যে আপনি ছত্রপতির ছোরা দিয়েই নিজের বাঁ-হাতের এক জায়গা অল্প-একটু কেটে রক্তপাত করে সায়াটাকেও করেন রক্তাক্ত। তারপর ছোরা আর সায়া আলমারির ভিতরে গুঁজে রেখে পালিয়ে আসেন।'

পবিত্রবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আলমারির ভিতরে আপনি ছোরার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা রক্তমাখা সায়া পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'পেয়েছিলুম।'

—'সেটা কোথায় গেল?'

—'পুড়িয়ে ফেলেছি।'

—'আরও শুনুন পবিত্রবাবু। আপনি যে রোজ ডাক্তার ডি. এন. বসুর ডিসপেন্সারিতে আপনার বাঁ-হাতের ক্ষত 'ব্যান্ডেজ' করতে যান পুলিশ এ খবরও পেয়েছে। ছোরাখানা প্রাচীন। তাতে যে মরচে ধরছে তাও আমি দেখেছি। তাই আপনার সামান্য ক্ষত বিষিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। আপনি জামার বাঁ-আস্তিন গুটোন দেখি, তাহলে সকলেই ব্যান্ডেজ দেখতে পারে।'

পবিত্রবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমার হাতের ব্যান্ডেজ কি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করবে?'

—'আপনি আমার ঘরের জানলায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করতেন। কৌশলে আমি আপনার পদচিহ্ন সংগ্রহ করেছি। তার ছাঁচও উঠেছে। একটু মেলালেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন।'

পবিত্রবাবু এইবারে অধীর স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'আড়ি পেতে শোনা মানেই কি নরহত্যা করা? প্রমাণ দেখান, প্রমাণ দেখান! যত রাবিশ কথা।'

—'পবিত্রবাবু, তাহলে এইবারে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে হল। ছোরা দিয়ে বাঁ-হাত কাটবার পর রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আপনি নিজের রুমালখানা ক্ষতের উপরে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তবু তিন ফোঁটা রক্ত পড়েছিল ঘরের মেঝের উপরে। সেই রক্তাক্ত রুমালের উপরে ছিল আপনার ডানহাতের একটা আঙুলের ছাপ। কিন্তু আলমারির ভিতরে ছোরা আর সায়াটা রাখবার সময়ে রুমালখানাও যে ক্ষতস্থান থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, মনের

উত্তেজনায় আর তাড়াতাড়িতে আপনি তা একেবারেই টের পাননি। কাল পুলিশ এসে আপনাদের সকলকার ডানহাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, রুমালের উপরে আপনারই আঙুলের ছাপ। আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

পবিত্রবাবুর মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং ফুলে উঠল তাঁর কপালের দুই দিকের দুটো শির। তারপরই বিকট একটা চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুইবাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দুই হাত দিয়ে শূন্য আঁচড়াতে আঁচড়াতে দড়াম করে পড়ে গেলেন কক্ষতলে! মহা হই চই করে সকলে কাছে ছুটে এল। পবিত্রবাবুর দেহ দুই-তিন বার নড়ে-চড়ে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। তিনি সংবরণ করলেন ইহলীলা!

জয়ন্ত বললে, 'আর এখানে নয় মানিক, সরে পড়ি চলো। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত।'

জয়ন্ত ও মানিক নিজেদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছে এমন সময়ে সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'জয়ন্ত, একেবারে ডবল ট্রাজেডি! পবিত্রবাবুর কীর্তি শুনে আর মৃত্যু দেখে তাঁর স্ত্রী সুরবালারও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

জয়ন্ত দুঃখিতভাবে বললে, 'গোয়েন্দার কর্তব্য কী নিষ্ঠুর! আমাদের জন্যেই এই কাণ্ড! মারা গিয়েছিলেন কেবল সৌদামিনীদেবী। আমরা এসে মরাকে তো বাঁচাতে পারলুমই না, উলটে মারলুম আরও দুজন লোককে!'

মানসীকে সঙ্গে করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দ্বিজেন হাস্যমুখে বললে, 'না জয়ন্তবাবু, গোয়েন্দার কর্তব্যে মাধুর্যও আছে। আমরা তো মরতেই বসেছিলুম, আপনার জন্যেই আমরা আবার লাভ করলুম নবজীবন। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।' মানসীর সঙ্গে দ্বিজেন যুক্ত করে জানু পেতে জয়ন্তের সামনে উপবেশন করলে।

দুজনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জয়ন্ত প্রসন্ন মুখে বললে, 'প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনাদের যুক্তজীবনকে আনন্দময় করে তোলেন।' তারপর পকেট থেকে দ্বিজেনের দেওয়া চেকখানি বার করে সে আবার বললে, 'এই নিন আপনার চেক!'

দুই হাত জোড় করে দ্বিজেন বললে, 'ক্ষমা করবেন। ও চেক আপনারই।'

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে বললে, 'তাই নাকি! সুন্দরবাবু, ওষ্ঠাধরে একটা নতুন চুরোট ধারণ করুন তো! আচ্ছা এইবারে আপনার দেশলাইটা আমাকে দিন। দ্বিজেনবাবু, আগেকার শখের বাবুরা নাকি দশ টাকার নোট পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন। আমরাও বড়ো ছোটো মনুষ্য নই। এই দেখুন, আপনার চেকে অগ্নিসংযোগ করলুম, আর এই ভাবেই সুন্দরবাবুর শ্রীমুখ ধূম্র উদগীরণ করছে!'

মানিক বললে, 'অতুলনীয় দৃশ্য কাব্য! বিশ হাজার টাকার অগ্নি সংস্কার! এ দৃশ্য দেবতাদেরও লোভনীয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম'!

অজানা দ্বীপের রানি

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

গোড়ার কথা

ফুটবল খেলা শেষ। খেলার মাঠে বসে আমরা কয়বন্ধুতে মিলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ খেলোয়াড়দের চেয়ে, এ খেলা যারা দেখে তাদেরও খাটুনি হয় না বড়ো কম।

প্রথমে টিকিট কিনতেই তো জনতার ধাক্কায় আর কনুইয়ের গুঁতোয় জান হয় হয়রান, গতর যায় থেঁতো হয়ে; তারপর খেলা শুরু হবার আগে ঘণ্টা দুই-তিন ধরে রোদে বসে তেষ্টায় কাঠ হয়ে অপেক্ষা;—তারপর খেলার সময়ে উত্তেজিত হয়ে ষাঁড়ের মতন চিৎকার করা আর পাগলের মতন হাত-পা ছোড়া এবং মাঝে মাঝে গ্যালারি ভেঙে হুড়মুড় করে 'পপাত ধরণীতলে' হওয়া!—এর পরেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না করলে চলবে কেন?

'মোহনবাগান' যেদিন জেতে সেদিন উৎসাহ আর আনন্দের ভিতরে তলিয়ে যায় সব কষ্টই। কিন্তু মোহনবাগানকে আজ উপর-উপরি তিন-তিনটে আস্ত গোল হজম করতে দেখে আমাদেরও সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেছে!

অসিত অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে বলছিল, 'দুত্তের নিকুচি করেছে! আর খেলা দেখতে আসব না—যেদিন আসব, সেইদিনই হারবে? ডিসগ্রেসফুল!'

অমিয় বললে, 'এ কথা তো রোজই বলি, কিন্তু মোহনবাগান খেলবে শুনলে বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসেই বা থাকতে পারি কই?'

পরেশ বললে, 'ওই তো আমাদের রোগ; চড়ুকে পিঠ সড়সড় করে যে!'

নরেশ বললে, 'না এসেই বা করি কী বলো? বাঙালির জীবনে আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই তো। তবু আমাদেরই জাতভাইরা গোরাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, খানিকক্ষণ এটা দেখলেও রক্ত খানিকটা গরম হয়ে টগবগিয়ে ওঠে!'

বীরেনদা এতক্ষণ চুপ করে একপাশে বসে শিস দিচ্ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওঃ, ফুটবল খেলা দেখা যদি অ্যাডভেঞ্চার হয়, তাহলে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছোড়াও তো মস্ত বড়ো অ্যাডভেঞ্চার!'

বীরেনদা আমাদের সকলের চেয়ে তিন-চার বৎসরের বড়ো। তাই আমরা সকলেই তাকে অনেকটা দলপতির মতোই দেখি। তর্ক-বিতর্ক হলে তাকেই মধ্যস্থ মানি, বিপদে-আপদে তার কাছ থেকেই সাহায্য পাই। সে কুস্তি জানে, বক্সিং জানে, লাঠি তরোয়াল খেলতে জানে, জাপানি যুযুৎসুরও এমন-সব আশ্চর্য প্যাঁচ জানে যে, তার চেয়ে ঢের বড়ো জোয়ানকেও চোখের নিমেষে তুলে আছাড় মারতে পারে। তার উৎসাহে আমরাও রোজ ব্যায়াম করি বটে, কিন্তু গায়ের জোরে আমরা কেউ তার কাছ দিয়েও যাই না।

এ-হেন বীরেনদা হঠাৎ প্রতিবাদ করাতে সকলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বীরেনদা একটু থেমে আবার বললে, 'অ্যাডভেঞ্চারের কথা তো বললে, কিন্তু আসল শক্তি আছে কি?'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার কথায় আমরা তো শক্তিচর্চায় অবহেলা করি না! আমাদের গায়ে তোমার মতো জোর না থাকলেও, আমরাও নেহাত দুর্বল নই তো!'

বীরেনদা বললে, 'আমি সে-শক্তির কথা বলছি না—সে তো পশুর শক্তি! সাহস, সাহস—সাহসই হচ্ছে আসল শক্তি! মোষের চেয়ে চিতেবাঘের গায়ে ঢের কম জোর। তবু চিতেবাঘের কবলে মোষ যে মারা পড়ে তার কারণ মোষ হচ্ছে চিতের চেয়ে কম-সাহসী জীব। সহজে পোষ মানে, সহজে মারা পড়ে। বাঙালিরও আসল অভাব সাহসের,—তার মুখে তাই অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলে আমার হাসি পায়।'

নরেশ বললে, 'বীরেনদা, আমাদের যে সাহসেরও অভাব আছে, এমন কথাই বা তুমি মনে করছ কেন?'

বীরেনদা বললে, 'মনে করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে! ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া, তাতে আর কতটুকু সাহসের দরকার! কিন্তু বাঙালির সেটুকু সাহসও নেই! তারা ঘরের কোণে শুয়ে রোগে ভুগে মরবে, তবু চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবে না।'

পরেশ বললে, 'কিন্তু আমরা সে দলে নই। আমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছি—কোথায় যেতে হবে বলো!'

গম্ভীর মুখে বীরেনদা বললে, 'তাহলে চলো দেখি আমার সঙ্গে!'

—'কোথায়?'

—'কাম্বোডিয়ায়!'

—'কাম্বোডিয়ায়? স্যায়ামের কাছে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যায়ামের কাছে! পারবে যেতে?'

সবাই চুপ।

বীরেনদা হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'কী, আর কারুর মুখেই রা নেই যে? এই না বললে, তোমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছ?'

—'হ্যাঁ', রাজি আছি। আগ্রা চল, দিল্লি চল, আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এককথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে কি রাজি হওয়া চলে?'

—'নিশ্চয়ই চলে,—তাকেই তো বলি অ্যাডভেঞ্চার! কাম্বোডিয়া তো ভারতের দরজার কাছে, যারা অ্যাডভেঞ্চার চায় তারা এককথায় উত্তরমেরুর ওপারেও যেতে রাজি হবে! দিল্লি-আগ্রা তো একটা শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরিটা কী?'

অসিত বললে, 'বীরেনদা, তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করছ? সত্যিই কি তুমি কাম্বোডিয়ায় যেতে চাও?'

—'আমার যে কথা, সেই কাজ। আজ ক-দিন ধরে আমার মনে কাম্বোডিয়ায় যাবার সাধ হয়েছে। সেদিন সেখানকার ওঙ্কারধাম নামে এক মন্দিরের কথা পড়লুম। সেখানে নাকি বিরাট এক নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, আর তার ভেতরে এক অদ্ভুত মন্দির! সে-সব প্রাচীন ভারতবাসীর কীর্তি, আর সে কীর্তির কাছে নাকি জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, সাঁচীর মন্দিরও ম্লান হয়ে যায়, জানো, আমি আমার ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসি? তাই ভারতের সেই অমরকীর্তি আমি দেখতে যাব!'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার সঙ্গে আমি যাব!'

বীরেনদা আনন্দে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে, 'সত্যি? সত্যি বলছ সরল?'

আমি হেসে বললুম, 'আমার নামও সরল, আমি কথাও কই সরল ভাষায়। যখন যাব বলছি, নিশ্চয়ই যাব!'

বীরেনদা বললে, 'শুনে সুখী হলুম। কিন্তু সরল, ভেবে দ্যাখো, ওঙ্কারধামে যেতে গেলে বাবুয়ানা চলবে না, আরামেরও সম্ভাবনা নেই প্রথম কয়দিন কাটবে জাহাজে—অগাধ, অপার সমুদ্রের উপরে। তারপরে রেলগাড়ি, তারপর কীসের গাড়ি—তা জানি না। হয়তো ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে প্রাণটি হাতে করে।'

—'প্রাণ হাতে করে কেন?'

—'ওঙ্কারধামের ত্রিসীমানার ভিতরে লোকালয় নেই। ক্রোশের পরে ক্রোশ খালি জঙ্গল আর জঙ্গল—তেমন জঙ্গল হয়তো আমরা জীবনে চোখেও দেখিনি! গভীর অরণ্যের ভিতরে সেই প্রাচীন মন্দির আর শহরের ধ্বংসাবশেষ! অতি সাহসীরও বুক সেখানে যেতে ভয়ে কাঁপতে পারে। সেখানে মানুষের বাস নেই বটে, কিন্তু তবু মানুষ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে সে-সব মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের জীবন নিয়ে তারা যে টানাটানি করবে না, একথাও জোর করে বলা যায় না। তার ওপরে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সাপেরা সেখানে নিত্যই হোম-রুল-এর স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমাদের মতন অতিথিদের দেখলে তারা আদর করবে না নিশ্চয়ই, কারণ তারা এখনও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়নি। তার ওপরে আছে রোগের ভয়, দৈব-দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিছু হলে ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও খবর দেওয়া চলবে না, অ্যাম্বুলেন্স-কার-ও ডাকা যাবে না। এ-সব কথা তলিয়ে ভেবে দ্যাখো, সরল!'

দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না বীরেনদা, আমি খালি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

অমিয় আচম্বিতে বলে উঠল, 'আমিও কিছু ভাবব না বীরেনদা, তোমার সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব।'

বীরেনদা সবিস্ময়ে বললে, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!'

—'কেন যাব না, আমি কি কাপুরুষ?'

—'না, তোমার কথা শুনে তোমাকে আর কাপুরুষ বলতে পারি না, কিন্তু তুমি

এ-হেন বীরেনদা হঠাৎ প্রতিবাদ করাতে সকলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বীরেনদা একটু থেমে আবার বললে, 'অ্যাডভেঞ্চারের কথা তো বললে, কিন্তু আসল শক্তি আছে কি?'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার কথায় আমরা তো শক্তিচর্চায় অবহেলা করি না! আমাদের গায়ে তোমার মতো জোর না থাকলেও, আমরাও নেহাত দুর্বল নই তো!'

বীরেনদা বললে, 'আমি সে-শক্তির কথা বলছি না—সে তো পশুর শক্তি! সাহস, সাহস—সাহসই হচ্ছে আসল শক্তি! মোষের চেয়ে চিতেবাঘের গায়ে ঢের কম জোর। তবু চিতেবাঘের কবলে মোষ যে মারা পড়ে তার কারণ মোষ হচ্ছে চিতের চেয়ে কম-সাহসী জীব। সহজে পোষ মানে, সহজে মারা পড়ে। বাঙালিরও আসল অভাব সাহসের,—তার মুখে তাই অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলে আমার হাসি পায়।'

নরেশ বললে, 'বীরেনদা, আমাদের যে সাহসেরও অভাব আছে, এমন কথাই বা তুমি মনে করছ কেন?'

বীরেনদা বললে, 'মনে করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে! ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া, তাতে আর কতটুকু সাহসের দরকার! কিন্তু বাঙালির সেটুকু সাহসও নেই! তারা ঘরের কোণে শুয়ে রোগে ভুগে মরবে, তবু চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবে না।'

পরেশ বললে, 'কিন্তু আমরা সে দলে নই। আমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছি—কোথায় যেতে হবে বলো!'

গম্ভীর মুখে বীরেনদা বললে, 'তাহলে চলো দেখি আমার সঙ্গে!'

—'কোথায়?'

—'কাম্বোডিয়ায়!'

—'কাম্বোডিয়ায়? স্যায়ামের কাছে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যায়ামের কাছে! পারবে যেতে?'

সবাই চুপ।

বীরেনদা হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'কী, আর কারুর মুখেই রা নেই যে? এই না বললে, তোমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছ?'

—'হ্যাঁ', রাজি আছি। আগ্রা চল, দিল্লি চল, আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এককথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে কি রাজি হওয়া চলে?'

—'নিশ্চয়ই চলে,—তাকেই তো বলি অ্যাডভেঞ্চার! কাম্বোডিয়া তো ভারতের দরজার কাছে, যারা অ্যাডভেঞ্চার চায় তারা এককথায় উত্তরমেরুর ওপারেও যেতে রাজি হবে! দিল্লি-আগ্রা তো একটা শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরিটা কী?'

অসিত বললে, 'বীরেনদা, তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করছ? সত্যিই কি তুমি কাম্বোডিয়ায় যেতে চাও?'

—'আমার যে কথা, সেই কাজ। আজ ক-দিন ধরে আমার মনে কাম্বোডিয়ায় যাবার সাধ হয়েছে। সেদিন সেখানকার ওঙ্কারধাম নামে এক মন্দিরের কথা পড়লুম। সেখানে নাকি বিরাট এক নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, আর তার ভেতরে এক অদ্ভুত মন্দির! সে-সব প্রাচীন ভারতবাসীর কীর্তি, আর সে কীর্তির কাছে নাকি জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, সাঁচীর মন্দিরও ম্লান হয়ে যায়, জানো, আমি আমার ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসি? তাই ভারতের সেই অমরকীর্তি আমি দেখতে যাব!'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার সঙ্গে আমি যাব!'

বীরেনদা আনন্দে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে, 'সত্যি? সত্যি বলছ সরল?'

আমি হেসে বললুম, 'আমার নামও সরল, আমি কথাও কই সরল ভাষায়। যখন যাব বলছি, নিশ্চয়ই যাব!'

বীরেনদা বললে, 'শুনে সুখী হলুম। কিন্তু সরল, ভেবে দ্যাখো, ওঙ্কারধামে যেতে গেলে বাবুয়ানা চলবে না, আরামেরও সম্ভাবনা নেই প্রথম কয়দিন কাটবে জাহাজে—অগাধ, অপার সমুদ্রের উপরে। তারপরে রেলগাড়ি, তারপর কীসের গাড়ি—তা জানি না। হয়তো ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে প্রাণটি হাতে করে।'

—'প্রাণ হাতে করে কেন?'

—'ওঙ্কারধামের ত্রিসীমানার ভিতরে লোকালয় নেই। ক্রোশের পরে ক্রোশ খালি জঙ্গল আর জঙ্গল—তেমন জঙ্গল হয়তো আমরা জীবনে চোখেও দেখিনি! গভীর অরণ্যের ভিতরে সেই প্রাচীন মন্দির আর শহরের ধ্বংসাবশেষ! অতি সাহসীরও বুক সেখানে যেতে ভয়ে কাঁপতে পারে। সেখানে মানুষের বাস নেই বটে, কিন্তু তবু মানুষ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে সে-সব মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের জীবন নিয়ে তারা যে টানাটানি করবে না, একথাও জোর করে বলা যায় না। তার ওপরে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সাপেরা সেখানে নিত্যই হোম-রুল-এর স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমাদের মতন অতিথিদের দেখলে তারা আদর করবে না নিশ্চয়ই, কারণ তারা এখনও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়নি। তার ওপরে আছে রোগের ভয়, দৈব-দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিছু হলে ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও খবর দেওয়া চলবে না, অ্যাম্বুলেন্স-কার-ও ডাকা যাবে না। এ-সব কথা তলিয়ে ভেবে দ্যাখো, সরল!'

দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না বীরেনদা, আমি খালি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

অমিয় আচম্বিতে বলে উঠল, 'আমিও কিছু ভাবব না বীরেনদা, তোমার সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব।'

বীরেনদা সবিস্ময়ে বললে, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!'

—'কেন যাব না, আমি কি কাপুরুষ?'

—'না, তোমার কথা শুনে তোমাকে আর কাপুরুষ বলতে পারি না, কিন্তু তুমি

আমাদের সঙ্গে কেমন করে যাবে? তুমি তো সরলের মতন স্বাধীন নও, তোমার মা আছেন, বাবা আছেন। তাঁরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন?'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা, মা-বাবাকে রাজি করাবার ভার আমার ওপরে রইল। বীরেনদা, তুমি জানো না তোমার ওপরে আমার মা আর বাবার কতখানি শ্রদ্ধা! এই সেদিন কথায় কথায় বাবা বলছিলেন, 'বীরেন সঙ্গে থাকলে অমিয়কে আমি যমেরও মুখে ছেড়ে দিতে পারি। বীরেন যে দুর্ভেদ্য বর্ম—দেবরাজের বজ্রও সে বর্মে লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।' তুমি কি মনে করো বীরেনদা, আমার বাবা মিছে কথা বলছিলেন?'

বীরেনদা মৃদু মৃদু হেসে বললে, 'না, তা বলি না, তবে তাঁর বিশ্বাস অন্ধ হতেও পারে তো?'

অমিয় বললে, 'তোমাকে যে চিনেছে সেই-ই এই কথা বলবে। তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না। আমি তোমার সঙ্গে যাব বীরেনদা!'

—'বেশ, তোমার মা-বাবা যদি মত দেন, আমারও অমত নেই।'

আমি বললুম, 'তাহলে কবে আমরা রওনা হচ্ছি?'

—'দু-হপ্তার ভেতরে। কিন্তু যাবার আগে তিনটে বন্দুকের পাস চাই। রিভলভার তো আমার কাছেই আছে। জঙ্গলের ভেতরে বন্দুক-রিভলভারের মতন বন্ধু আর নেই।'

অসিত বললে, 'তাহলে সত্যিই তোমরা যাবে?'

বীরেনদা বললে, 'তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

পরেশ বললে, 'আমি একে সাহস বলি না, এ হচ্ছে গোঁয়ারতুমি।'

নরেশ বললে, 'তা নয় তো কী!'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, আমরা একটু গোঁয়ারতুমি করেই দেখি না কেন? তোমাদের মতন বুদ্ধিমান মাথা-ঠান্ডা লোকেদের অ্যাডভেঞ্চার-এর জন্যে ফুটবল খেলার মাঠ আছে, বায়স্কোপের ছবি আছে, ট্রামগাড়ির বাঁধানো রাস্তা আছে, আর ম্যালেরিয়া জ্বরে শুয়ে শুয়ে আরাম করে কাঁপবার জন্যে নরম বিছানা আর পুরু লেপ আছে। কিন্তু গোঁয়াররা উড়োজাহাজ চড়ে, হিমালয়ের টঙে ঠান্ডা হাওয়া খেতে ওঠে, সাব মেরিনে বসে সমুদ্রের অতলে ডুব দেয়—খালি মরবার জন্যেই। কিন্তু তারা না মরলে তো সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বাঁচতে পারত না! গোঁয়াররা মরতে জানে বলেই মানুষ হয়েছে আজ শ্রেষ্ঠ জীব!'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভারতের অশ্রু

নীলিমার অসীম জগতে চলেছি, ভেসে চলেছি!

মাথার উপরে প্রশান্ত নীল আকাশ, পায়ের তলায় অশান্ত নীল সাগর,—যেদিকে তাকাই, আর কোনও রং নেই! বিশ্বময় যেন থই থই করছে নীলিমা!

এরই মাঝখান দিয়ে জাহাজ ভেসে চলেছে সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মতো, এমন এঁকে রেখে, নীল পটে সাদা ফেন-আলপনায় দীঘল রেখা!

পৃথিবীর মাটির গান আর শোনা যায় না—বনের মর্মর, পাখির রাগিণী, নদীর তান! বাতাস শুধু মাটির স্মৃতি বহন করে আনছে, কিন্তু তার উদাসী নিশ্বাস আজ হারিয়ে ফেলেছে ফুলের মৃদু গন্ধ!

কী বিস্ময়! কী আনন্দ!—চারিদিক থেকে আজ যেন আমাদের আকুল আহ্বান করছে অনন্ত!

অমিয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'বীরেনদা, বীরেনদা! আমাদের এতদিনের চেনা পৃথিবী যে দু-দিনেই এমন অচেনা হয়ে উঠতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তো!'

বীরেনদা হেসে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'মায়ের কোলে শুয়ে আর ইস্কুল-বই পড়ে কি পৃথিবীকে চেনা যায় ভাই? কূপে বসে ব্যাং যেমন দেখে জগৎ কূপের মতো, ঘরে বসে আমরাও তেমনি দেখি পৃথিবীকে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দিনীর মতো! কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি,—স্বাধীনতার যে কত রূপ এবারে আমরা চোখের সামনে তা দেখতে পাব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেশের জন্যে আমার বড়ো মন কেমন করছে বীরেনদা! মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত রূপই থাক, আমার বাংলা দেশে বসে সবুজ গাছপালার ভিতরে, ধান-দোলানো সোনা-ছড়ানো মাঠের উপরে যে অপরূপ রূপ দেখি, সে রূপের চেয়ে মিষ্টি যেন আর কিছুই নেই!'

বীরেনদা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমি বললুম, 'তুমি হাসছ বীরেনদা? কুনো বাঙালি ভেবে মনে মনে আমাকে বুঝি ঘৃণা করছ?'

বীরেনদা গম্ভীর হয়ে বললে, 'না ভাই সরল, আমি কি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি? তুমি মানুষ, তাই দেশের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদছে! তোমাকে শ্রদ্ধা করি। দ্যাখো না, এই যে ইংরেজ জাত, দেশ ছেড়ে তারা পৃথিবীর কোথায় না যায়? তা বলে তাদের প্রাণ কি কাঁদে না? কাঁদে বই কি! তবু তারা দেশ ছাড়ে দেশকেই বড়ো করবার জন্যে। কিন্তু তারা যেখানেই থাক—আফ্রিকার জঙ্গলে, সাহারার মরুপ্রান্তরে আর হিমালয়ের তুষার-শিখরে

বসে তারা শুধু এক গানই গাইবে—'হোম, হোম, সুইট হোম'। বিলাতের কুয়াশাকেও তারা ভালোবাসে। আর আমাদের বাবুসাহেবরা? বিলাতে গিয়ে তাঁরা স্বদেশই ভুলতে চান! পরেন হ্যাট-কোট, ধরেন ফিরিঙ্গি চাল আর স্বপ্ন দেখেন ইংরেজিতে! বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়া তাঁদের কাছে জাঁকের কথা! তাদের আমি ঘৃণা করি সরল, কারণ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি',—এ গান তারা গাইতে জানে না! দেশের জন্যে আমাদের মন কাঁদবে বই কি,—আমরা তো দেশকে ভোলবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছি না ভাই, আমরা যে যাচ্ছি স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে!'

অমিয় বললে, 'স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে?'

—'হ্যাঁ ভাই! আমরা যাচ্ছি আমাদের সোনার ভারতের গৌরব দেখবার জন্যে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে ভারতের বাইরে বসেও ভারতের মূর্তিকে আরও বড়ো করে দেখতে পাব।'

আমি বললুম, 'ওঙ্কারধাম তো অজন্তা, ইলোরা, ভুবনেশ্বরের কি মাদুরার মন্দিরের মতনই একটি মন্দির?'

—'না, ওঙ্কার হচ্ছে প্রাচীন হিন্দুজাতির আরও বড়ো কীর্তি, তোমার ইলোরা কি ভুবনেশ্বরের মন্দির বিপুলতায় তার কাছে দাঁড়াতেও পারে না। সাগর পার হয়ে কৌণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় দুই হাজার বছর আগে কাম্বোজে হিন্দু রাজত্বের সূচনা করেন। কয় শত বৎসর পরে সেই ছোটো উপনিবেশ একটা বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তার রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর। আমরা ভারতের বাইরে সেই ভারতকেই দেখতে চলেছি—যেখানে সাতশো বছর ধরে উড়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বিজয়-পতাকা। যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষ আজ ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে, তার অগুনতি মন্দিরের ভিতরে একটিতেও আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার মানুষ নেই। দেশের জন্যে এখনই তোমার প্রাণ কাঁদছে তো সরল, কিন্তু যশোধরপুরে গিয়ে আমরা কী করব বলো দেখি?'

—'আমরা কী করব বীরেনদা?'

—'কাঁদব!'

—'কাঁদব! কেন?'

—'একদিন যে হিন্দু নিজের বীরত্বে সমুদ্রের ওপারে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, ভারতের বাইরেও ভারতবাসীর জন্যে নতুন আর স্বাধীন স্বদেশ তৈরি করেছিল, আজ তারই সন্তানের সেখানে গিয়ে কাঁদবার অধিকার ছাড়া আর কোনও অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ সরল, যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষের উপরে আমরা কেবল ফোঁটা-কয়েক অশ্রু রেখে আসব।'

বলতে বলতে বীরেনদার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল, আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম তার দুই চোখে ভরে উঠেছে অশ্রুজল।

ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসে বীরেনদা!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জাগরণের দেশ

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছল। জাহাজ এখানে অনেকক্ষণ থামবে শুনে আমরা তীরে নেমে পড়লুম। আজ ক-দিন পরে ডাঙার মানুষ পায়ের তলায় আবার মাটিকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সিঙ্গাপুরের কথা সকলেই জানেন, কাজেই সে কথা আমি আর এখানে বলতে চাই না।

সিঙ্গাপুরে নানাজাতীয় রকম-বেরকমের মুখ দেখলুম—এ শহরটা যেন দুনিয়ার নানা জাতির চেহারার নমুনা নেবার জায়গা। এখান থেকে আমরা কোচিন-চিনের বন্দর সাইগনে যাত্রা করব—সেও প্রায় চার দিনের পথ। তার পর সেখান থেকে যাব যশোধরপুরের ওঙ্কারধামে।

জাহাজ যখন সিঙ্গাপুর ছাড়ল, দেখলুম যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই নতুন যাত্রীরা সবাই প্রায় চিনেম্যান।

অমিয় বললে, 'এইবার থেকে থ্যাবড়া-নাকের দেশ শুরু হবে!'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, এইবার থেকে স্বাধীন এশিয়া শুরু হবে! ঘুমের দেশ থেকে এইবার আমরা জাগরণের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—যে-দেশ সাদা চামড়ার লোহার বেড়ি পায়ে পরেনি!'

আমরা চলেছি উত্তর দিকে—বাঁ দিকে আছে মালয় উপদ্বীপ।...

দ্বিতীয় দিনের রাত্রে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল!—জেগে উঠেই শুনি ভীষণ গোলমাল, বন্দুকের শব্দ, অনেকগুলো পায়ের ছুটো-ছুটির আওয়াজ, অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার আর আর্তনাদ!

আমাদের দুজনকে কামরা থেকে বেরুতে বারণ করে বীরেনদা তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল।

হতভম্বের মতন বসে আছি, বীরেনদা আবার দ্রুতপদে ফিরে এসে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে—তার মুখ বিবর্ণ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হয়েছে বীরেনদা?'

—'বোম্বেটে!'

—'বোম্বেটে?'

—'হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর থেকে একদল বোম্বেটে যাত্রী সেজে জাহাজের উপরে উঠেছিল। তারা জাহাজের লোকদের আক্রমণ করেছে!'

আমি আর অমিয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

বীরেনদা বললে, 'এই চিনে-সমুদ্র হচ্ছে বোম্বেটের স্বর্গ! এ বোম্বেটেরা বড়ো নিষ্ঠুর, কারুকে এরা ক্ষমা করে না।—সরল, অমিয়!'

বন্দুকের বাক্স খুলতে খুলতে আমি বললুম, 'তাহলে কি আমাদের এখন বোম্বেটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?'

—'বোম্বেটেরা দলে ভারী, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। তবে এও ঠিক যে, আমরা কাপুরুষের মতন মরব না। কী বলো সরল? কী বলো অমিয়?'

বন্দুকে টোটা পুরতে পুরতে আমি বললুম, 'মরি যদি, মেরে মরব!'

অমিয় বীরেনদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তো আগেই বলেছি বীরেনদা, তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না!'

বীরেনদা বললে, 'জানি, তোমরা হচ্ছ খাঁটি ইস্পাত, দুমড়োলেও ভাঙবে না!'

বাইরে যাত্রীদের কান্না আর বোম্বেটেদের চিৎকার আরও বেড়ে উঠল।

বীরেনদা বললে, 'কাপুরুষদের কান্না শোনো! ওরা ভুলে গেছে, কেঁদে কেউ কোনওদিন বাঁচতে পারে না!'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, লড়াই করবার জন্যে আমার হাতদুটো নিসপিস করছে!'

—'সব যথাসময়ে ভাই, সব যথাসময়ে! মরবার সময় এলে হাসিমুখেই মরব, কিন্তু এখন দেখা যাক বাঁচবার কোনও উপায় আছে কি না!'

আমি বললুম, 'ডাঙা হলেও কথা ছিল, কিন্তু এ যে অগাধ সমুদ্র বীরেনদা! মুক্তির কোনোই উপায় নেই!'

—'গোলমালটা হচ্ছে জাহাজের বাঁ দিকে। ডান দিকে কোনও সাড়া শব্দ নেই! আচ্ছা, তোমরা আমার পিছনে চুপি চুপি এসো! আমি না বললে কিন্তু বন্দুক ছুড়ো না।' —এই বলে বীরেনদা কামরার দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বাঁ দিকে একবার চেয়ে দেখলে। তারপর আমাদের ইঙ্গিত করে ডান দিকের পথ ধরলে। আমরা দুজনে গুড়ি মেরে তার পিছনে পিছনে চললুম।

জাহাজের এদিকটা অন্ধকার, সমুদ্রের বুকে অন্ধকার, আকাশেও আলোর-রেখা নেই।

আচম্বিতে কী-একটা শব্দ হল, পরমুহূর্তেই বীরেনদা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তার পরেই সমুদ্রের ভিতর ঝপাং করে আর-একটা শব্দ!

কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা দুজনেও দাঁড়িয়ে পড়লুম।

চুপিচুপি বললুম, 'কী হল বীরেনদা?'

—'একটা বোম্বেটে কমল! অন্ধকারের ভেতর থেকে লোকটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে জানত না যে আমার এই হাতদুটো ছ-মন বোঝা তুলতে পারে! তোমরা টের পাবার আগেই, একটা টুঁ-শব্দ করতে না করতেই তাকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছি! পাতালে যেতে তার আর দেরি লাগবে না!'

যে-হাত এত সহজে এমন কাণ্ড করতে পারে, অন্য সময় হলে সে-হাতের শক্তির কথা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতুম! কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই, কারণ পিছনে কাদের চিৎকার আর পদশব্দ শুনলুম!

বীরেনদা বললে, 'সাবধান! দৌড়ে আমার সঙ্গে এসো!'

কিন্তু বেশি দূর দৌড়তে হল না,—আমরা একেবারে জাহাজের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। তারপরেই রেলিং, আর তার নীচেই সমুদ্র!

বীরেনদা বললে, 'আপাতত আমরা বেঁচে গেলুম!'

—'কী করে বীরেনদা, বোম্বেটেরা যে এসে পড়ল!'

—'না, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। এদিকে কোনও কামরা নেই, ওরা বোধ হয় খানিকক্ষণ এদিকে আসবে না। কিন্তু তার আগেই আমরা নিরাপদ হতে চাই! আমি এদিকে এসেছি কেন জানো? এই দড়িগুলোর জন্যে! এই দড়িগুলো যে এখানে আছে, আমি দিনের বেলাতেই তা দেখেছিলুম।'

সেখানে অনেকগুলো কাছি কুণ্ডলী-পাকানো অজগরের মতন পড়ে আছে বটে!

আমি বললুম, 'কিন্তু এ দড়িগুলো নিয়ে আমরা করব কী?'

বীরেনদা বললে, 'দেখছ, এই দড়িগুলো জাহাজের সঙ্গে বাঁধাই আছে? তিনগাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে, আপাতত আমরা কি আর-একটা রাত দড়ি ধরে ভাসতে পারব না?'

—'কিন্তু তারপর?'

—'পরের কথা পরে ভাবা যাবে! আবার পায়ের শব্দ শুনছি, নাও—আর দেরি নয়!'

বীরেনদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক এক গাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দিলুম। অনেক জিমনাস্টিক করেছি, সুতরাং দড়িগুলো ধরে নীচে নেমে যেতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হল না!

সমুদ্রের জল যখন আমার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করেছে, বীরেনদা হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'আমরা অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছিলুম, কিন্তু আর তাকে খুঁজতে হবে না, কী বলো সরল?'

আমি বললুম, 'তবে এ অ্যাডভেঞ্চার-এর গল্প দেশে গিয়ে করতে পারব না, এই যা দুঃখ!'

অমিয় বললে, 'সেদিন তুমি বলছিলে না বীরেনদা, আমরা জাগরণের দেশের দিকে যাচ্ছি? সে কথা ঠিক! আজ সারা রাতই আমাদের আর ঘুমোতে হবে না!'

আমি বললুম, 'হায় হায়! তিন-তিনটে ভারত-সন্তান জেগে উঠে মোটা কাছি নিয়ে গভীর রাতে যে আজ সাগর-মন্থনে নেমেছেন, যাঁরা স্বদেশি কবিতা লেখেন এ দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন না তো!'

অমিয় দড়ি ধরে ভাসতে ভাসতে গুনগুন করে একটা হাসির গান গাইতে লাগল এবং তার সঙ্গে শিস দিতে শুরু করলে বীরেনদা।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

মস্তবড়ো হাঁ আর ধারালো দাঁত

অন্ধকারের তরঙ্গ বইছে মাথার উপরে,—সমুদ্রের তরঙ্গ বইছে দেহের চারিপাশ ঘিরে!—দড়ি ধরে আমরা ভাসছি আর ভাসছি, যা দেখছি আর অনুভব করছি এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন?

হঠাৎ আমাদের আশেপাশে ঝপাং করে শব্দ হতে লাগল!—যেন উপর থেকে কী সব পড়ছে! ভাবলুম, বোম্বেটেরা নিশ্চয় টের পেয়েছে যে, জাহাজের সঙ্গে আমরাও দড়ি ধরে ভেসে চলেছি, তাই আমাদের মারবার জন্যে ভারী ভারী জিনিস ছুড়ছে।

কিন্তু বীরেনদা বললে, 'আমি শুনেছি, বোম্বেটেরা যখন জাহাজ দখল করে তখন মাঝে মাঝে যাত্রীদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। আমাদের চারিদিকে যেসব শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় তা এক-একটা লাশ পড়ার শব্দ!'

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল!—জাহাজের উপরে থাকলে আমাদেরও তো এই অবস্থা হত! এতক্ষণে আমাদেরও দেহ হয়তো চিন-সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলে যেত কোথায় কে জানে!

আচম্বিতে আমার খুব কাছেই একটা শব্দ হল—এত কাছে যে, সমুদ্রের জল ছিটকে আমার চোখে-মুখে লাগল! একটু পরেই কি একটা জিনিস আমার গায়ে এসে ঠেকল! হাত দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিতে গিয়েই বুঝলুম, মানুষের দেহই বটে!—ঠান্ডা, অস্বাভাবিক ঠান্ডা, জ্যান্ত মানুষের দেহ এত ঠান্ডা হয় না!

তাড়াতাড়ি দেহটাকে দূরে ঠেলে আমি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলুম!

বীরেনদা বললে, 'কী হল, কী হল সরল?'

আমি শিউরোতে শিউরোতে বললুম, 'একটা মড়া! আমি একটা মড়ার গায়ে হাত দিয়েছি।'

বীরেনদা বললে, 'সেজন্যে আঁতকে উঠলে কেন?'

—'জীবনে এই প্রথম আমি মড়ার গায়ে হাত দিলুম! হাত দিতেই আমার দেহের ভিতরটা যেন কীরকম করে উঠল!'

—'সেজন্যে আজ আঁতকে উঠে লাভ নেই সরল! যে-অবস্থায় আমরা পড়েছি, কালকে হয়তো আমাদেরই ওই-রকম মড়া হতে হবে! রবিঠাকুরের ভাষায় এখন আমাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'—প্রাণ নিয়ে এখন আমাদের খেলা করতে হবে—তা সে প্রাণ নিজেরই হোক, আর পরেরই হোক!'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, সেদিন একটি কবিতা পড়েছিলুম আজ আমার তাই মনে হচ্ছে!'

বীরেনদা বললে, 'শাবাশ অমিয়, তুমি বাহাদুর ছেলে বটে! এমন সময়েও তোমার কবিতার কথা মনে হচ্ছে?'

—'কবিতার খানিকটা শোনো :

মরণ আমার খেলার সাথি,
জীবনও মোর তাই,
এই দুনিয়ায় খেলতে আসা;
ভাবনা কিছুই নাই!
নেচে বেড়াই দরাজ বুকে,
অট্টহাসি হাসছি মুখে,
বাঁচি যেমন পরম সুখে,
মরেও আমোদ পাই—
হো হো, ভাবনা কিছুই নাই!—

সত্যি বলছি বীরেনদা, আজকের রাতটিকে আমার ভারী ভালো লাগছে!'

প্রথম সূর্যোদয় দেখলুম! কালকের রাতে যে-সব হতভাগ্যের বুকের রক্ত সমুদ্রের ওপরে ঝরে পড়েছে, যেন তাই মেখেই রাঙা হয়ে জলের ভিতর থেকে সূর্যদেব আজ তাঁর মাথা তুলে নীলাকাশের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন!

কোনওদিকে তীরের আভাস পেলুম না—থই থই করছে খালি অনন্ত নীল জল। জাহাজের ওপরে নিরাপদে বসে এই কয়দিন সমুদ্রকে যেমন মধুর লাগছিল, আজ আর তেমনটি লাগল না।

সারা রাত জলে থেকে এখন সকালের বাতাসে দেহের ভিতরে শীতের কাঁপুনি ধরল। তার উপরে নানান ভাবনা। সমুদ্রে ভেসে না-হয় বোম্বেটের ছুরি থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছি, কিন্তু মানুষের দেহ তো লোহা কি পাথর নয়, এমন ভাবে জলের ভিতরে আর ক-দিন থাকতে পারব? আর না হয় জলেরই ভিতরে কোনওরকমে রইলুম, কিন্তু কী খেয়ে বেঁচে থাকব?

অমিয় আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঙর! হাঙর!'

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, মস্তবড়ো একটা হাঁ, আর তার ভিতরে কতকগুলো ধারালো চকচকে দাঁত! সাদা মাছের মতো প্রকাণ্ড একটা দেহও চোখে পড়ল! কিন্তু পরমুহূর্তেই দেহটা জলের ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়ে মিলিয়ে গেল।

বীরেনদা দড়ি ধরে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, 'ওপরে ওঠো, ওপরে ওঠো!'

অমিয়ের সঙ্গে আমিও দড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলুম এবং পরপলকেই দেখলুম, হাঙরটা ঠিক আমাদের নীচে এসে হাজির হয়েছে!

শিকার পালিয়েছে দেখে সে যে খুবই খাপ্পা হয়েছে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে জল থেকে

আমাদের দিকে আমাদের মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করলে, কিন্তু আমরা তখন তার নাগালের বাইরে।

তবু সে আশা ছাড়লে না—জাহাজের পিছনে পিছনে আসতে এবং মাঝে মাঝে দাঁত বার করে কুৎসিত হাই তুলতে লাগল!

এদিকে দড়ি ধরে ওপরে ঝুলতে ঝুলতে আমাদের হাত ভেরে এল—অথচ আমাদের এখন ওপরে ওঠবারও জো নেই বোম্বেটের ভয়ে এবং জলে নামবারও উপায় নেই হাঙরের ভয়ে!

এমন সময়েও আমি ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী ভায়া, এমন অবস্থায় পড়লে তোমার কবি কী বলতেন? মরণকে কি তাঁর খেলার সাথি বলে মনে হত?'

অমিয় তখনও দমবার পাত্র নয়। সে হেসে বললে, 'আচ্ছা সরলদা, হাঙরের ক-টা দাঁত আছে গুনে দ্যাখো দেখি।'

আমি অগত্যা মনে মনে হার মেনে প্রকাশ্যে বললুম, 'সেজন্যে এখনই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটু পরে সকলকেই তো হাঙরের পেটের ভিতর ঢুকতে হবে, তখন দাঁত গুনে দেখবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!'

অমিয়ের মুখ তখন রাঙা-টকটকে হয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে চাপতে চাপতে বললে, 'না সরলদা, আমাকে কিন্তু এখনই মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আমার হাত একেবারে অবশ হয়ে গেছে, আমাকে এখনই হাঙরের পেটের ভিতরেই যাত্রা করতে হবে!'

বীরেনদা তাড়াতাড়ি জামার ভিতর দিকে হাত চালিয়ে একটা রিভলভার বার করে বললে, 'বোম্বেটেরা পাছে শুনতে পায় সেই ভয়ে এতক্ষণ রিভলভার ছুড়তে পারছিলুম না। কিন্তু এখন দেখছি না ছুড়ে আর উপায় নেই।' —বলেই সে হাঙরটিকে লক্ষ্য করে উপরি-উপরি দু-বার রিভলভার ছুড়লে।

হাঙর-বাবাজি মানুষের বদলে দু-দুটো গরম সিসের গুলি খেয়েই চোঁ করে জলের তলায় ডুব মারলে! বাঁচল কি মরল জানি না, তবে জলের ওপরে দেখা গেল, খানিকটা রক্তের দাগ!

রিভলভারের আওয়াজ যে জাহাজের ওপর থেকে কেউ শুনতে পেয়েছে, তারও কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জলের ভিতরে নামলুম।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

দড়ি কে টানে

সকালবেলায় সূর্যকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলুম। কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, সেই সূর্যকেই পরে অভিশাপ দিতে হবে!

কে আগে জানত যে, রোদে সমুদ্রের জলও এমন গরম আর সূর্যের তাপ এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে? তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যশীল সূর্যকিরণ যে এত তীব্র হয়ে উঠে চোখ প্রায় কানা করে দিতে পারে, তাও আমাদের জানা ছিল না।

একে কাল রাত থেকে একঢোঁকও জল পান করিনি, তার উপরে সূর্যের এই অত্যাচার! সমুদ্রের বিপুল জলরাশির ভিতরেও বারংবার ডুব দিয়ে মনে হতে লাগল, বুকের ভিতরটা যেন মরুভূমির মতন শুকিয়ে গিয়েছে—জল নেই, সেখানে এক ফোঁটাও জল নেই!

অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! এত জল এখানে, অথচ জলাভাবে আমরা মরতে বসেছি!

এক-একবার আর সইতে না পেরে সমুদ্রের জলে চুমুক দি, আর তা ভীষণ নোনতা বলে তখনই উগরে ফেলতে পথ পাই না! অমন নীলপদ্মের নীলিমা-মাখানো সুন্দর জল, কিন্তু তা পান করা কী অসম্ভব!

কাল থেকে ঘুমোইনি। সারাদিন আহারও নেই। তার উপরে সমানে দড়ি ধরে ঝুলে থাকা—জলের ভিতরে ভাসছি বটে, কিন্তু হাতদুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে!

জাহাজ সমানে চলেছে—কিন্তু তখনও কোনওদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন আমরা প্রায় মরো মরো হয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, ধীরে ধীরে আবার সেই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে লাগল—যে অন্ধকারের ভিতর কাল এক রাত্রেই আমাদের জীবনটা উলটে-পালটে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে!

সন্ধ্যা এল, আঁধার এল, রাত্রি এল। কিন্তু সূর্যের তাপে কণ্ঠের ভিতরে যে তৃষ্ণার আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন না-নিবে প্রবল হয়ে উঠল দ্বিগুণতর।

আমি বললুম, 'বীরেনদা, মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু এমন তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক নয় কি?'

অমিয় বললে, 'হ্যাঁ সরলদা, এবারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। এমন বেঁচে থাকার কষ্ট আর সওয়া চলে না! তার চেয়ে এসো, আমরা দড়ি ছেড়ে ডুব দি, পাঁচ মিনিটেই সব ব্যথা জুড়িয়ে যাবে।'

বীরেনদা একটাও কথা কইলে না।

জাহাজের ছায়া যেখানে জলের উপরে শেষ হয়েছে তার পরের অনেকখানি জায়গা আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আলো আসছে জাহাজের উপর থেকে। এই আলো

দেখছি আর মনে হচ্ছে, আমরা অন্ধকারে অনাহারে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় আর পরিশ্রমে মরণোন্মুখ হয়েছি, আর জাহাজের ওপরে আলোকিত কক্ষে বসে একদল হত্যাকারী শয়তান—

আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে অমিয় বললে, 'বীরেনদা, আর নয়,—এই আমি দড়ি ছাড়লুম!'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, আর একটু অপেক্ষা করো।'

—'আর অপেক্ষা করে মিছে কষ্ট বাড়াই কেন বীরেনদা? মরণ আমাদের ধরবার আগে আমরাই কেন মরণকে এগিয়ে গিয়ে ধরি না?'

বীরেনদা বললে, 'একটু সবুর করো। আমি একবার জাহাজের ওপরে গিয়ে দেখে আসি, কোনও উপায় আছে কি না?'

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

—'না না, তাহলে গোলমাল হবার সম্ভাবনা। আমি একলাই যাব।'

—'কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড়ো?'

—'তাহলে তোমরা দুজনে থাকলেও কোনও উপকার হবে না।' —এই বলে বীরেনদা দড়ির সাহায্যে আবার উপরে উঠতে লাগল।

পনেরো মিনিট। আধ ঘণ্টাও কেটে গেল বোধ হয়।

আমি বললুম, 'অমিয়, এখনও বীরেনদার দেখা নেই!'

অমিয় বললে, 'আমি যেন উপর থেকে মাঝে মাঝে কাদের হট্টগোলের শব্দও শুনতে পেয়েছি! চলো, আমরাও উপরে উঠি।'

—'না, আর-একটু দেখি। বীরেনদার কথা অমান্য করা উচিত নয়।'...

বোধ হয় আরও আধ ঘণ্টা গেল। তবু বীরেনদার দেখা নেই! আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেলুম।

অমিয় বললে, 'সরলদা, আর নয়—বীরেনদা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, চলো, আমরাও উপরে উঠি। এখানে এমন করে মরার চেয়ে উপরে গিয়ে বীরের মতন মরা ঢের ভালো।'—

আমার কথা শেষ হতে না হতেই উপর থেকে একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়ল, কারা যেন আমাদের টেনে তুলছে।

অমিয় বললে, 'নিশ্চয় বীরেনদা আমাদের টেনে তুলছেন!'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'না অমিয়,—এ বীরেনদা নয়! দেখছ না, একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়েছে, নিশ্চয়ই একজনের বেশি লোক দড়ি ধরে টানছে।'

—'তবে কি—'

—'হ্যাঁ, আর কোনও সন্দেহ নেই,—বোম্বেটেরা আমাদের কথা টের পেয়েছে!'

—'আমরা যদি দড়ি ছেড়ে দি?'

—'সমুদ্রে ডুবে মরব।'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

নীলগোলাপের ছাপ

আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি! মানুষ ছিপের সুতোয় বেঁধে টেনে তোলবার সময়ে মাছ-বেচারাদের মনের ভাব যে-রকম হয়, আমাদেরও মনের অবস্থা তখন বোধ করি অনেকটা সেই রকমই হয়েছিল!

নীচে অতল সমুদ্র যেন হাঁ করে আছে—আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে, আর উপরে প্রস্তুত হয়ে আছে বোম্বেটেদের নিষ্ঠুর তরবারি—আমাদের ধড় থেকে মুণ্ডটা তফাত করে ফেলবার জন্যে!

অমিয় বললে, 'সরলদা, এসো আমরা দড়ি ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি!'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'তাতে আর লাভটা কী হবে ভাই?'

—'বোম্বেটেরা তো আমাদের ধরতে পারবে না!'

—'কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস থেকেই বা বাঁচব কেমন করে? এ তো আর পুকুর কি নদী নয়, যে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব!'

—'কিন্তু ছোরা-ছুরির খোঁচা খেয়ে মরার চেয়ে কি ঠান্ডা জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া ঢের ভালো নয়?'

ততক্ষণে আমরা জাহাজের ডেকের কাছে এসে পৌঁছেছি।

চার-পাঁচ জন লোক উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আগ্রহভরে আমাদের দেখছে! একজনের হাতে লণ্ঠন, তারই আলোয় দেখলুম—প্রত্যেকেরই নাক খ্যাঁদা আর চোখগুলো কুতকুতে। তারা সকলেই চিনেম্যান!

অমিয় আবার বলে উঠল, 'সরলদা! এখনও সময় আছে—দড়ি ছেড়ে দাও, এদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে মরা ভালো!'

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে বীরেনদার গলার আওয়াজে শুনলুম, 'না অমিয়, দড়ি ছেড়ো না! তোমরা উপরে উঠে এসো!'

বীরেনদা বেঁচে আছে! আমাদের উপরে যেতে ডাকছে! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম!

বীরেনদার গলা পেয়ে অমিয় আর ইতস্তত করলে না, চটপট দড়ি বেয়ে তখনই ডেকের উপর গিয়ে উঠল!...আমিও তাই করলুম।

উপরে গিয়ে দেখলুম, অদ্ভুত দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলেই প্রায় চিনেম্যান, তবে তিন-চার জন কালো চেহারার লোকও দলের ভিতরে ছিল—দেখলে তাদের ভারতবাসী বলেই মনে হয়।

বীরেনদা দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে তাদের মাঝখানে—নিজের দীর্ঘ দেহ নিয়ে, সকলের মাথার উপরে মাথা তুলে। বীরেনদার মাথায় একখানা কাপড় জড়ানো—কাপড়খানা রক্তে

রাঙা। তার জামাকাপড়ও স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গিয়ে দেহের লোহার মতো কঠিন মাংসপেশিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে! দেখেই বুঝলুম, বীরেনদার সঙ্গে বোম্বেটের বিলক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

অন্যান্য মুখগুলোর উপরেও তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম—সে-সব মুখের উপরে শয়তানি আর পশুত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, তারা ভুলেও যে কখনও দয়া-মায়ার স্বপ্ন দেখেছে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দিকে তারা তাকিয়ে আছে—যেমন করে তাকায় ইঁদুরের দিকে বিড়ালরা!

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, তোমার মাথায় কী হয়েছে?'

বীরেনদা দু-পা এগিয়ে এসে, তার পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, 'ও কিছু নয় ভাই, সব কথা পরে বলব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এরা আমাদের টেনে তুললে কেন? খুন করবার জন্যে?'

—'এ প্রশ্নেরও উত্তর পরে পাবে।'

—'কিন্তু এরা আমাদের নিয়ে যা খুশি করুক, আপাতত আমাদের একটু জল দিক—তেষ্টা আর সইতে পারছি না। মরতে হয় তো, দানাপানি খেয়ে একটু জিরিয়েই মরব!'

বীরেনদা ফিরে একটু গলা তুলে বললে, 'কং-হিং! তোমরা কি আমার বন্ধুদের একটু জল দেবে না?'

একটা চিনেম্যান দলের একজনকে কী বললে—সে তখনই চলে গেল, বোধ হয় জল আনতেই।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'হ্যাঁ বীরেনদা, তোমার বাংলা কথা এরা বুঝতে পারলে?'

বীরেনদা কোনও জবাব না দিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, চারজন চিনেম্যান একটা বড়ো ভারী পিপে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

বীরেনদা মৃদুস্বরে বললে, 'সরল! অমিয়! তোমরা দুজনে ওই লোকগুলোকে সরিয়ে পিপেটাকে উপরে তুলে রেখে এসো তো!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন বীরেনদা?'

—'ওদের এই সুযোগে দেখিয়ে দাও তোমাদের গায়ের জোরটা। তাহলে তোমাদের উপরে এদের শ্রদ্ধা বাড়বে—কারণ এ-সব লোক শ্রদ্ধা করে শুধু শক্তিকেই।'

আমরা এগিয়ে গেলুম। যে-চারজন লোক পিপেটাকে নিয়ে টানাটানি করছিল, বারংবার বিফল চেষ্টার পর তারা তখন পিপে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল।

আমরা দুজনে পিপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইশারায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'পিপেটাকে কোথায় তুলে রাখতে হবে?'

লোকগুলো বিরক্তি-ভরা মুখভঙ্গি করে আমাদের পানে হিংস্র চোখ তুলে তাকালে, একটা লোক অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে দিলে।

আমি আর অমিয় খুব সহজভাবে ও অনায়াসেই পিপেটাকে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলুম।

চারিদিকে বিজাতীয় ভাষায় অস্ফুট ধ্বনি উঠল। বোধ হয় সকলে আমাদের বাহবা দিচ্ছিল, ...কারণ ফিরে দেখি, সকলেরই বিস্ময় ও সম্ভ্রম ভরা দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট!

বীরেনদা বললে, 'এখন এদের কাছে তোমাদের প্রেস্টিজ অনেক বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে লাগবার আগে এরা ভাববে। ...ওই নাও, তোমাদের জল এসেছে।'

আমরা দুজনে সাগ্রহে গেলাসের পর গেলাস ভরে জলপান করলুম। জল যে এত মিষ্টি লাগে, এর আগে তা জানতুম না!

বীরেনদা চেঁচিয়ে বললে, 'কং হিং! এখন তোমাদের সর্দার আমাদের নিয়ে কী করতে চান?'

কং হিং হচ্ছে একজন আধবুড়ো লোক, একমাত্র তারই মাথায় চিনাদের সেই বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন পুরাতন ও সুদীর্ঘ টিকি, কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো জড়ানো রয়েছে। বীরেনদার কথা শুনে কং হিং তার পার্শ্ববর্তী একটা চিনেম্যানের কানে কানে কী বললে।

বীরেনদা চুপি চুপি বললে, 'কং হিং যার সঙ্গে কথা কইছে, ওই হচ্ছে বোম্বেটেদের সর্দার। ওর নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং।'

চ্যাং একটা পিপের উপরে বসেছিল, কং হিং ছাড়া আর সব বোম্বেটেই তার কাছ থেকে সসম্ভ্রমে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যাং বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি—দেহেও খুব প্রকাণ্ড। দেহ দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে বুনো মহিষের মতন শক্তি আছে। পরে শুনেছি, কেবল চাতুর্যের জন্যে নয়, সে সর্দার হতে পেরেছে তার আসুরিক গায়ের জোরেই। চ্যাঙের ডান চোখ কানা। ডান চোখের ঠিক উপরেই কপালে একটা কাটা দাগ দেখে আন্দাজ করলুম, কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেই চোখটি সে খুইয়েছে। চিনেদের প্রায়ই গোঁফ থাকে না, চ্যাঙের কিন্তু গোঁফ আছে। আর সে গোঁফের মতন গোঁফই বটে, কারণ সেই গোঁফজোড়া একেবারে তার বুকের উপর পর্যন্ত গলদাচিংড়ির দুটো বড়ো বড়ো দাঁড়ার মতন ঝুলে পড়েছে। ডান হাতে লম্বা একটা চণ্ডুর পাইপ নিয়ে চ্যাং কথা কইতে কইতে সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া টানছিল আর ছাড়ছিল। তার সেই কাটা কপাল, সেই কানা চোখের গর্ত, সেই জাঁদরেলি গোঁফ আর সেই বিরাট দেহ দেখলে মনের ভিতরে সত্য-সত্যই একটা বিভীষিকার ভাব জেগে ওঠে! মনে হয় এ লোক কারুর কাছে কখনও দয়া চায়নি, কারুকে কখনও দয়াও করেনি!

কং হিং দু-পা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'নীলগোলাপের ছাপ! নীলগোলাপের ছাপ! বাবু, তোমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে!'

বীরেনদার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তারপর একটা মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'নাঃ, তা ছাড়া আর উপায় নেই!'

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নীলগোলাপের ছাপ কী বীরেনদা?'

—'আমাদের হাতে বোম্বেটেদের দলের চিহ্ন দেগে দেবে। এরপর আমরা যত দিন বাঁচব—এই অপমানের ছবি আমাদের হাতের ওপরে আঁকা থাকবে। এ ছবি দেখলে লোকে আমাদের বোম্বেটে জেনে ঘৃণায় দূরে সরে যাবে!'

—'কিন্তু এ ছবি যদি আমরা হাতের ওপর আঁকতে না দি?'

—'তাহলে এখনই আমাদের মরতে হবে।'

অমিয় বললে, 'বোম্বেটে হব? তার চেয়ে এখনই পৃথিবী থেকে গোটাকয়েক বোম্বেটে কমিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া উচিত নয় কি?'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, আমরা যে বোম্বেটে হব না, এটা একেবারে ঠিক কথা।'

—'তবে এই চিহ্ন আমাদের হাতে দেগে দেবে কেন?'

—'ওরা অবশ্য জানবে যে, আমরা ওদেরই দলের লোক। কিন্তু আমরা যে ওদের লোক কখনোই হব না, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই! আর ওদেরও সেই সন্দেহ আছে বলেই আমাদের ওরা একেবারে মার্কামারা করে ছেড়ে দিতে চায়।'

—'কিন্তু আমাদের দলে নেবার জন্যে ওদের এতটা উৎসাহ কেন?'

—'ওদের উৎসাহ কেন? আমার সব কথা শুনলেই পরে তোমরা বুঝতে পারবে। ওই নীলগোলাপের ছাপ আমাদের হাতের ওপরে দেগে দিয়ে ওরা আমাদের বেঁধে রাখতে চায়! কারণ এর পরেও আমরা যদি ওদের বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহলে ওরাও আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে। এই বিখ্যাত নীলগোলাপের ছাপ সব দেশের পুলিশই চেনে। যারই হাতে এই ছাপ থাকে তারই একমাত্র দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড।...এখন প্রস্তুত হও। ওই দ্যাখো, ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এইবার আমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অর্থাৎ এইবার আমাদের বোম্বেটে হতে হবে?'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

'মানোয়ারি' জাহাজ

হাতের ওপরে আমরা নীলগোলাপের ছাপ নিয়েছি!—একটা মড়ার মাথার উপরে গোলাপ ফুটে আছে—সমস্তটাই নীল রঙের উলকিতে আঁকা! এ ছাপ আমাদের হাতে দেখলে সাধুরা ভয়ে পালিয়ে যাবে, পুলিশ আমাদের পিছনে তাড়া করবে!

চোখের সামনে ফাঁসিকাঠের স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের কামরায় ফিরে এলুম।

অমিয় প্রথমেই বললে, 'বীরেনদা, আগে তোমার গল্প শুনব।'

বীরেনদা যা বললে, তা হচ্ছে এই:—'ভাই, অতক্ষণ পানাহার না করে জলের ভিতরে

ভাসতে ভাসতে আমার সর্বশরীর যে নেতিয়ে পড়েছিল, সে-কথা স্বীকার না করলে মিথ্যা কথা বলা হবে। সত্যিই আমার ভারী কষ্ট হচ্ছিল!...কিন্তু সে-কষ্টও আমাকে তত ব্যথা দিচ্ছিল না, যত ব্যথা পাচ্ছিলুম তোমাদের কাতরানি আর ছুটফটানি দেখে। একে তো তোমাদের আমি ভাইয়ের মতন ভালোবাসি, তার উপরে আমার পরামর্শ শুনেই তোমরা প্রাণ দিতে বসেছ। কাজেই যাতনায় আর অনুতাপে প্রাণ আমার ফেটে যাবার মতো হল। মনে মনে পণ করলুম, প্রাণ তো যেতেই বসেছে, তবু তোমাদের জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। তাই তোমাদের ভরসা দিয়ে আমি কাছি ধরে আবার জাহাজের উপরে গিয়ে উঠলুম।

'কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু যে ফল হবে, সে আশা আমার ছিল না মোটেই। তবু ডুবে মরবার সময়ে মানুষ খড়ের কুটোও জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে—আমার এ চেষ্টাও অনেকটা তারই মতো। মরব যখন নিশ্চয়ই, মরার ভয়ও ছিল না! তখন আমি মরিয়া। পাগলা হাতির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি অনায়াসে। মনে মনেই বললুম, 'এখন আমার সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে নিতান্তই তাকে যমে টেনেছে!'

'জাহাজের কোন ঘরে খাবার জল থাকে, তা আমি জানতুম। রাতও হয়েছে, শত্রুরও ভয় নেই। সুতরাং বোম্বেটেরা হয়তো এখন যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এমনি একটা আন্দাজও আমি করে নিলুম।

'পা টিপে টিপে গুড়ি মেরে এগুতে লাগলুম,—জীবনে এত নিঃশব্দে আর কখনও আমি অগ্রসর হইনি! চোখের উপরে ভেসে উঠছে বারংবার তোমাদের কাতর মুখ এবং বারংবার মনে হচ্ছে, তোমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে আমার সফলতার উপরেই। ...আজ যদি খাবার আর জল জোগাড় করতে পারি, তাহলে আমাদের সকলেরই প্রাণ বাঁচবে। তারপর জাহাজ কোনও বন্দরে গিয়ে লাগলেই আমরা ডাঙায় উঠে সরে পড়তে পারব।

'জাহাজের ভাঁড়ার ঘরের কাছে এসে পড়লুম, কেউ আমাকে দেখতে পেলে না। আসতে আসতে অনেক কামরার ভিতর থেকেই শুনতে পেলুম, মানুষের নাকডাকার আওয়াজ!

'কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়েই দেখলুম, একটা লোক দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে না বটে, কিন্তু ঢুলছে। নিশ্চয়ই প্রহরী!

'জাহাজের মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম, সাপের মতন বুকে হেঁটে।

'প্রায় যখন তার কাছে গিয়ে পড়েছি, হঠাৎ সে অকারণেই মুখ তুললে; এবং চোখ খুললে; এবং বলা বাহুল্য, আমাকে দেখতেও পেলে!

'একলাফে সে দাঁড়িয়ে উঠল—একলাফে আমিও দাঁড়িয়ে উঠলুম। সে নিজেকে সামলাবার আগেই দুই হাতে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে উঠল—সেই তার শেষ আর্তনাদ। কারণ পর-মুহূর্তেই আমি নিজেই শুনতে পেলুম, আমার হাতের

চাপে তার ঘাড়ের, পাঁজরার আর হাতের হাড় মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করল। তার গলা দিয়ে আর একটি টুঁ শব্দও বেরুল না! লোকটাকে এমন ভাবে খুন করতে আমার মনে একটুও দরদ জাগল না—এ সেই বোম্বেটেদেরই একজন, যারা কাল রাতে জাহাজের সমস্ত নিরীহ যাত্রীকে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে। না পালালে আমরাও এতক্ষণ বেঁচে থাকতুম না।

'চারিদিকে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনে সেই হাড়গোড়-ভাঙা মড়াটাকে ছুড়ে ফেলে দিলুম। তখন পালাবার উপায়ও ছিল না, পালাবার ইচ্ছাও রইল না। যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তাও বিফল হল,—মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তা এদের হাতেই হোক, আর অনাহারে বা জলে ডুবেই হোক!

'আমি বক্সিং জানি, যুযুৎসু জানি। আর আমার গায়ে কী-রকম জোর আছে, কলকাতার পথে একদিন এক খ্যাপা মোষের সঙ্গে লড়বার সময়েই তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। তার উপরে বলেছি তো আজ আমি মরিয়া আর বেপরোয়া! সুতরাং তারপরেই জাহাজে যে ব্যাপারটা ঘটল, আমার মুখে শুনলে তোমরা ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে মুষ্টি যোদ্ধা আর যুযুৎসু-র পালোয়ানরা হয়তো আমার কথা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না।*

'একসঙ্গে কত লোক যে আমাকে আক্রমণ করলে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বিশ-পঁচিশ জনের কম নয় নিশ্চয়ই!

'কিন্তু তারা আমাকে ধরতে পারলে না—আমি তাদের সে সুযোগ দিলুম না। বিদ্যুতের মতন বেগে আমি একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে,—একবার সুমুখে, আর-একবার পিছনে লাফিয়ে বা গুড়ি মেরে সরে সরে যেতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত চলতে লাগল ক্ষিপ্রগতিতে এমন কৌশলে যে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত তারা তো আমাকে ধরতে পারলে না বটেই, উলটে তাদের দলের আট-দশ জন লোক আহত বা অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং অনেকেই মার খেয়ে আর্তনাদ করতে করতে পিছিয়ে গেল!

'ক্রমেই তাদের দলে লোক বাড়তে লাগল এবং আমিও হাঁপিয়ে পড়লুম। আর বেশিক্ষণ এমন অসমান লড়াই নিশ্চয়ই আমি চালাতে পারতুম না,—কিন্তু বোম্বেটেরা আমার শক্তি দেখে অবাক হয়ে নিজেরাই দূরে সরে গিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল!

'এবং সেই অবসরে আমি পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে ডান হাতে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে, আর বাঁ-হাতে রিভলভারটা বার করে বোম্বেটেদের দিকে তুলে ইংরেজিতে

---

*বীরেনদার এ অনুমান সত্য। কারণ বছর পঁয়ত্রিশ আগে কলকাতায় চৌরঙ্গির উপরে, একবার এক যুযুৎসু-র পালোয়ান খালি হাতে একাকী উনিশ-বিশ জন লোককে হারিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে' ওই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের সন্দেহ হবে, তাঁরা উক্ত ইংরেজি সংবাদপত্রের পুরানো ফাইল খুলে দেখতে পারেন। ইতি—লেখক।

চেঁচিয়ে বললুম, 'দেখছ, গায়ের জোরেও আমি শিশু নই, আর আমার হাতে অস্ত্রেরও অভাব নেই! যদি মরবার সাধ থাকে, তবে এগিয়ে এসো!'

'বোম্বেটেদেরে মধ্য হতে একটা ভয়ের কানাকানি উঠল,—এগুবে কী, তারা আরও পিছনে হটে গেল!

'আচম্বিতে একটা লোক ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি বীরুবাবু?'

'এমন জায়গায় একটা চিনে-বোম্বেটের মুখে হঠাৎ বাংলা কথা আর—তার চেয়েও যা অসম্ভব—আমার নাম শুনে আমি তো একেবারে থ হয়ে গেলুম!

'তখন জাহাজের চারিদিকে অনেক আলো জ্বলে উঠেছিল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে, ভালো করে চেয়ে দেখেই লোকটাকে চিনতে পারলুম। তার নাম কং হিং, কলকাতায় অনেক দিন ধরে একটা জুতোর দোকান চালিয়েছিল। সর্বদাই সে হাসত—তার মুখের হাসি কখনও শুকোতে দেখিনি। ছেলেবেলা থেকেই ফি বছরে তার দোকানে গিয়ে আমি অনেক জুতো কিনেছি। তার দোকানের জুতো নইলে আমার পছন্দ হত না। সে বেশ বাংলা জানত আর আমার সঙ্গে তার খুব জানাশোনাও ছিল। কিন্তু আজ থেকে বছর-দুই আগে সে দোকান-পাট তুলে কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ তার দেখা পেলুম অপার সাগরের ভিতরে, এই বোম্বেটেদের দলে।

'আমি বললুম, 'আরে, কং হিং সায়েব যে! তাহলে আজকাল দেখছি জুতোসেলাই ছেড়ে তুমি মানুষের গলাকাটা ব্যাবসা শুরু করেছ? বেশ, বেশ! কিন্তু দেখছ, আমার গলা কাটা কত শক্ত?'

'কং হিং হা হা করে হেসে উঠল এবং তার হাসি নীরব হবার আগেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আর-একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ তাকে দলের ভিতরে দেখিনি, সে বোধ হয় কামরার ভিতরেই ছিল। পরে শুনলুম তার নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং—বোম্বেটেদের সর্দার।

'যে-লোকগুলো জখম হয়ে চারিদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তাদের উপরে এক চক্ষু বুলিয়ে, চ্যাং বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ আমার পানে মিটির মিটির করে চেয়ে রইল। তারপর কং হিংয়ের দিকে ফিরে খোনা গোলায় কী যেন জিজ্ঞাসা করলে।

'কং হিং চিনে ভাষায় তাকে কী বলতে লাগল আর চ্যাংও তাই শুনতে শুনতে বার বার প্রশংসা-ভরা চক্ষে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে আর নিজের বুক-পর্যন্ত-ঝুলে-পড়া লম্বা গোঁফের উপরে হাত বুলোতে লাগল। কং হিংয়ের কথা শেষ হবার পর চ্যাং গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলে। তারপর কং হিংকে আবার কী বললে।

'কং হিং আমার দিকে ফিরে বললে, 'বীরুবাবু, তুমি অস্ত্র নামাও। আমাদের সর্দার তোমার বীরত্ব দেখে ভারী খুশি হয়েছেন।'

'আমি বললুম, 'কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস কী? আমি অস্ত্র নামালে তোমরা যদি আবার আমাকে আক্রমণ করো?'

'কং হিং হেসে বললে, 'বীরুবাবু, আমরা ইচ্ছে করলে কি তোমাকে এখনও মেরে ফেলতে পারি না? আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়িতে শুধু হাতে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যদি এখন সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে এসে ফের তোমাকে আক্রমণ করে—'

'বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু তার আগেই আমিও যে এখনই তোমাদের সর্দারকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি!...তবে ঝগড়ার কথা থাক। আমি অস্ত্র রাখছি, তুমি কী বলতে চাও, বলো।'

'কং হিং আমার কাছে এসে বললে, 'বীরুবাবু, খালি বীরত্বের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল বলেই এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে! আমি হচ্ছি চ্যাংয়ের দাদা। চ্যাং সর্দার হলেও আমাকে মান্য করে। আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের একজন হলে—তোমার মতন লোক পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেমন, তুমি রাজি আছ তো?'

'ভাবলুম, বলি, না!—ভদ্রলোকের ছেলে, বোম্বেটে হব?—কিন্তু তারপরেই মনে হল শঠের সঙ্গে শঠতা করতে দোষ কী? আপাতত তাদের কথায় রাজি হয়ে প্রাণ বাঁচাই তো, তারপর সুবিধা পেলেই চম্পট দেওয়া যাবে।

'চালাক কং হিং হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। আমার মনের কথা সে বোধ হয় কতকটা আন্দাজ করতে পারলে। কারণ সে বললে, 'হ্যাঁ বীরুবাবু, আর এক কথা। আমাদের দলে এলে তোমাকে নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সে আবার কী?'

—'আমাদের দলের চিহ্ন। এ চিহ্ন তোমার হাত থেকে কখনও উঠবে না। এ চিহ্ন হাতে থাকলে আমাদের দলের লোক আর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ দল ছাড়লেই তারা পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে—অর্থাৎ আমরাই তাকে ধরিয়ে দিই। পুলিশও যার হাতে ওই চিহ্ন দেখে, তার কোনও কথা বিশ্বাস করে না।'

'কিন্তু তখন আমি মন স্থির করে ফেলেছি, কং হিংয়ের এই ভীষণ কথা শুনেও নিশ্চিন্ত ভাবে বললুম, 'আমি তোমাদের কথায় রাজি আছি—যদি আমার আরও দুজন সঙ্গীকেও তোমাদের দলে নাও।'

'কং হিং বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'তোমার আরও দুজন সঙ্গী! কোথায় তারা?'

'আমি তাকে আমাদের সকলকার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম।

'কং হিং চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'তবেই তো! সর্দার বোধ হয় রাজি হবে না।'

'আমি বললুম, 'কং হিং সায়েব, আমার বন্ধুদেরও পেলে তোমাদের দলের জোর

বাড়বে! তাদের গায়েও জোর বড়ো কম নয়! আর তাদের যদি দলে না নাও, আমাকেও তোমরা পাবে না। তাহলে আমরা তিনজনেই তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরব, মরতে আমরা কেউ ভয় পাই না। বলো, তাহলে আমার বন্ধুদের ডাকি, আর ফের অস্ত্র ধরি?'

'মাথার উপরে পাকানো টিকি-খোঁপার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে কং হিং আবার চ্যাঙের কাছে ফিরে গেল, আবার তাদের দুজনের ভিতরে কী পরামর্শ হল। তারপর কং হিং আবার আমার কাছে হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, 'আমার এই পয়মন্ত টিকির জয় হোক! আজ দেখছি তোমাদের অদৃষ্ট খুব ভালো। সর্দারকে রাজি করেছি!'

সরল, অমিয়, তারপরের কথা সব তোমরা জানো!'

বীরেনদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বিষম একটা হইচই উঠল! চমকে চেয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন রাত পুইয়ে গেছে আমরা কেউ তা খেয়ালে আনিনি—জানালা দিয়ে নীলাকাশ-থেকে-ঝরে-পড়া সকালের সাদা আলো কামরার ভিতরটা পর্যন্ত উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং বাইরে বোম্বেটেরা ব্যস্তভাবে চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে।

ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, চ্যাং আর কং হিং দূরবিন চোখে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে।

বীরেনদা শুধোলে, 'এত সকালে দূরবিন চোখে দিয়ে কী দেখছ কং হিং সায়েব?'

দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে কং হিং হাসিমুখেই বললে, 'মানোয়ারি জাহাজ!'

—'মানোয়ারি জাহাজ?'

—'হ্যাঁ বীরুবাবু! ও জাহাজে গোরা আছে, কামান আছে। ওরা আমাদেরই ধরতে আসছে!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

তিন-পাহাড়ি দ্বীপ

মানোয়ারি জাহাজ আসছে আমাদের আক্রমণ করতে?

কথাটা শুনে সুখী হব, কি দুঃখিত হব, আমি তা বুঝতে পারলুম না—অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একখানা জাহাজ ক্রমেই দেখতে বড়ো হয়ে উঠছে!

অমিয় খুশিমুখে বললে, 'এইবার আমরা মুক্তি পাব।'

আমি বললুম, 'আমরা মুক্তি পাব না অমিয়! আমাদের বিপদ বরং আরও বেড়ে উঠল!'

'আমি বললুম, 'কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস কী? আমি অস্ত্র নামালে তোমরা যদি আবার আমাকে আক্রমণ করো?'

'কং হিং হেসে বললে, 'বীরুবাবু, আমরা ইচ্ছে করলে কি তোমাকে এখনও মেরে ফেলতে পারি না? আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়িতে শুধু হাতে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যদি এখন সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে এসে ফের তোমাকে আক্রমণ করে—'

'বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু তার আগেই আমিও যে এখনই তোমাদের সর্দারকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি!...তবে ঝগড়ার কথা থাক। আমি অস্ত্র রাখছি, তুমি কী বলতে চাও, বলো।'

'কং হিং আমার কাছে এসে বললে, 'বীরুবাবু, খালি বীরত্বের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল বলেই এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে! আমি হচ্ছি চ্যাংয়ের দাদা। চ্যাং সর্দার হলেও আমাকে মান্য করে। আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের একজন হলে—তোমার মতন লোক পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেমন, তুমি রাজি আছ তো?'

'ভাবলুম, বলি, না!—ভদ্রলোকের ছেলে, বোম্বেটে হব?—কিন্তু তারপরেই মনে হল শঠের সঙ্গে শঠতা করতে দোষ কী? আপাতত তাদের কথায় রাজি হয়ে প্রাণ বাঁচাই তো, তারপর সুবিধা পেলেই চম্পট দেওয়া যাবে।

'চালাক কং হিং হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। আমার মনের কথা সে বোধ হয় কতকটা আন্দাজ করতে পারলে। কারণ সে বললে, 'হ্যাঁ বীরুবাবু, আর এক কথা। আমাদের দলে এলে তোমাকে নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সে আবার কী?'

—'আমাদের দলের চিহ্ন। এ চিহ্ন তোমার হাত থেকে কখনও উঠবে না। এ চিহ্ন হাতে থাকলে আমাদের দলের লোক আর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ দল ছাড়লেই তারা পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে—অর্থাৎ আমরাই তাকে ধরিয়ে দিই। পুলিশও যার হাতে ওই চিহ্ন দেখে, তার কোনও কথা বিশ্বাস করে না।'

'কিন্তু তখন আমি মন স্থির করে ফেলেছি, কং হিংয়ের এই ভীষণ কথা শুনেও নিশ্চিন্ত ভাবে বললুম, 'আমি তোমাদের কথায় রাজি আছি—যদি আমার আরও দুজন সঙ্গীকেও তোমাদের দলে নাও।'

'কং হিং বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'তোমার আরও দুজন সঙ্গী! কোথায় তারা?'

'আমি তাকে আমাদের সকলকার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম।

'কং হিং চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'তবেই তো! সর্দার বোধ হয় রাজি হবে না।'

'আমি বললুম, 'কং হিং সায়েব, আমার বন্ধুদেরও পেলে তোমাদের দলের জোর

বাড়বে! তাদের গায়েও জোর বড়ো কম নয়! আর তাদের যদি দলে না নাও, আমাকেও তোমরা পাবে না। তাহলে আমরা তিনজনেই তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরব, মরতে আমরা কেউ ভয় পাই না। বলো, তাহলে আমার বন্ধুদের ডাকি, আর ফের অস্ত্র ধরি?'

'মাথার উপরে পাকানো টিকি-খোঁপার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে কং হিং আবার চ্যাঙের কাছে ফিরে গেল, আবার তাদের দুজনের ভিতরে কী পরামর্শ হল। তারপর কং হিং আবার আমার কাছে হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, 'আমার এই পয়মন্ত টিকির জয় হোক! আজ দেখছি তোমাদের অদৃষ্ট খুব ভালো। সর্দারকে রাজি করেছি!'

সরল, অমিয়, তারপরের কথা সব তোমরা জানো!'

বীরেনদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বিষম একটা হইচই উঠল! চমকে চেয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন রাত পুইয়ে গেছে আমরা কেউ তা খেয়ালে আনিনি—জানালা দিয়ে নীলাকাশ-থেকে-ঝরে-পড়া সকালের সাদা আলো কামরার ভিতরটা পর্যন্ত উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং বাইরে বোম্বেটেরা ব্যস্তভাবে চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে।

ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, চ্যাং আর কং হিং দূরবিন চোখে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে।

বীরেনদা শুধোলে, 'এত সকালে দূরবিন চোখে দিয়ে কী দেখছ কং হিং সায়েব?'

দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে কং হিং হাসিমুখেই বললে, 'মানোয়ারি জাহাজ!'

—'মানোয়ারি জাহাজ?'

—'হ্যাঁ বীরুবাবু! ও জাহাজে গোরা আছে, কামান আছে। ওরা আমাদেরই ধরতে আসছে!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

তিন-পাহাড়ি দ্বীপ

মানোয়ারি জাহাজ আসছে আমাদের আক্রমণ করতে?

কথাটা শুনে সুখী হব, কি দুঃখিত হব, আমি তা বুঝতে পারলুম না—অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একখানা জাহাজ ক্রমেই দেখতে বড়ো হয়ে উঠছে!

অমিয় খুশিমুখে বললে, 'এইবার আমরা মুক্তি পাব।'

আমি বললুম, 'আমরা মুক্তি পাব না অমিয়! আমাদের বিপদ বরং আরও বেড়ে উঠল!'

—'কেন সরলদা, আমাদের আবার বিপদ কীসের? আমরা তো আর বোম্বেটে নই!'

—'কিন্তু আমাদের হাতে যে নীলগোলাপের মার্কা মারা আছে! আমরা যে বোম্বেটে নই, ওরা তা বিশ্বাস করবে কেন?'

—'আমরা সব কথা খুলে বলব, আমরা—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আর হয় না অমিয়! এই বোম্বেটেদের সঙ্গে ধরা পড়লে আমাদের আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!'

অমিয়ের খুশিমুখ আবার ম্লান হয়ে পড়ল। সে বোম্বেটের মতন মরতে চায় না।

এমন সময়ে চ্যাং চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে চিনে-ভাষায় চেঁচিয়ে কী-একটা হুকুম দিলে।

ডেকের উপর কলরব তুলে বোম্বেটেরা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজের গতি বেড়ে উঠল!

কং হিং আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার টিকির কুণ্ডলীর উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'বীরুবাবু, তোমার মনে বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে?'

বীরেনদা বললে, 'হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে বটে,—তবে প্রাণের ভয় নয়, অপমানের ভয়!'

—'তার মানে?'

—'আমরা বোম্বেটে না হয়েও বোম্বেটে বলে ধরা পড়ব, এটা কি আমাদের পক্ষে অপমানের কথা নয় কং হিং?'

—'আমরা ধরা পড়ব কেন বীরুবাবু?'

—'আমরা যে ধরা পড়ব না কেন, তারও তো কোনও কারণ দেখছি না। আমাদের পিছু নিয়েছে মানোয়ারি জাহাজ—আমাদের জাহাজের চেয়ে সে ঢের বেশি তাড়াতাড়ি এগুতে পারে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে আমরা পালাতে পারব না। তারপর মানোয়ারি জাহাজে আছে দলে দলে গোরা, অগুনতি বন্দুক আর কামান! সুতরাং লড়াই করেও তার সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব না।'

কং হিং হেসে বললে, 'তোমাদের কথা ঠিক বীরুবাবু। মানোয়ারি জাহাজ আমাদের পক্ষে যমের মতোই বটে। কিন্তু তবু আমরা তাকে কলা দেখিয়ে পালাতে পারব। এদিকে এসে দেখে যাও'—এই বলে সে বীরেনদাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আমরা দুজনেও তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম।

এতক্ষণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে জাহাজের অন্য পাশের সমুদ্রের দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন এপাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি, এ কী অভাবিত ব্যাপার!

আমাদের চোখের সামনে, মাইল-কয়েক দূরে জেগে উঠেছে একটি পরমসুন্দর অরণ্যশ্যামল দ্বীপের ছবি—তার মাথার উপরে আকাশের নীলপটে আঁকা রয়েছে পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ের ধূসর চূড়া!

দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—মনে হল এই বিপদসঙ্কুল পাথারে সেই-ই যেন আমাদের একমাত্র মুক্তির নীড়!

কং হিং হাসতে হাসতে বললে, 'এখন বুঝছ তো বীরুবাবু, কেন আমরা ধরা পড়ব না? একবার ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারলে আর আমাদের হাতে পায় কে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু কং হিং সায়েব, জাহাজি গোরারাও যে দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে না, এতটা ভরসা তুমি করছ কেন?'

—'কী, দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে? অসম্ভব, অসম্ভব! ওখানকার এমন সব লুকোবার জায়গা আমরা জানি যে, কেউ আমাদের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না।...জানো বীরুবাবু, ওই দ্বীপে আসবার জন্যেই আমরা এই জাহাজ লুট করেছি?'

বীরেনদা একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন, ওই দ্বীপে আসবার জন্যে তোমাদের এতটা আগ্রহের কারণ কী?'

কং হিঙের দুই চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বললে, 'কারণ কী? কারণ—না, না, কোনোই কারণ নেই—দেখিগে, ওদিককার ব্যাপারখানা!'—বলেই দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

কং হিঙের কথায় কেমন যেন রহস্যের আভাস পাওয়া গেল। ওই দ্বীপেই ওরা যেতে চায়? ওইখানে যাবার জন্যেই ওরা এই জাহাজ লুট করেছে? এর একটা গুপ্ত কারণ আছে নিশ্চয়ই, অথচ সে কারণটা যে কী কং হিং তা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে রাজি নয়!

আমাদের জাহাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্বীপের দিকে ছুটতে লাগল, দ্বীপের গাছপালা হয়ে উঠল ক্রমেই স্পষ্ট।

ওধারে গিয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজখানা আরও কাছে এসে পড়েছে—দু-পাশে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে তুলে।

ওধারে চেয়ে দেখলুম, চ্যাং, কং হিং আর জনকয়েক চিনেম্যান একখানা কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়ে ব্যস্তভাবে কী দেখছে আর পরামর্শ করছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম, কাগজখানা হচ্ছে দ্বীপের ম্যাপ!

জাহাজেরও চারিদিকে মহা হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ক্রমাগত চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে, কেবিন থেকে জিনিসপত্তর বাইরে টেনে আনছে, মোটমাট বাঁধছে। এসব যে জাহাজ ছেড়ে পালাবার উদ্যোগ, তা আর বুঝতে বিলম্ব হল না।

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল! চমকে চেয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে এবং একটা অগ্নিময় পিণ্ড আমাদের মাথার উপর দিয়ে হু হু করে চলে যাচ্ছে! গোরারা তোপ দাগছে! তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা দ্বীপের দিকে পালাচ্ছি।

দ্বীপ তখন আমাদের কাছ থেকে মাইল-দুয়েক তফাতে।

বোম্বেটেরা এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে পড়ল, জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম খালি আমরা তিন বন্ধু, আর রইল চ্যাং, কং হিং আর তিনজন চিনেম্যান।

আবার গুড়ুম করে আওয়াজ, কিন্তু এবারের গোলাটাও লক্ষচ্যুত হয়ে আমাদের জাহাজের পাশ ঘেঁষে চলে গেল।

বীরেনদা বললে, 'গতিক বড়ো সুবিধের নয়! চলো, এই বেলা কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে নি। বিপদ দেখলে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।'

কেবিনের ভিতরে যখন ঢুকছি, তখন মানোয়ারি জাহাজ থেকে একসঙ্গে দুটো কামান গর্জে উঠল! তারপরেই আমাদের জাহাজখানা কেঁপে উঠল এবং শব্দ শুনেই বুঝলুম, এবারের গোলা আর লক্ষ্যচ্যুত হয়নি!

তারপর ভিতর থেকে ক্রমাগত কামানের আওয়াজ, আমাদের জাহাজ ভাঙার শব্দ, মানুষের চেঁচামেচি আর কাতরানি শুনেই বোঝা যেতে লাগল, মরণের আসন্ন আলিঙ্গন আমাদের চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে!

মোটমাট নিয়ে উপরে এসে দেখলুম, ভীষণ দৃশ্য! আমাদের জাহাজ আর চলছে না, গোলার চোটে তার ধোঁয়া ছাড়বার চোঙাদুটো উড়ে গেছে, তার ইঞ্জিন বন্ধ, তার সর্বাঙ্গ ভগ্নচূর্ণ এবং ডেকের উপরে রক্তের ঢেউ বইয়ে কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে—কোথাও জ্যান্ত মানুষের চিহ্ন নেই।

মানোয়ারি জাহাজের তোপ তখনও ধোঁয়া আর আগুন উদগার করছে।

জাহাজের ওপাশে ছুটে গেলুম—কেউ কোথাও নেই!

হঠাৎ অমিয় সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

সমুদ্রের বুকে দু-খানা বড়ো বড়ো বোট ভাসছে—তার ভিতরে ঠেসাঠেসি করে বসে আছে অনেকগুলো লোক! বোট দু-খানা ছুটেছে দ্বীপের দিকেই।

বীরেনদা বললে, 'বোম্বেটেরা পালাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমাদের উপায় কী? আসল বোম্বেটেরা তো পালাল, শেষটা ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে চড়ব আমরাই নাকি?'—আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মানোয়ারি জাহাজের একটা গোলা আমাদের জাহাজ ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে বোম্বেটেদের একখানা বোটের উপরে!

বোটখানা তখনই ভেঙে দু-খানা হয়ে গেল—মানুষগুলোও কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না—কেবল শুনতে পেলুম একটা মর্মভেদী হাহাকারের একতান হা হা করে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই সীমাহারা সাগরের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে গেল—অসহায়ের মতো!—তেমন ভয়ানক কান্না আমি আর কখনও শুনিনি, আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল!...হয়তো ও-নৌকোর জনপ্রাণীও আর বেঁচে নেই!

অন্য বোটের বোম্বেটেরা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল।

অমিয় বললে, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল! চ্যাঙের গোঁফ আর কং হিংঙের টিকি কোন বোটে উঠেছে, তাই ভাবছি।'

ইতিমধ্যে বীরেনদা কোথা থেকে তিনটে জীবন-রক্ষক-জামা সংগ্রহ করে আনলে! এই জামা পরলে মানুষ জলে ডোবে না।

তাড়াতাড়ি পরামর্শ করে আমরা তিনটে পিপে এনে তার ভিতরে আমাদের দরকারি জিনিসপত্তর পুরে, পিপেগুলোর মুখ এমন ভাবে বন্ধ করে দিলুম, যাতে ভিতরে জল ঢুকবার পথ না থাকে। তারপর পিপে তিনটেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললুম। স্থির হল, এই পিপেগুলোকে সমুদ্রে ফেলে আমরাও জলে ঝাঁপ দেব। তারপর ভাসতে ভাসতে দড়ি ধরে পিপেগুলোকে টানতে টানতে দ্বীপে গিয়ে উঠব।

দ্বীপ এখন মাইলখানেক তফাতে রয়েছে। তার তিন পাহাড়ের তলায় এমন নিবিড় অরণ্য স্থির হয়ে আছে যে, ভিতরের আর কোনও দৃশ্য দেখবার উপায় নেই।

বীরেনদা গম্ভীর ভাবে বললে, 'কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ওই রহস্যময় অজানা দ্বীপের ভিতরে হাজার হাজার বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে! চ্যাঙের দল ওই দ্বীপে যাবার জন্যেই এই জাহাজখানা দখল করেছিল। দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে ওখানেই যাবার জন্যে তাদের যখন এমন আগ্রহ, তখন ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। কিন্তু তাদের গুপ্তকথা তো জানা গেল না।'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা! সরলদা! আমাদের জাহাজ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে!'

সত্যিই তাই! জাহাজখানা ক্রমেই কাত হয়ে পড়ছে এবং তার লম্বালম্বি একটা দিক জলের ভিতর অনেকখানি নেমে গিয়েছে!

ওদিকে মানোয়ারি জাহাজখানা জল কাটতে কাটতে খুব কাছে এসে পড়েছে। তার ডেকের উপরে দলে দলে গোরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাও দেখতে পেলুম।

আর দেরি না! আমরা পিপে তিনটেকে দড়িতে ঝুলিয়ে জলে নামিয়ে দিলুম এবং নিজেরাও নেমে আবার সেই সমুদ্রকেই আশ্রয় করলুম। ভরসা শুধু এই, এবারে আর অকূল পাথারে ভাসছি না—কূল রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই জেগে স্বপ্নমায়ার মতন!

কিন্তু পিছনে রয়েছে জাহাজি গোরাদের সতর্ক দৃষ্টি! বন্দুকের গুলি এড়িয়ে তীরে গিয়ে উঠতে পারব কি?

সে সময়ে আমাদের মনে যে ভাব লীলায়িত হচ্ছিল, কবিতার আকারে তা এই ভাবে বলা যায়—

ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা!
ছুটছে গোলা, ছুটছে সাগর,
ছুটছে দেহের রক্তধারা!

বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
চলছে আকাশ-বাতাস ঠেলে,
অবাক হয়ে দেখছে চেয়ে
সূর্য এবং চন্দ্র-তারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা!

বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
মরণ-খেলায় হয় না সারা,
মৃত্যু তাদের বক্ষে নাচে,
চক্ষে তাদের অগ্নি-ঝরা।
মরিই যদি মরব জেগে,
বাজের মতন ভীষণ বেগে!
শিশুর মতন মরছে তারা
ফুল-বিছানায় ঘুমোয় যারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

আমরা যে চাই বৃহৎ মরণ!
—তা ছাড়া আর নেইকো চারা
কেঁচোর মতন কে হবে রে,
জুতোর চাপে জীবনহারা!
টবের গোলাপ হয়ে মোরা,
রইব না রে ঘরে পোরা,
ছোট্ট ঝড়ে মরব না তো
জড়িয়ে ধরে মাটির কারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষী দৃষ্টি

দ্বীপের দিকে ভাসতে ভাসতে চলেছি।

গায়ে জীবনরক্ষক সেই জামা ছিল, কাজেই জলের উপরে ভেসে থাকবার জন্যে আমাদের কোনওরকম কষ্টই স্বীকার করতে হল না। প্রত্যেকেই এক-একটা পিপে পিছনে টানতে টানতে খুব সহজেই জল কেটে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললুম!

বোম্বেটেদের নৌকোখানা দ্বীপের খুব কাছেই গিয়ে পড়েছে। মানোয়ারি জাহাজের গোলা, এখনও তাদের পিছু ছাড়েনি বটে, কিন্তু এ যাত্রা আর তাদের ধরতে পারবে না বোধ হয়।

মানোয়ারি জাহাজের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার উপর থেকেও একখানা বোট নামানো হচ্ছে। তাহলে গোরারাও সহজে ছাড়বে না দেখছি—তারাও বোধ হয় দ্বীপে আসবার বন্দোবস্ত করছে।

আমি বললুম, 'আরও শিগগির—আরও শিগগির সাঁতরে চলো, নইলে আমরাই আগে ধরা পড়ব!'

বীরেনদা বললে, 'ওঃ, এই নীলগোলাপের ছাপ! এর জন্যেই তো এত ভয়! নইলে কি এমন ভীরুর মতন আমরা পালাতুম?'

অমিয় বললে, 'হ্যাঁ বীরেনদা, এমন করে পালাতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু লজ্জা কীসের অমিয়? আমরা তো আজ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি না, আমরা পালাচ্ছি মানের দায়ে!'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা, গোরারা যদি আগে আমাদেরই ধরতে আসে!'

আমি বললুম, 'আমরা ধরা দেব না। আমরা লড়াই করব—'

বীরেনদা বললে, 'হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে অন্তত গোটাকয় কটাচামড়ার মানুষ কমিয়ে তবে আমরা মরব, আমাদের এই কালোচামড়ার মর্যাদা আমরা নষ্ট করব না—কিছুতেই না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু বীরেনদা, ওরা যদি আমাদের বন্দি করে,—ওরা যদি আমাদের মরতে না দেয়?'

বীরেনদা অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'মরতে দেবে না? যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেবে না? যে বাঁচতে চায়, মৃত্যু তাকেও জোর করে টেনে নিয়ে যায়—'

বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'কিন্তু যে মরতে চায় মৃত্যু তাকে সহজে গ্রহণ করে না, এইটেই তো আমি নিত্যি দেখতে পাই!'

—'মৃত্যু তো কাপুরুষকে গ্রহণ করে না সরল! দুনিয়ার সব আশা হারিয়ে, জীবনের দুঃখ এড়াবার জন্যে মরণকে যারা চায়, মৃত্যু যে তাদের ঘৃণা করে!...ওই দ্যাখো, মৃত্যু আমাদের দিকে ছুটে আসছে!'

অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে হাওয়া কেটে অনেকগুলো গুলি চলে গেল! গোরারা আমাদেরও দেখতে পেয়েছে!

অমিয় চিৎকার করে গেয়ে উঠল,

'মরব, মরব, মরব মোরা,
মরতে মোরা ভালোবাসি!
মরণ-খেলা খেলতে সুখে
আমরা যে ভাই ধরায় আসি!
আয় রে ছুটে মাটির ছেলে,
কাপুরুষের ভাবনা ফেলে,
জীবন তোদের পোকার জীবন—
কাঁদন-ভরা তোদের হাসি—
মরণ নিয়ে তাই তো খেলি,
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

বীরেনদা বললে, 'কিন্তু এ ভাবে মরা তো হবে না ভাই! পিপেগুলোকে ঢালের মতন রেখে পিপের আড়ালে আড়ালে চলো। পশুপক্ষীর মতন দূর থেকে শিকারির গুলিতে প্রাণ দিতে আমরা রাজি নই! ওরাও আমাদের কাছে আসুক—আমরা মানুষ, আমরা মরব বটে, কিন্তু মেরে মরব—চারিদিকে মরণকে দু-হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মরব—ওদের জানিয়ে দিয়ে মরব যে, আমরা মানুষ!'

সমুদ্রের মহা-গর্জনের সঙ্গে আবার অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল!

অমিয় আবার গাইলে—

'জীবন-মরণ একসাথে আজ
নৃত্য-লীলায় মত্ত থাকে,
জীবন চাহে মরণকে ওই,
মরণ চাহে জীবনটাকে!
মরণ বলে—'জীবন রে ভাই,
বল তো আজ কোন সুরে গাই?'
জীবন বলে—'মরণ, এসো,
তোমার সুরেই বাজাই বাঁশি!'
বুকের ভিতর জীবন নিয়ে
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

ফিরে দেখলুম, আমাদের জাহাজখানা একেবারে জলের তলায় ডুব মারলে—সমুদ্রের উপরে চক্রাকারে বিরাট একটা বুদ্বুদ তুলে।

এবং ওদিক থেকে একখানা বোট তিরবেগে এগিয়ে আসছে, তার ভিতরে সব মানোয়ারি গোরা!

বীরেনদা বললে, 'ওই ওরা আসছে! তোমরা প্রস্তুত হও—মারতে আর মরতে!'

আমি বললুম, 'আমি প্রস্তুত!'

অমিয় কিছু বললে না, হাসতে হাসতে আবার গান ধরলে—

'জীবন নিয়ে জীবন দেব,
অমনি মোরা দেব না গো!
জাগো মরণ জীবন-হরণ!
মরণ-হরণ জীবন জাগো!
আজকে দেহের রক্ত মাঝে
ভীষণ-মধুর ছন্দ বাজে,
ক্ষুদ্র মনে রুদ্র নাচে—
মৃত্যু নিল শঙ্কা গ্রাসি!
এই জীবনের বাসর-ঘরে
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

আবার একঝাঁক গুলি এসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। মরণ যেন আজ আমাদের জেগে-ওঠা জীবনকে দংশন করতে রাজি নয়,—যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে সত্যসত্যই মরণ আজ সন্ধি স্থাপন করেছে।

তারপর আরও এক অভাবিত ব্যাপার! গোরার দল বোট নিয়ে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল—বোম্বেটেদের নৌকো যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে। মাত্র আমাদের এই তিনজনকে ধরতে এসে ওরা বোধ হয় নৌকা-বোঝাই বোম্বেটের দলকে পালাবার সুযোগ দিতে রাজি নয়।

বীরেনদা সহাস্যে বললে, 'যাক, এ যাত্রাও মারবার আর মরবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া গেল!'

আমি বললুম, 'সেজন্যে খুশি হবে কি না বুঝতে পারছি না। এই তো দ্বীপ আমাদের সামনে। এখন এর ভিতরে আবার যে কী নাটকের অভিনয় শুরু হবে, কোনখানে যে তার যবনিকা পড়বে, কিছুই তো আন্দাজ করতে পারছি না!'

খানিক পরেই দ্বীপে এসে উঠলুম—আবার পৃথিবীর মাটির উপরে পা দিলুম—মনে হল, বিদেশ থেকে আবার যেন মায়ের কোলে এসে উঠলুম।

সমুদ্রতটের বালির বিছানার পরেই কী ভীষণ অরণ্য! লতায়-পাতায় জড়ানো বড়ো বড়ো নানাজাতির গাছ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে সাগর-গর্জনের সঙ্গে মর্মর-গর্জন মিশিয়ে দিচ্ছে! তাদের পায়ের তলাতেও এমন নিবিড় জঙ্গল যে, পথ খুঁজে পাওয়া তো

দূরের কথা, দুই হাত পরে কী আছে তাও দেখবার কি বোঝবার উপায় নেই! বনজঙ্গল যে এমন দুর্গম হতে পারে আগে তা জানতুম না! এ অরণ্য যেন নিষ্ঠুর প্রহরীর মতন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের জনপ্রাণীকেও ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না!

অমিয় হতাশভাবে বললে, 'এ যে আর এক বিপদ! এ জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলে কি আর বেরুতে পারব?'

বীরেনদা বললে, 'ঢুকতে পারলে বেরুতেও পারব! কিন্তু কথা হচ্ছে, ঢুকি কেমন করে? বোধ হয় আমাদের পথ কেটেই ঢুকতে হবে। সরল, পিপের মুখ খুলে তিনখানা কুড়ুল বার করো তো!'

কিন্তু বীরেনদার কথা আমি শুনেও শুনলুম না,—আমার চোখদুটো তখন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে—আমার গায়ের রোমগুলো তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে!

জঙ্গলের ঘন লতা-পাতার আড়ালে লুকিয়ে দু-দুটো অদ্ভুত চক্ষু জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে। সে চক্ষু কোনও পশুর চক্ষু নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিও তার মধ্যে নেই! একটা জ্বলন্ত হিংসার ভাব, একটা ভূতুড়ে ক্ষুধার আগ্রহ যেন তাদের ভিতর থেকে ফুটে-ফুটে উঠছে!

বীরেনদা বললে, 'সরল, ও সরল! শুনতে পাচ্ছ? অমন করে ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

আমি কাঠের পুতুলের মতন আঙুল তুলে জঙ্গলের সেইখানটা দেখিয়ে দিলুম।

বীরেনদাও সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠল!—অস্ফুট স্বরে বললে, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

অমিয়ও দেখলে—সবিস্ময়ে বললে, 'কী ওটা! জন্তু না ভূত?'

বীরেনদা তিরের মতো সেইদিক পানে ছুটে গেল—নিজের বিপদের কথা একবারও ভেবে দেখলে না।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

মৃত্যু-গহ্বর ও অস্থিসার হাত

আমি পিছু ডাকলুম, 'বীরেনদা, বীরেনদা! যেয়ো না—ওদিকে যেয়ো না!'

কিন্তু বীরেনদা থামলেও না—ফিরেও তাকালে না, অকুতোভয়ে সেই হিংস্র ও প্রদীপ্ত চক্ষু-দুটোর দিকে অগ্রসর হল।

চোখদুটো আরও-জ্বলন্ত আরও-বিস্ফারিত হয়ে উঠল—ক্ষণিকের জন্যে। তারপর বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে আড়ালে সরে গেল।

বীরেনদাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল...শুনতে পেলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মড় মড় করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে চলে যাচ্ছে—দ্রুতপদে, দূর হতে আরও দূরে।

অমিয় আবার বললে, 'কী ওটা? জন্তু না ভূত, না মানুষ?'

যে-ঝোপে চোখদুটো আবির্ভূত হয়েছিল তার উপরে বার-কয়েক লাথি মেরে বীরেনদা বললে, 'কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু—আরে এ কী? অমিয়! সরল! পথ পাওয়া গেছে—পথ পাওয়া গেছে!'

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম সেই ঝোপটার পাশ দিয়েই খুব সরু একটা পথ জঙ্গল ভেদ করে ভিতরদিকে চলে গিয়েছে।

বীরেনদা বললে, 'এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে যে আমাদের দেখছিল, এই পথ দিয়েই সে এসেছে আর এই পথ দিয়েই সে পালিয়েছে।'

আমি বললুম, 'হয়তো সে পালায়নি। খানিক তফাতে গিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

বীরেনদা বললে, 'তার কথা পরে ভাবা যাবে অখন! আপাতত এই পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমি পাহারা দিচ্ছি। ততক্ষণে তোমরা দুজনে মিলে এক কাজ করো। ওই পিপে তিনটের ভিতর থেকে কতকগুলো নেহাত দরকারি জিনিস বার করে নিয়ে, ওগুলোকে বালির ভিতরে পুঁতে রেখে এসো। শিগগির যাও—দেরি কোরো না।'

আমরা তাই করলুম। আগে পিপেগুলোর মুখ খুলে আমাদের দরকার হতে পারে এমন কতকগুলো জিনিস বার করে নিয়ে পোঁটলা বাঁধলুম। তারপর সমুদ্রতটের বালি সরিয়ে পিপে তিনটেকে একে একে পুঁতে ফেললুম। পাছে জায়গাটা আবার খুঁজে না পাই, সেই ভয়ে সেখানটায় নিশানা রাখতেও ভুললুম না।

বীরেনদা বললে, 'বোধ হয় তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি। একটা বন্দুক আর একটা কুড়ুল আমাকে দাও। এখন এসো, আমরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকি। কিন্তু খুব সাবধানে পথে চলতে হবে—এ অজানা জঙ্গল, বিপদের সম্ভাবনা চারিদিকেই।'

আগে বীরেনদা, তারপর আমি, তারপর অমিয়—এই ভাবে আমরা অগ্রসর হলুম। ভারী সরু পথ—একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি এগুনো যায় না। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল, ডান দিকে ঘন জঙ্গল, মাথার উপরে অগুন্তি গাছের পাতা-ভরা ডালপালার চাঁদোয়া আকাশ ঢেকে আছে আর গাছের তলায় খালি শুকনো পাতার মড়মড়ানি। চার হাত সামনেও নজর চলে না—চার হাত পিছনেও নজর চলে না।

বন ক্রমে আরও নিবিড় হয়ে উঠল—এত নিবিড় যে সেই দিন-দুপুরেই মনে হতে লাগল, আমরা যেন রাতের উথলে ওঠা আঁধার-সায়রের ভিতর দিয়ে কোন অপারে দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁতরে চলেছি।

বীরেনদা বললে, 'ইলেকট্রিক-টর্চটা আমার হাতে দাও তো, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

সেই অতি-নির্জন ও অতি-নিস্তব্ধ অরণ্য বীরেনদার গলার আওয়াজ শুনে যেন শিউরে শিউরে উঠল,—এ বন যেন মানুষের গলা কখনও শোনেনি, মানুষের ছায়া কোনওদিন গায়ে মাখেনি—নিজের নিসাড়তায় ও নিজের অন্ধকারে এ যেন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু বীরেনদা, এমন গহন বনের ভিতরে এমন পথ বানালে কে? এ পথ তো আপনি তৈরি হয়নি!'

বীরেনদা কেবল বললে, 'হ্যাঁ, এ পথ মানুষেরই হাতে তৈরি বটে।'

আবার সবাই চুপ। বীরেনদার হাতের বৈদ্যুতিক মশালের আলোটা থেকে থেকে পথহারা পাখির মতন সেই অরণ্য-কারাগারের চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, তাই দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললুম।

মাঝে মাঝে বীরেনদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর কান পেতে কী শোনে, তারপর আবার চলতে থাকে। আমাদের সকলেরই মনে হতে লাগল, আমাদের আগে আগে পথের শুকনো পাতার উপরে আরও কারুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। ও কে যাচ্ছে আমাদের আগে আগে?—সেই যার জ্বলন্ত চোখ?.....নানা দিকে বার বার বিজলি-মশালের আলো ফেলেও কারুকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু সেই অজানা পায়ের শব্দ আমাদের আগে আগে সমানেই এগিয়ে চলল—আমরা তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই সে-শব্দও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

বন যে অন্ধকার, এখন সেটা সৌভাগ্যের কথাই বলে মনে হতে লাগল। কারণ এর গর্ভের ভিতরে হয়তো এমন আরও অনেক বিভীষিকা লুকানো আছে, যা দেখলে আমাদের আবার মানে মানে সমুদ্রের ধারে ফিরে যেতে হবে। একবার এক জায়গায় বিজলি-মশালের আলো পড়তেই দেখতে পেলুম, প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে আস্তে আস্তে গাছপালার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর এক জায়গায় বাঘের মতন বড়ো কী একটা জানোয়ার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল! প্রতি পদেই মনে হতে লাগল, এই নিরেট অন্ধকারের রাজ্যে, চারিদিকে অদৃশ্য সব বিপদ লোলুপ চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে, একবার কেউ একটু অন্যমনস্ক হলেই তারা সবাই মিলে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বে।

হঠাৎ আমাদের সামনে অন্ধকারের ভিতরে কীরকম একটা শব্দ হল—কার হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল! দু-পা এগুতেই পায়ে কী ঠেকল। তুলে দেখি, বিজলি-মশাল—যা ছিল বীরেনদার হাতে।

কল টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলুম, প্রাণ যেন উড়ে গেল। ঠিক দু-পা পরেই মাঠের মতন প্রকাণ্ড একটা গহ্বর হাঁ করে আছে। আর আমার সামনে বীরেনদা নেই।

খুব নীচে থেকে—যেন পাতালের বুক ভেদ করে বীরেনদার গলার আওয়াজ পেলুম—'সরল! অমিয়! দড়ি ঝুলিয়ে দাও—দড়ি ঝুলিয়ে দাও—শিগগির।'

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো অট্টহাসি জেগে উঠল—হাহাঃ, হা হা হা হা—

সে হাসি মানুষের, না প্রেতের?

কিন্তু আমাদের তখন এমন অবসরও ছিল না যে, সে হাসি শুনে ভয় পাই! তাড়াতাড়ি আমি পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম, তারপর গহ্বরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে আলো ফেলে দেখলুম—প্রায় পনেরো-বিশ হাত নীচে কালো জল থই থই করছে! জলের চারিধারেই পাথুরে পাড় খাড়া ভাবে উপরে উঠেছে। কাজেই এর ভিতরে একবার পড়লে সাঁতার জানলেও বাঁচোয়া নেই। এই পনেরো-বিশ হাত দেওয়াল বেয়ে মানুষের পক্ষে উপরে ওঠা অসম্ভব।

এদিকে-ওদিকে বার-কয়েক বিজলি-মশালের আলো ফেলে বীরেনদাকে আবিষ্কার করলুম। পাড়ের ঠিক তলাতেই সাঁতার দিতে দিতে সে উপরে ওঠবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছিল।

বীরেনদা আবার চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগির দড়ি ফেলে দাও—জলের ভেতরে কুমির আছে!'

কুমির!' বিজলি-মশালটা তাড়াতাড়ি অমিয়ের হাতে দিয়ে, থলে থেকে দড়ি বার করে জলের ভিতরে ফেলে দিলুম। বীরেনদা সেই মুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরলে এবং পরমুহূর্তেই একটা প্রকাণ্ড কুৎসিত মাথা বীরেনদার ঠিক পিছনে জলের উপরে জেগে উঠল।

অমিয় চিৎকার করে বললে, 'বীরেনদা! তোমার পিছনে কুমির!'

কিন্তু অমিয়ের কথা শেষ হবার আগেই জোরালো হাতের এক ঝাঁকানি দিয়ে বীরেনদা দড়ি ধরে জল ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে পড়ল। কুমিরটা ফলার মুখছাড়া হয় দেখে তার লম্বা-চওড়া ল্যাজ দিয়ে বীরেনদাকে লক্ষ করে প্রচণ্ড এক ঝাপটা মারলে! সে ভীষণ ল্যাজ যদি বীরেনদার গায়ে লাগত, তাহলে তার হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে যেত—কিন্তু বীরেনদা আবার এমন এক ঝাঁকানি দিয়ে কুমিরের নাগালের বাইরে চলে এল যে, সেই বিষম টানের চোটে আমিও আর একটু হলেই জলের ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে সেই ভয়ানক অট্টহাস্যের বিরাম নেই। সেই হাসির উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে চারিদিককার রন্ধ্রহীন অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল!—অমিয় নানাদিকে বারবার আলো ফেলেও বার করতে পারলে না যে, কোথা থেকে কে অমন করে ওই ভূতুড়ে হাসি হাসছে...তারপর, বীরেনদা যখন নিরাপদে দড়ি বেয়ে আবার ডাঙার উপরে এসে উঠল, সেই হাসি তখন হঠাৎ থেমে গেল। চারিদিক আবার স্তব্ধ।

উপরে উঠেই বীরেনদার সর্বপ্রথম কথা হল—'টর্চটা তো পেয়েছ দেখছি। কিন্তু পড়বার সময়ে আমি আমার বন্দুকটাও হারিয়েছি। দ্যাখো তো, বন্দুকটা ওপরেই আছে, না জলে পড়ে গেছে?'

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটাও উপরেই খুঁজে পাওয়া গেল! বীরেনদা খুশি হয়ে বললে, 'যে-জায়গায় এসেছি, এখানে বন্দুকই হচ্ছে আমাদের প্রাণের মতো। বন্দুক হারালে প্রাণও হয়তো হারাতে হবে। ...অমিয়, মশালটা আমার হাতে দাও। এখন আবার পথ খুঁজে বার করতে হবে।'

পথ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। গহ্বরের সামনে এসেই পথটা বাঁ দিকে বেঁকে পাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। অন্ধকারে তা দেখতে না পেয়েই বীরেনদা গহ্বরে পড়ে গিয়েছিল।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম—এবারে আরও সাবধানে। কারণ, একে তো এই সরু পথ,—তার উপরে বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল আর ডান দিকে সেই মৃত্যু-গহ্বর, একবার পা পিছলোলে কি হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পর গহ্বর শেষ হল, কিন্তু তখনও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর আঁকাবাঁকা পথের শেষ পেলুম না। দুইধারে ঘন-বিন্যস্ত অরণ্য নিয়ে পথ আবার কোনও অজানার দিকে চলে গেছে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ সেই বিষম পথ শেষ হল—আমরা আবার খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালুম—উজ্জ্বল আলোকের আঘাতে আমাদের অন্ধকার-মাখানো চোখগুলো যেন কানা হয়ে গেল!

চোখ যখন পরিষ্কার হল, দেখলুম সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

মস্ত এক মাঠ—তার বুকে ছোটো ছোটো চারাগাছ আর ঘাসের মধুর শ্যামলিমা আর রকম-বেরকম বনফুলের রামধনু-রঙের লীলা! মাঠের পরেই প্রকাণ্ড এক পাহাড় আকাশকে ধরবার জন্যে যেন উপরে—আরও উপরে উঠে গেছে। তার কোলে লাখো লাখো গাছ সমুদ্র-স্নান থেকে ফিরে-আসা হাওয়ার ঠান্ডা ছোঁয়া পেয়ে পরমোল্লাসে দুলে দুলে নেচে উঠছে! পাহাড়ের মাঝখান থেকে একটি ঝরনা গলানো রুপোর ধারার মতন পাথরে পাথরে লাফাতে লাফাতে কৌতুক-হাসি হাসতে হাসতে নীচে নেমে এসে, মাঠের সবুজ বুক আদরে ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর সেই রূপের হাটে নানা-জাতের পাখিরা গানের আসর বসিয়ে প্রাণ মাত করে দিচ্ছে!

অমিয় আহ্লাদে মেতে গান শুরু করলে—

স্বরগের বুক থেকে আলো-মেয়ে দুলে দুলে—
নেমে আসে বনে বনে, নেমে আসে ফুলে ফুলে।
কাননের বুক থেকে, আদরের ডাক ডেকে
নাচে পাখি, গানে তার মরমের দ্বার খুলে!
নীলিমার বুক থেকে, সুষমার মুখ দেখে,
ছুটে চলে সমীরণ তটিনীর কূলে কূলে!

কুসুমের বুক থেকে, লাল-নীল রং মেখে,
ওড়ে কত প্রজাপতি ছোটো পাখা খুলে খুলে!
ধরণীর বুক থেকে, আয় তোরা যাবি কে কে,—
স্বপনের তপোবনে তপনের তাপ ভুলে!

বীরেনদা একদিকে আঙুল তুলে ধরে বলে উঠল, 'থামো অমিয়, ওদিকে একবার চেয়ে দ্যাখো!'

ফিরে দেখি, সেই চোখদুটো! সেই ক্ষুধা-ভরা হিংসামাখা অগ্নিউজ্জ্বল চোখদুটো আবার একটা জঙ্গলের ঝোপের ফাঁক দিয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে পলক-হারা হয়ে আছে! আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, কেবল সেই চোখদুটো! তার চাউনি দেখলে খুব সাহসীরও বুকের কাছটা হিম হয়ে যায়!

অমিয় রবিবাবুর গান ধরলে—

'ওই আঁখি রে
ফিরে ফিরে চেও না চেও না, ফিরে যাও,
কী আর রেখেচ বাকি রে!'

বীরেনদা আর আমি দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুললুম।

কিন্তু চোখ দুটো আবার সাঁৎ করে সরে গেল—জঙ্গলের পথে আবার শুকনো পাতার মড়মড়ানি উঠল, বুঝলুম যার চোখ সে দৌড়ে পালাচ্ছে!

বীরেনদা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কার ওই চোখ? ও কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে? ও চোখে তো মানুষের চাউনি নেই! তবে কি সত্যি সত্যি ভূত-প্রেত বলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ও-কথা যেতে দাও বীরেনদা! এখন আমরা কী করব বলো।'

বীরেনদা বললে, 'আমরা? আমরা আপাতত ওই পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠব। ওইখানে ঝরনার ধারে বসে আজকের রাতটা তো কাটিয়ে দি, কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে অখন।'

পাহাড়ের ওপরে এসে যে জায়গাটি আমাদের পছন্দ হল, তার একধারে ঝরনা, একধারে গভীর খাদ আর একধারে পাহাড়ের গা খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়েই—গুহা নয়, অথচ গুহার মতনই একটা জায়গা ছিল, আমরা স্থির করলুম, তার ভিতরে বসেই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে জাহাজের ভাঁড়ার ঘর থেকে আমরা অনেকগুলো বিস্কুট, জ্যাম-জেলি ও রক্ষিত মাছ-মাংসের টিন সংগ্রহ করে এনেছিলুম। ঝরনার ধারে বসে মুখ-হাত ধুয়ে সেই টিনের খাবারেই পেট ভরালুম—খাবারগুলো লাগল যেন অমৃতের মতো। আর ঝরনার জল? সে যে কী মিষ্টি, তা আর কী বলব!

তারপর সেই আধা-গুহার ভিতরে গিয়ে বসলুম। তখন বেলা যায় যায়। সন্ধ্যা তার ছায়া-আঁচল দুলিয়ে তখন ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ আলোটুকু নিবিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বাসা-ভোলা পাখি মাঝে মাঝে তখনও এদিকে-ওদিকে উড়ছে ও আসন্ন আঁধারকে দেখে ভীতচকিত স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।

স্থির হল, প্রথম রাতে বীরেনদাকে, মাঝ-রাতে আমাকে আর শেষরাতে অমিয়কে জেগে পাহারা দিতে হবে। কারণ তিনজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে এই বিপদ-ভরা বন-জঙ্গলে কাল সকালে হয়তো কারুকেই আর জেগে উঠতে হবে না।

আমি আর অমিয় শুয়ে পড়লুম! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর দুশ্চিন্তায় দেহ আর মন যেন এলিয়ে পড়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম।

...মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বীরেনদা শুয়ে পড়ে চোখ মুদলে।

এককোণ ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসলুম।

রাত তখন থমথম করছে—বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চকমকিয়ে উঠে ঝরনা তার অশ্রান্ত সংগীতকে যেন নিশীথিনীর নিসাড় বুকের ভিতরে দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে!

রাতের একটি বাঁধা সুর আছে! সে সুর গাছের পাতার নয়, ঝিঁঝিপোকার নয়, বাতাসের নয়, বা আর কোনও জীবের নয়—সে হচ্ছে রাতের একেবারে নিজস্ব সুর! বিজন স্তব্ধতার ভিতরে তা শোনা যায়, বোবা আকাশকে স্তম্ভিত করে, সারা ধরণীকে আকুল করে সে বিচিত্র সুর ঝিমঝিম করে বাজতে থাকে আর বাজাতে থাকে, সে অদ্ভুত সুর শুনলে ভাবুকের মনের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে—রাতের বীণায় সে যেন ভগবানের নিজের হাতে গাঁথা রাগিণী, যার অস্ফুট ঝঙ্কারের ভিতরে পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য লুকানো আছে!

রাতের সেই একটানা সুর কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল বাইরের আবছায়ার ভিতর থেকে চমকে উঠল আবার দুটো জ্বলজ্বলে তীব্র চোখ। সেই দুটো চোখ—যা আজ সারা দিন আমাদের পিছু ছাড়েনি। ভালো করে চেয়ে কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারই মনের ভুল।

আচম্বিতে কী একটা জীবের কাতর আর্তনাদে ও বাঘের ভীষণ গর্জনে চারিদিক কাঁপতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ভাঙা পাখিদের ব্যস্ত চিৎকার! খানিক পরেই সব আবার চুপচাপ!

তারপরেই দেখি, একখানা কালো-কুৎসিত অস্থিসার হাত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভিতরে ঢুকছে। দেহ নয়, শুধু একখানা হাত! তার বাঁকা বাঁকা লম্বা আঙুলগুলো আকুল হয়ে খুঁজছে যেন কাকে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম—একী, এ কী ব্যাপার?

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, হাতখানা বীরেনদার ঘুমন্ত দেহের উপরে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ খপ করে তার গলা চেপে ধরলে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

অজানা দ্বীপের রানি

বীরেনদার বিপদ দেখে এক পলকেই আমার সমস্ত অসাড়তা ছুটে গেল—বিদ্যুতের মতন সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বন্দুকের নলটা সেই অস্থিসার হাতখানার উপরে রেখে ঘোড়া টিপলুম।

গুড়ুম করে বন্দুক গর্জন করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক আর্তনাদ,—হাতখানাও সোঁ করে সরে গেল!

বীরেনদা ধড়মড় করে উঠে বসে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে যাতনাভরে বললে, 'সরল, সরল!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীরেনদা, বীরেনদা, তোমার কি বড়ো বেশি লেগেছে?'

অমিয়ও উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, 'হয়েছে কী বীরেনদা? হয়েছে কী সরলদা?'

আমি ব্যাপারটা সব খুলে বললুম।

বীরেনদা তখনই বিজলি-মশাল আর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখে খানিকটা রক্ত ছাড়া বাইরে আর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অমিয় আবার রবিবাবুর গান ধরলে ঃ—

'সে যে, পাশে এসে বসেছিল,
তবু জাগি-নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এই ভূতুড়ে শত্রুটা তো ভারী ভাবিয়ে তুললে দেখছি! এ ধরাও পড়ে না, আমাদের ছেড়েও যায় না!'

বীরেনদা বললে, 'কিন্তু বাছাধন আপাতত বোধ হয় আর শিগগির এমুখো হচ্ছেন না। সরলের গুলি খেয়ে এখন হাত নিয়ে কিছুদিন কাত হয়ে থাকুন তো!'

এমনি সব কথা কইতে কইতে আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল।

বনের পাখিরা অগ্রদূত হয়ে খবর দিলে—আর ভয় নেই, এখনই আসবে আনন্দের সাথী প্রভাত।

ভোর হল। বনের সবুজের ওপরে কচি রোদ এসে কাঁচা সোনার জলের ছবি এঁকে দিলে! মৌমাছি আর প্রজাপতিদের ভিতরে আবার মৌ-চয়নের সাড়া পড়ে গেল।

বীরেনদা বললে, 'এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নাও।'

তারপর সেই আধা-গুহার ভিতরে গিয়ে বসলুম। তখন বেলা যায় যায়। সন্ধ্যা তার ছায়া-আঁচল দুলিয়ে তখন ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ আলোটুকু নিবিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বাসা-ভোলা পাখি মাঝে মাঝে তখনও এদিকে-ওদিকে উড়ছে ও আসন্ন আঁধারকে দেখে ভীতচকিত স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।

স্থির হল, প্রথম রাতে বীরেনদাকে, মাঝ-রাতে আমাকে আর শেষরাতে অমিয়কে জেগে পাহারা দিতে হবে। কারণ তিনজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে এই বিপদ-ভরা বন-জঙ্গলে কাল সকালে হয়তো কারুকেই আর জেগে উঠতে হবে না।

আমি আর অমিয় শুয়ে পড়লুম! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর দুশ্চিন্তায় দেহ আর মন যেন এলিয়ে পড়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম।

...মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বীরেনদা শুয়ে পড়ে চোখ মুদলে।

এককোণ ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসলুম।

রাত তখন থমথম করছে—বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চকমকিয়ে উঠে ঝরনা তার অশ্রান্ত সংগীতকে যেন নিশীথিনীর নিসাড় বুকের ভিতরে দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে!

রাতের একটি বাঁধা সুর আছে! সে সুর গাছের পাতার নয়, ঝিঁঝিঁপোকার নয়, বাতাসের নয়, বা আর কোনও জীবের নয়—সে হচ্ছে রাতের একেবারে নিজস্ব সুর! বিজন স্তব্ধতার ভিতরে তা শোনা যায়, বোবা আকাশকে স্তম্ভিত করে, সারা ধরণীকে আকুল করে সে বিচিত্র সুর ঝিমঝিম করে বাজতে থাকে আর বাজাতে থাকে, সে অদ্ভুত সুর শুনলে ভাবুকের মনের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে—রাতের বীণায় সে যেন ভগবানের নিজের হাতে গাঁথা রাগিণী, যার অস্ফুট ঝঙ্কারের ভিতরে পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য লুকানো আছে!

রাতের সেই একটানা সুর কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল বাইরের আবছায়ার ভিতর থেকে চমকে উঠল আবার দুটো জ্বলজ্বলে তীব্র চোখ। সেই দুটো চোখ—যা আজ সারা দিন আমাদের পিছু ছাড়েনি। ভালো করে চেয়ে কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারই মনের ভুল।

আচম্বিতে কী একটা জীবের কাতর আর্তনাদে ও বাঘের ভীষণ গর্জনে চারিদিক কাঁপতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ভাঙা পাখিদের ব্যস্ত চিৎকার! খানিক পরেই সব আবার চুপচাপ!

তারপরেই দেখি, একখানা কালো-কুৎসিত অস্থিসার হাত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভিতরে ঢুকছে। দেহ নয়, শুধু একখানা হাত! তার বাঁকা বাঁকা লম্বা আঙুলগুলো আকুল হয়ে খুঁজছে যেন কাকে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম—একী, এ কী ব্যাপার?

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, হাতখানা বীরেনদার ঘুমন্ত দেহের উপরে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ খপ করে তার গলা চেপে ধরলে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

অজানা দ্বীপের রানি

বীরেনদার বিপদ দেখে এক পলকেই আমার সমস্ত অসাড়তা ছুটে গেল—বিদ্যুতের মতন সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বন্দুকের নলটা সেই অস্থিসার হাতখানার উপরে রেখে ঘোড়া টিপলুম।

গুডুম করে বন্দুক গর্জন করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক আর্তনাদ,—হাতখানাও সোঁ করে সরে গেল!

বীরেনদা ধড়মড় করে উঠে বসে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে যাতনাভরে বললে, 'সরল, সরল!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীরেনদা, বীরেনদা, তোমার কি বড়ো বেশি লেগেছে?'

অমিয়ও উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, 'হয়েছে কী বীরেনদা? হয়েছে কী সরলদা?'

আমি ব্যাপারটা সব খুলে বললুম।

বীরেনদা তখনই বিজলি-মশাল আর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখে খানিকটা রক্ত ছাড়া বাইরে আর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অমিয় আবার রবিবাবুর গান ধরলে ঃ—

'সে যে, পাশে এসে বসেছিল,
তবু জাগি-নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এই ভূতুড়ে শত্রুটা তো ভারী ভাবিয়ে তুললে দেখছি! এ ধরাও পড়ে না, আমাদের ছেড়েও যায় না!'

বীরেনদা বললে, 'কিন্তু বাছাধন আপাতত বোধ হয় আর শিগগির এমুখো হচ্ছেন না। সরলের গুলি খেয়ে এখন হাত নিয়ে কিছুদিন কাত হয়ে থাকুন তো!'

এমনি সব কথা কইতে কইতে আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল।

বনের পাখিরা অগ্রদূত হয়ে খবর দিলে—আর ভয় নেই, এখনই আসবে আনন্দের সাথী প্রভাত।

ভোর হল। বনের সবুজের ওপরে কচি রোদ এসে কাঁচা সোনার জলের ছবি এঁকে দিলে! মৌমাছি আর প্রজাপতিদের ভিতরে আবার মৌ-চয়নের সাড়া পড়ে গেল।

বীরেনদা বললে, 'এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নাও।'

অমিয় বললে, 'কিন্তু বীরেনদা, এখন যে আমাদের শালগ্রামের ওঠা-বসা। এখানে থাকাও যা, নীচে নামাও তা।'

বীরেনদা বললে, 'না না, তুমি বুঝছ না অমিয়! একবার চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসা ভালো! নইলে কোনদিক দিয়ে কখন যে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে, তা জানবার আগেই মারা পড়ব।'...

ঝরনার জলে প্রাতঃস্নান সেরে, কিছু জলখাবার খেয়ে আবার আমরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে গেলুম।

মাঠ পেরিয়ে একটা বনে গিয়ে পড়লুম। এবারের বনেও জঙ্গল আর বড়ো বড়ো গাছের অভাব নেই বটে, কিন্তু আগেকার মতন এ বনটা তেমন অন্ধকার নয়।

আমি বললুম, 'তোমরা একটু সাবধান হয়ে চলো। কারণ কাল রাতে আমি বাঘের ডাক শুনেছি।'

অমিয় বললে, 'বাঘ-টাঘের সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই না বটে, কিন্তু একটা হরিণ-টরিণ পেলে আজকের দিনটা নেহাত মন্দ কাটে না—কী বলো বীরেনদা?'

বীরেনদা বললে, 'পৃথিবীর চারিদিকেই হিংসার খেলা। বাঘ খুঁজছে আমাদের, আমরা খুঁজছি হরিণদের। আমরা ভাবি বাঘকে হিংসুক আর আমাদের হিংসুক ভাবে হরিণরা। অদ্ভুত এই দুনিয়া!'

আমি কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই মাথার উপরকার মস্তবড়ো গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে কারা লাফিয়ে পড়ল এবং কিছু দেখবার বা বোঝবার আগেই এমন অতর্কিতে তারা আমাদের আক্রমণ আর কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললে যে, আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

তারা দেখতে খুব জোয়ান, যেন মিশমিশে কালো আবলুশ কাঠ থেকে কুঁদে তাদের দেহগুলো গড়া হয়েছে। কারুর হাতে ধনুক-বাণ, কারুর হাতে বর্শা। গলায়, কানে, বাহুতে হাড়ের গয়না আর পরনে এক এক টুকরো নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। দলে তারা বেশ পুরু—অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন।

আমাদের হাত-পা আচ্ছা করে বেঁধে তিনজনকেই তারা মাটির ওপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় হাত-মুখ নেড়ে তারা কী বলাবলি করতে লাগল।

অমিয় বললে, 'ও বীরেনদা! এখন বোধ হয় আমাদের আর হরিণের মাংস খাবার কোনোই আশা নেই। এই কেলে স্যাঙাতরাই আমাদের হয়তো আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে উদরসাৎ করবে।'

বীরেনদা বললে, 'চোখে বড়ো ধুলো দিয়েছে হে। বোম্বেটে, মানোয়ারি গোরা, হাঙর, কুমির আর সমুদ্রকে এড়িয়ে শেষটা যে এই বুনোদের পাল্লায় এমন বোকার মতো ধরা পড়ে যাব, আগে কে তা জানত?'

আমি বললুম, 'ধরা-পড়া বলে ধরা-পড়া! একেবারে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু! ছাড়ান পাবার কোনোই উপায় নেই, দয়াও পাব না বোধ হয়। ওদের গলায় কী ঝুলছে দেখছ তো? মড়ার মাথার খুলি।'

আচম্বিতে কাছেই শিঙার মতন কী একটা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কোথা থেকে অনেক ঢোলের আওয়াজ এবং অসভ্য মানুষগুলো সসম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে আমাদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে দাঁড়াল।

দেখলুম, বনের চারিদিক থেকে পিলপিল করে অসভ্যের পর অসভ্য যোদ্ধা বেরিয়ে আসছে নাচতে নাচতে, বর্শা নাচাতে নাচাতে বা ঢোল বাজাতে বাজাতে।

অমিয় বললে, 'ও বীরেনদা—আরও আসে যে! কী করা যায় বলো দেখি? কেলে ভূতগুলো দূরে সরে গেছে, বন্দুকগুলোও হাতের কাছে পড়ে রয়েছে, আর আমার মনও বলছে, এই বাঁধন-দড়িগুলো অল্প চেষ্টা করলেই আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি।'

বীরেনদা বললে, 'দড়ি ছেঁড়বার সময় এখনও আসেনি। ওদের হাতেও তির-ধনুক রয়েছে, বলা তো যায় না—যদি ওদের তিরে বিষ মাখানো থাকে? তার চেয়ে এখন চুপ করে থাকাই ভালো, দ্যাখো না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?'

দেখতে দেখতে বনের আশপাশ লোকে লোকে ভরে গেল—সকলেরই কৌতূহলী চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট।

হঠাৎ আবার শিঙা বাজল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাচ-বাজনা থেমে গেল। সকলে একেবারে পাথরের মূর্তির মতন স্থির ও স্তব্ধ।

একদিককার ভিড় সরে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে যা দেখলুম সে এক অকল্পিত দৃশ্য!

অপূর্ব এক তরুণীর মূর্তি—রং তার ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মতো!

তরুণীর মেঘের মতন কালো চুল পিছনে, কাঁধে, বুকে গোছায় গোছায় এলিয়ে পড়েছে এবং তার বুক থেকে উরু পর্যন্ত বাঘের ছালে ঢাকা!

সমস্ত মন বিস্ময়ে ভরে উঠল—কে এই নবযৌবনা, মানবী না বনদেবী?

মূর্তিময়ী স্বপ্ন-সুষমার মতন আমাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তরুণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দয়াভরা দুটি সুন্দর ডাগর চোখে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইল নীরবে।

বীরেনদা মোহিত স্বরে বললে, 'সরল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এ মূর্তি এখানে কী করে এল?'

আমাদের সকলকে অধিকতর বিস্মিত করে তরুণী খুব নরম মিষ্টি গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'আপনারা কি বাঙালি?'

প্রথমটা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। তারপর আবার সেই জিজ্ঞাসা শুনে আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

তরুণী অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'কত দিন পরে দেশের কথা শুনলুম, কত দিন পরে বাঙালিকে দেখলুম!'

বীরেনদা বললে, 'আপনার কথা শুনে আপনাকেও তো বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, আমি বাঙালির মেয়ে।'

—'বাঙালির মেয়ে! এইখানে—এই অজানা দ্বীপে—এই অসভ্যদের মাঝখানে!'

তরুণী করুণ স্বরে বললে, 'সে অনেক কথা, পরে বলব! ...আপাতত শুনে রাখুন, আমি এই দ্বীপের রানি, আর আপনারা আমার বন্দি। আপনাদের সঙ্গে এখন আমি আর কথা কইতে পারব না, তাতে আপনাদেরই অমঙ্গল হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের কোনও ভয় নেই।'

—এই বলেই তরুণী ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আমাদের অবোধ্য ভাষায় সঙ্গের লোকদের ডেকে কী বললে।

অমনি আবার শিঙা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢোল বাজানো, নাচ ও হইচই শুরু হল। তারপর কয়েকজন লোক এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে এবং উঠে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

তরুণী রানিকে নিয়ে অসভ্য লোকগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল—চারিদিকে কড়া পাহারা নিয়ে আমরাও অগ্রসর হলুম।

অমিয় বললে, 'সরলদা, হাত বাঁধা, কাজেই হাততালি দিতে পারব না, কিন্তু গলা যখন খোলা আছে তখন গান গাইব না কেন? বলেই শুরু করলে :—

ওগো অজানা দেশের রানি!
তোমার মুখেতে শুনি আমাদের
আপন প্রাণের বাণী।

কোন অমরার তুমি সে জোছনা,
বলো বীণা-স্বরে কমললোচনা!
পূজিব তোমাকে মধুরবচনা,
জীবন ভরিয়া জানি—
শোনো, অজানা, অচেনা রানি।

ফোটে রাঙা ফুল চুমিয়া চরণে,
দেখে গায় মন নতুন ধরনে,
হব তব দাস জীবনে-মরণে,
রহিব অবাক মানি—
তুমি তরুণী অরুণী রানি!

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

বীরেনদার দার্শনিকতা

কখনও ছায়া-দোলানো বনপথ দিয়ে, কখনও রোদ-মাখানো সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, এবং কখনও বা চোখ-ভোলানো ছোটো ছোটো পাহাড়ের কোল দিয়ে প্রায় মাইল-চারেক পার হয়ে আমরা একটি বড়ো গ্রামে এসে হাজির হলুম।

গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রাম যেন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ! কতকগুলো পাতা-ছাওয়া হেলে-পড়া ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর—এক-একটা গর্তের মতো ঢোকবার পথ ছাড়া সে ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া আসবার কোনও উপায়ই নেই। পথঘাটকে আঁস্তাকুড় বললেও বেশি বলা হয় না।

এক-একটা ঘরের সামনে আবার অনেকগুলো করে রোদে-শুকনো মানুষের মুণ্ড ঝুলছে! পরে শুনেছিলুম, এগুলো নাকি বড়ো বড়ো সর্দারের বাড়ি। ছলে-বলে-কৌশলে যে যত বেশি শত্রুকে স্বহস্তে বধ করে তাদের মুণ্ড সংগ্রহ করতে পারে, এ দেশে নাকি সেইই তত বড়ো সর্দার বলে সম্মান পায় এবং আপনার বড়োত্বের প্রমাণস্বরূপ মুণ্ডগুলোকে রোদে শুকিয়ে বাড়ির সামনে এই ভাবে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। এই কথা শোনবার পর যতদিন এ দেশে ছিলুম, কাঁধের উপরে নিজেদের মুণ্ডগুলোকে ঠিকঠাক বজায় রাখবার জন্যে সর্বদাই অত্যন্ত সাবধানে থাকতুম।

এরই মধ্যে একখানা বাড়ি দেখলুম—যার দিকে সহজেই সকলের নজর পড়ে। এ বাড়িখানাও পাতা দিয়ে ছাওয়া হলেও আর সব ঘর বা বাড়ির চেয়ে বড়ো তো বটেই, তার উপরে ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির সুমুখে দুজন লম্বাচওড়া লোক বর্শা হাতে করে পাহারা দিচ্ছে। এইখানা রানির বাড়ি বলে আন্দাজ করলুম এবং একটু পরেই দেখলুম আমাদের আন্দাজ ভুল নয়।

আমাদের দেখবার জন্যে গাঁয়ের মেয়েরা পর্যন্ত আজ রাস্তায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে! পুরুষদের মতন এখানকার স্ত্রীলোকদেরও লজ্জা রক্ষা পেয়েছে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড সরু লেংটির দ্বারা। তবে মানুষের হাড়ের বদলে তারা পাথরের বা প্রবালের গয়না ব্যবহার করে নিজেদের জাতিসুলভ কোমলতার মর্যাদা রেখেছে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম।

রাজবাড়ির সামনে এসে দেখি, রানি সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না, কেবল প্রভুত্বের স্বরে কী একটা হুকুম দিয়েই বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

রাজবাড়ির কাছেই একখানা কুঁড়েঘরের দিকে তারা আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে। তারপর আমাদের হাতেরও বাঁধন খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে জানালে, আমরা যেন ওই ঘরের

ভিতরে প্রবেশ করি। আমরাও আর কালবিলম্ব না করেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একটা লোক এসে আমাদের পোঁটলাপুঁটলি আর বন্দুক-তিনটে ঘরের মেঝের উপরে রেখে দিয়ে চলে গেল। উঁকি মেরে দেখলুম, দরজা বা গর্তের বাইরেই প্রায় বিশ-বাইশ জন লোক পাহারা দিচ্ছে।

আমি বললুম, 'বীরেনদা, এরা বোধ হয় জানে না যে বন্দুক কী চিজ। তা জানলে কি আর এগুলো আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যেত?'

বীরেনদা অন্যমনস্কের মতো শুধু বললে, 'হুঁ।'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা বীরেনদা, আজ হঠাৎ তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন বলো দেখি? এমন অ্যাডভেঞ্চারে কোথায় তুমি খুশি হয়ে নাচবে, না, কেবল 'হুঁ, হাঁ' দিয়েই কথা সারছ। তোমার হল কী বীরেনদা? কী ভাবছ তুমি?'

বীরেনদা একটু কেঠো হাসি হেসে বললে, 'আকাশ আর পাতালের কথা ভাবছি ভাই।'

—'আকাশ আর পাতাল চিরদিনই আছে আর চিরদিন থাকবেও। তা নিয়ে আবার চিন্তা-জ্বরে আক্রান্ত হওয়া কেন?'

—'ঈশ্বরও চিরদিন আছেন আর চিরদিন থাকেন। তবু কি মানুষ দিন-রাত তাঁরই কথা ভাবতে চেষ্টা করে না?'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তুমি যে আবার হঠাৎ দার্শনিক হয়ে পড়লে দেখছি। ব্যাপার কী?'

—'দার্শনিক হওয়াটা কি নিন্দের কথা?'

—'উঁহু, মোটেই না। কিন্তু আমরা জানতে চাই বীরেনদা, তুমি কি আজ রূপসী রানিকে দর্শন করেই দার্শনিক হয়ে উঠেছ?'

বীরেনদা রেগে কটমট করে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

অমিয় ফিক করে হেসে ফেলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গাইলে—

'কে জানে কী চোখে দেখেছি তোমায়,
প্রাণ আজ খালি ওই নাম গায়,
সুষমা-কুসুম দেখে শুধু চায়
হতে তার ফুলদানি—
ওগো না-জানা দ্বীপের রানি!'

বীরেনদা খপ করে অমিয়ের চুল ধরে এক টান মেরে বললে, 'তোমার ওই রাবিশ গান থামাও অমিয়! তোমার গান শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই!'

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

'বাংলা দেশের ছেলে'

আজ দু-দিন এই ঘরে বন্দি হয়ে আছি। বাইরে দিন-রাত পাহারা, আমরা বেরুবার চেষ্টা করলেই জানোয়ারের শামিল এই বুনো মানুষগুলো বর্শা উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

এরা এর মধ্যে যে-সব খাবার পাঠিয়েছে তা স্পর্শ করবার ভরসা আমাদের হয়নি—কে জানে বাবা তার ভিতরে সাপ-ব্যাং কী আছে। আমাদের মতন সভ্য মানুষের পেটে ঢুকে তারা যদি উলটোরকম উৎপাত শুরু করে তাহলে এই অমানুষের দেশে তার ঠ্যালা সামলাবে কে?...কাজেই পোঁটলার ভিতরে যে সব চেনা খাবার ছিল তাই খেয়েই উদরস্থ অগ্নিদেবকে ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করলুম।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রাজবাড়ি থেকে আমাদের ডাক পড়ল।

রাজবাড়ির গায়ে লাগানো খানিকটা জমির উপরে অনেক ফুলগাছ বসানো হয়েছে। এই অসভ্যের মুল্লুকে বাগান রচনার চেষ্টা দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিলুম! কিন্তু তার পরেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই রানির ইচ্ছাতেই এই বাগানের উৎপত্তি হয়েছে।

বাগানের মাঝখানে একখানা বেদির উপরে রানি বসেছিলেন—তাঁর পরনে ঠিক বাঙালির মেয়েরই মতন কাপড়, কেবল গায়ে কোনও জামা ছিল না। পরে শুনেছিলুম, জামা আর কাপড় পরা নাকি এদেশে সমাজবিরোধী কাজ, তাই অনেক চেষ্টার পর রানি শুধু কাপড় পরবার অধিকার পেয়েছিলেন।

রানিকে দেখে আমরা নমস্কার করলুম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করে বললেন, 'বসুন। কিন্তু আপনাদের ওই ঘাসের ওপরেই বসতে হবে। এ দেশে রাজা কি রানির সামনে কেউ আসনে বসতে পায় না!'

বীরেনদা ব্যস্ত কণ্ঠে শুধোলে, 'এদেশের রাজা কে?'

রানি বললেন, 'রাজা কেউ নেই। আমি যে কুমারী।'

বীরেনদা যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'কিন্তু রানিজি, আপনি কী করে এখানে এলেন?'

—'অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়। কতদিন আগে জানি না—বোধ হয় দশ-বারো বছর হল, আমি প্রথম এখানে এসেছি। আমার বাবা সায়েবদের ফৌজে কী কাজ করতেন। বাবা আর মায়ের সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে জাহাজে চড়ে আমি চিনদেশে যাচ্ছিলুম। আমার বয়স তখন নয় বছর। সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে আমাদের জাহাজকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়। বাবা আর মা কোথায় ভেসে গেলেন জানি না, কিন্তু আমি আর চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে পড়ি।

—'আপনার সঙ্গে চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ছিল?'

—'হ্যাঁ!'

—'সে কি এখনও এখানেই আছে?'

—'না, শুনুন সব বলছি। দ্বীপের এই অসভ্যরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। ঠিক সেই দিনই এদের রাজা কোনও ছেলে-মেয়ে না রেখেই মারা যান। আমাকে পেয়ে তারা ভাবলে যে, সাগরদেবতা আমাকে তাদের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই পুরুতরা খুব খুশি হয়ে ঘটা করে আমাকে তাদের সিংহাসনে বসালে।'

—'আর সেই চ্যাং?'

—'চ্যাংকে তারা প্রথমে জুজু-ঠাকুরের সামনে বলি দিতে চেয়েছিল।'

—'জুজু-ঠাকুর?'

—'হ্যাঁ, জুজু হচ্ছে এদের প্রধান দেবতা। জুজুর পুরুতরাই এখানকার সর্বেসর্বা—আমাকেও তাদের হুকুম মেনে চলতে হয়।...তারপর, যে কথা হচ্ছিল। চ্যাংকে তারা বলি দিতে চাইলে। কিন্তু আমি অনেক কষ্টে চ্যাংকে বাঁচাই। চ্যাং কিছুদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গেই রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন জুজুর মন্দির থেকে একখানা হিরে চুরি করে কোথায় যে পালাল, আর তার কোনোই খোঁজ পাওয়া গেল না।'

অমিয় বললে, 'বোধ হয় সেই চ্যাঙের সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েছে!'

রানি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

আমরা সব কথা খুলে বললুম।

রানি চিন্তিত ভাবে বললেন, 'চ্যাং তাহলে নিশ্চয়ই জুজুর মন্দির লুঠতে চায়! এই জুজুর মন্দিরে যত হিরে-মানিক আছে পৃথিবীর কোনও রাজার ঘরেও তা নেই!'

বীরেনদা বললে, 'ভয় নেই, আমরা আপনাদের রক্ষা করব!'

রানি মাথা নেড়ে বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'চ্যাঙের হাত থেকে তো আপনারা আমাদের রক্ষা করবেন, কিন্তু তার আগে পুরুতদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করবে কে?'

—'সে আবার কী?'

—'পুরুতরা যে জুজুর সামনে আপনাদেরও বলি দিতে চায়!'

আমরা সবাই চমকে উঠলুম।

রানি বললেন, 'অবশ্য আপনাদের হয়ে আমি পুরুতদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি! আর আমার কথা শুনে তাদের মনও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। কিন্তু কেবল একজন পুরুতের শত্রুতায় আমার চেষ্টা সফল হয়নি। আপনাদের ওপরে তার বিষম রাগ!'

—'কেন?'

—'আপনারা যে এই দ্বীপে এসেছেন, তার কাছ থেকেই সে-খবর আমরা প্রথমে পাই। তার একখানা হাত ভয়ানক জখম হয়েছে, আপনারাই নাকি তার সেই দুর্দশা করেছেন!'

অন্ধকার বনে সেই জ্বলন্ত চোখ আর পাহাড়ের গুহায় সেই সাংঘাতিক হাতের আবির্ভাবের সকল রহস্য এতক্ষণে বুঝতে পারলুম!

আমি বললুম, 'কিন্তু রানিজি, সে যে গায়ে পড়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল! আর একটু হলেই সে যে আমাদের একজনকে খুন করত!'

রানি বললেন, 'বুঝেছি, ওই পুরুতগুলো যে কী-রকম নিষ্ঠুর আর শয়তান আমি তা জানি,—তাদের প্রধান আনন্দ হচ্ছে নরহত্যা করা, বলি দিয়ে তারা মানুষের মাংস খায়। পুরুতরা এখন বলছে, একবার আমার কথায় চ্যাংকে ছেড়ে দিয়ে তারা ঠকেছে, এবারে আর তারা ঠকতে রাজি নয়। এ রাজ্যে তারা কোনও বিদেশিকে থাকতে দেবে না, তারা আপনাদের ধরে বলি দেবেই দেবে!'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, তারা চেষ্টা করে দেখুক না! আজ থেকেই তাহলে আমরা নিজমূর্তি ধরব—বাহুবলেই আমরা আত্মরক্ষা করব!'

রানি ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'হাজার হাজার লোকের ভিতরে আপনাদের তিনজনের বাহুবলের দাম কতটুকু?'

—'আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের বাহুবল আছে, আমাদের বন্দুক আছে—বন্দুকের শক্তি ওরা না জানুক, আপনি জানেন তো?'

—'জানি। কিন্তু অকারণে বিপদকে ডেকে এনে রক্তপাত করে লাভ কী? তার চেয়ে কৌশলে কার্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করুন।'

—'কী কৌশল, আপনি বলুন।'

—'এই অসভ্যরা যেমন হিংসুক, তেমনি আবার ছেলেমানুষের মতন সরল আর ভিতু। যা অসম্ভব—অর্থাৎ এদের কাছে যা অসম্ভব, তা যদি কেউ সম্ভবপর করে তুলতে পারে, তার কাছে এরা কুকুরের মতন পোষ মানে।'

—'কিন্তু আমাদের কী করতে হবে?'

—'এখানে সবচেয়ে আদর পায় যাদুকররা। যাদুকরদের এরা ভয়ও করে, পূজাও করে। আপনারা কেউ কি কোনওরকম ছোটোখাটো ম্যাজিক-ট্যাজিক জানেন না?'

বীরেনদা বললে, 'দাঁড়ান, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে কি বাইরের সভ্যদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোকজন আসে?'

—'কই, আমি তো দেখিনি। এই দ্বীপের বাইরে যে দেশ আছে, তাও এরা জানে না। তবে আমি এখানে থাকতে থাকতেই অনেক বছর আগে বোধ হয় একখানা জাহাজ এখানে এসে এক দিনের জন্যে নোঙর করেছিল। অসভ্যরা তাকে দেখে ভারী ভয় পেয়েছিল, আমার কাছে এসে সেই জাহাজকে সাগরদানব বলে বর্ণনা করেছিল। আমার বিশ্বাস, চ্যাং পালিয়েছিল সেই জাহাজে চড়েই।'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, তাহলে আমি এদের গোটাকয়েক ম্যাজিক দেখাতে রাজি আছি।'

রানী বললেন, 'তাহলে আর কিছু ভাবতে হবে না। আপনাকে এরা ঠিক জ্যান্ত জুজু-ঠাকুরেরই মতন পূজা করবে। তাহলে আজকেই আমি ঘোষণা করে দেব যে, যে-স্বর্গে জুজু-ঠাকুর থাকেন, আপনারা সেই স্বর্গ থেকেই জুজুর ভক্তদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এসেছেন। কাল সকালে রাজবাড়ির সামনের মাঠে আপনারা সকলকে আশীর্বাদ করবেন, আর নিজেদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবেন। কেমন, আপনারা মান রাখতে পারবেন তো? কারণ এর ওপরেই আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

বীরেনদা বললে, 'এরা যখন বাইরের জগতের কিছুই জানে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এদের ভড়কে দিতে পারব।'

রানি আর কিছু না বলে হাততালি দিলেন, তখনই একজন লোক এসে হাজির হল। রানি খানিকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। কথা কইতে কইতে লোকটা সভয়ে ও বিস্ময়ে বার বার আমাদের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল—আমরা বুঝলুম, এর মধ্যেই তার চোখে আমরা অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছি!

কথাবার্তা শেষ হলে পর লোকটা রানিকে আর আমাদের মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

রানি আমাদের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, 'এতক্ষণে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তাহলে কাল সকালেই সময় ঠিক রইল। ...আসুন, এইবারে আমরা গল্প করি!'

অমিয় বললে, 'রানিজি, আপনার নামটি তো এখনও আমাদের বলেননি?'

—'আমার নাম? বিজয়া। আমি বিজয়ার দিনে জন্মেছিলুম বলে বাবা আমার ওই নাম রেখেছিলেন?' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'আপনাদের পেয়ে যে আমার কী আহ্লাদ হয়েছে, মুখ ফুটে আমি তা বলতে পারব না! দেশের কথা আজ আমার কাছে স্বপ্নের মতন হয়ে গেছে, এ জীবনে হয়তো আর দেশে ফিরতেও পারব না। আর ফিরবই বা কার কাছে, আমার মাও নেই—বাবাও নেই।'

বীরেনদা বললে, 'আমাদের দশা আরও খারাপ। দেশে আমাদের সব আছে, আমরা কিন্তু কোনওদিন আর সেখানে ফিরতে পারব না!'

আমি মুখে আর কিছু বললুম না, কিন্তু আমার বুক ঠেলে কান্না জেগে উঠল।

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আজ এই দূর বিদেশে বনের মাথায় যে চাঁদ উঠেছে, তার আলো আজ আমাদের বাংলা দেশেরও বুককে ভরিয়ে তুলছে। চাঁদের চোখে আজ বাংলা দেশের ছবি লেখা, কিন্তু আমাদের চোখে আঁকা শুধু অন্ধকার।'

রানি মমতা-মাখানো গলায় বললেন, 'মিছে ভেবে মন খারাপ করবেন না। তার চেয়ে আপনাদের কারুর গান জানা থাকলে আমাকে বাংলা দেশের একটি গান শোনান।'

বীরেনদা বললে, 'অমিয় হচ্ছে আমাদের ছোট্ট দলের বাঁধা গাইয়ে। গাও অমিয়!'

অমিয় গাইলে—

আমরা সবাই বাংলা দেশের ছেলে রে ভাই,
বাংলা দেশের ছেলে!
দিবস-রাতে মোদের আঁতে যাচ্ছে কতই
চন্দ্র-তপন খেলে।
মা-বোন-বধূ আদর বিলায় ঘরে,
বাইরে বাতাস ঝঙ্কারে কান ভরে,
ফুল-রাগিনী শোনায় চাঁপা, অশোক, বকুল
গহন-বনেও গেলে।
চাঁদনি-মাখা নদীর ধারে ধারে,
ধানের খেতে কনক ভারে ভারে,
তেপান্তরেও মাঠ-ভরা ঘাস দ্যায় যে বুকে
শ্যামলা হাসি ঢেলে।
কোকিল, শ্যামা আর পাপিয়ার সুরে
গানের স্বপন জাগে মানসপুরে,
নামলে আঁধার পল্লিবালা তুলসি-তলায়,
দেয় গো পিদিম জ্বেলে
গাঙের জলে ভাটিয়ালির স্বরে
মাঝিরা সব দেবতাদের নাম করে,
অনন্তেরি নিত্যপূজা মন্দিরে হয়—
সন্ধেবেলা এলে।
গঙ্গাতীরের মিষ্টি-নরম মাটি,
তার ওপরেই আমরা সবাই হাঁটি,
সেই মাটিতেই মানুষ মোরা, চাই না স্বরগ
মাটির বাংলা ফেলে।

সামনেই খানিক-স্পষ্ট, খানিক-অস্পষ্ট পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমাতিউচ্চ হয়ে নীলাকাশের সোপানশ্রেণির মতন উপর-পানে উঠে গিয়েছে এবং তারই সবচেয়ে উঁচু শিখরের উপরে মুকুটের মতন জেগে রয়েছে, জ্বলন্ত চাঁদ। এই সুদূর বিদেশের বাগান থেকে অজানা সব ফুলের গন্ধ জেগে উঠে মনের ভিতরের মাদকতার আবেশ এনে দিচ্ছিল এবং রানি বিজয়াকে দেখাচ্ছিল, যেন এক জ্যোৎস্না-গড়া দেবী প্রতিমার মতো।

এরই ভিতরে অমিয়র গান আজ বাংলার কোকিল-পাপিয়ার অভাব পূরণ করলে—

আমাদের মনে হতে লাগল, আমরা যেন আবার সেই বাংলা দেশের সবুজ কোলের ভিতরেই আপনজনের কাছে বসে আছি।

বীরেনদার স্তব্ধতা ক্রমেই বিস্ময়কর ও সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। সে নির্বিকারে ঘাসের উপরে গা বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, নিষ্পলক নেত্রে।

অমিয়র গান থেমে গেল। রানি কিছুক্ষণ মৌন থাকবার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, 'অমিয়বাবু, আজ আপনার গান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি বিদেশে আছি। অনেক—অনেক বছর পরে আমার মনের ভিতর থেকে আজ এই প্রবাসের দুঃখ মুছে গেল। এই আনন্দের জন্যে আমি আপনাদের সকলকেই প্রণাম করি।'

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

'ভানুমতীর খেল'

পরের দিন খুব সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের ঘরখানা জনতা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

ঘরের ভিতরে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন। সকলেরই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং সকলেরই দেহ কাঠের পুতুলের মতন অত্যন্ত আড়ষ্ট।

প্রথমটা আমার বুক যেন ছাঁৎ করে উঠল! কে এরা? সেই হতভাগা জুজুর কাছে এরা কি আমাদের মুণ্ডগুলোকে ধড় থেকে আলাদা করবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলুম। কিন্তু তার পরেই দেখলুম, বিছানার উপরে বীরেনদা আর অমিয় অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে গদিয়ানি চালে বসে রয়েছে।

বীরেনদা শান্তভাবে হেসে বললে, 'ভয় নেই সরলভায়া! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এদের দেখে তুমিও কি বুঝতে পারছ না যে, এরা হচ্ছে সেই জুজুর ত্যাঁদড় পুরুতের দল? এরা বোধ হয় ভানুমতীর খেল দেখবার জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে।'

ঘরের লোকগুলোর দিকে ফিরে দেখলুম, তাদের সাজগোজ এখানকার সাধারণ লোকগুলোর মতন নয়। তাদের মাথায় রয়েছে পাখির পালকের মুকুট, সর্বাঙ্গে আঁকা নানান-রকম অদ্ভুত উলকি, হাতে বর্শা বা ধনুকের বদলে এক-একটা কালো রঙের লাঠি এবং কোমরে লেংটির বদলে বাঘের ছাল।

লোকগুলোর চোখে কোনওরকম বন্ধুত্বের ভাব না মাখানো থাকলেও ভয়, সম্ভ্রম অথচ অবিশ্বাসের আভাস যেন রীতিমতোই পাওয়া গেল।

আমাদের সকলকে জেগে উঠতে দেখে তারা হাত তুলে দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

বীরেনদা বললে, 'সরল! অমিয়! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও। তারপর আমাদের কার্দানি দেখিয়ে এই ব্যাটাদের চক্ষু স্থির করে দেব!'

রাজবাড়ির সামনের মাঠে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য! মস্ত মাঠ, প্রায় মাইল-খানেক লম্বা। চওড়াতেও সেইরকম। কিন্তু অতবড়ো মাঠেও আজ তিলধারণের ঠাঁই নেই। এ রাজ্যের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যেখানে যে ছিল, সবাই আজ এইখানে এসে জুটেছে। মাঠ ভরে কিলবিল করছে কালো কালো সব ভূত-পেতনির মতন অগুনতি চেহারা! নজরে যতখানি পড়ল—প্রত্যেকেরই মুখ ভয়, সম্ভ্রম আর কৌতূহলে ভরা!

মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু মাচার মতন করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের নির্দিষ্ট স্থান। রানি বিজয়াও সেই মাচার উপরে বসে আছেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যস্থ হবেন,—অর্থাৎ সকলকে বুঝিয়ে দেবেন আমাদের কথা।

মাচার তলাতেই প্রায় চার-পাঁচশো লোক রয়েছে, তাদের সকলেরই সাজগোজ আমাদের ঘরে আজ সকালে যাদের দেখেছি, তাদেরই মতন। বুঝলুম, এরা হচ্ছে এই রাজ্যের পুরোহিতের দল। ভালো করে চেয়ে দেখলুম, প্রত্যেক মুখেই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের আভাস! ভেলকিবাজি যদি তাদের মনের মতন না হয়, তাহলে আমাদের অবস্থাও যে আরামদায়ক হবে না তাও বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে শিঙা ও দামামা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রানি বিজয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বীরেনবাবু, এইবার আপনার ম্যাজিক শুরু করুন—যদিও সে ম্যাজিক দেখে আমি ভুলব না!'

বীরেনদা উঠে দাঁড়াল। একবার লোক ভুলোবার জন্যে আকাশ-পানে মুখ ও হাত তুলে চোখ মুদে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখে গাম্ভীর্যের বোঝা নামিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুড়ে বললে, 'ওরে অসভ্য বনমানুষের দল! তোরা নাকি আমাদের বলি দেবার মতলব করেছিস? তোরা কি জানিস না যে আমরা একটা কড়ে আঙুল তুললে তোরা সবাই এখনই ভগবান জুজুর অভিশাপে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবি! তোরা আমাদের ক্ষমতা দেখতে চাস? বেশ, তবে তাই দেখ! এই চেয়ে দেখ, আমার হাতে একটা জিনিস রয়েছে। এই জিনিসের গুণে চন্দ্র-সূর্য পাহাড় আর সুদূরের সমস্ত দৃশ্য আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। যদি বিশ্বাস না হয়, জুজুর প্রধান পুরোহিত আমার কাছে আসুক, স্বচক্ষে সে আমার ক্ষমতা দেখে যাক।'

বীরেনদার হাতের জিনিসটা আর কিছুই নয়, দূরবিন।

রানি বীরেনদার কথাগুলো সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। জুজুর প্রধান পুরোহিতের মুখে

বিস্ময় আর সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। পায়ে পায়ে থতমত খেয়ে সে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। বীরেনদা দূরবিনটা তার চোখের সামনে ধরলে। দূরবিনের ভিতর দিয়ে মিনিটখানেক বাইরের জগৎ দেখেই বড়ো পুরুতের গা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—তাড়াতাড়ি দূরবিন থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সে আগে হতভম্বের মতন আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা চিৎকার করতে করতে দ্রুতপদে পুরুতদের দলের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে গা ঢাকা দিলে কোথায় কে জানে!

জনতার ভিতরে জাগল বহুকণ্ঠের চিৎকার!

রানি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওরা বলছে আপনারা সবাই স্বর্গীয় যাদুকরের বাচ্ছা!'

তারপর দ্বিতীয় ম্যাজিক-এর পালা হচ্ছে আমার। একখানা আতশিকাচ সকলের চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'হে জুজুর ভক্তবৃন্দ! তোমরা সবাই শোনো। আমার হাতে এই যে পবিত্র জিনিসটি দেখচ, বহু পুণ্যফলে এটি আমি লাভ করেছি। এর মহিমায় স্বয়ং সূর্যদেব আমাদের বশীভূত হয়েছেন। এখন আমি আদেশ করলেই তিনি আমার সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করে ফেলবেন। তোমাদের কেউ যদি পরীক্ষা করতে চাও তাহলে এগিয়ে এসো,—আমি তার শরীরের যে-কোনও স্থানে ভয়ানক আগুন জ্বেলে দেব!'

রানি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু বিপুল জনতা আতঙ্কে একেবারে স্থির হয়েই রইল, একজন লোকও সাহস করে অগ্রসর হল না!

তখন আমি আর কিছু না বলে একখানা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তারই উপরে আতশিকাচ ধরে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করলুম। পাতাখানা যেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সমস্ত মাঠের লোক একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল—সে ভীষণ চিৎকারে কান যেন ফেটে যাবার মতন হল!

চিৎকার থামলে পর তৃতীয় ম্যাজিক দেখালে অমিয়। প্রথমে সে একটা দেশলাইয়ের বাক্স সকলকে দেখালে। তারপর বললে, 'এই যে পবিত্র দ্রব্য, এটি ভগবান জুজু নিজে আমাকে দান করেছেন। এর সঙ্গে সর্বগ্রাসী অগ্নিদেব আমার কাছে বন্দি হয়ে আছেন। এই দ্যাখো তার প্রমাণ'—বলেই সে ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ফেললে।

তারপর আবার সেই আকাশ-কাঁপানো চিৎকার!

পুরুতদের পানে তাকিয়ে দেখলুম, তারাও চিৎকার করছে না বটে, কিন্তু তাদের সকলকার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, মুখ ভয়ে বিবর্ণ!

তারপর আমরা তিনজনেই নিজের নিজের বন্দুক তুলে নিলুম।

বীরেনদা বললে, 'এইবারে তোমরা আমাদের আর এক শক্তি দ্যাখো! আমাদের হাতে এই যে তিনটি জিনিস দেখছ, এগুলি হচ্ছে আকাশের বজ্র। ভগবান জুজু এই বজ্রের দ্বারা

শত্রু বধ করে থাকেন। এরই দ্বারা আমরা সেদিন জুজুর এক অবাধ্য পুরুতের হাত ভেঙে দিয়েছি—দয়া করে কেবল তার প্রাণটা আর নিইনি!'

সামনের একটা গাছের উঁচু ডালে এক ঝাঁক শকুনি বসেছিল। আমরা প্রত্যেকেই তাদের এক-একটাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললুম! ঘোড়া টেপার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল এবং পরমুহূর্তে তিনটে শকুনি শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে নেমে মাটির উপরে পড়ে গেল।

বিপুল জনতার ভিতর থেকে এবারে যে ভয়ার্ত চিৎকার উঠল, তার আর তুলনা নেই। তারপরেই সেই হাজার হাজার লোক মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভক্তিভঁরে বার বার প্রণাম করতে লাগল আমাদের উদ্দেশে।

বীরেনদা বললেন, 'হে জুজুর প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের কোনও আশঙ্কা নেই। তোমরা যদি অনুগত থাকো, তাহলে আমরা তোমাদের মঙ্গল করব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করলে আমাদের এই বজ্র তোমাদের কারুকেই ক্ষমা করবে না, অতএব সাবধান, সাবধান, সাবধান!'

তারপরেই জুজুর পুরুতদের দল এগিয়ে এসে মঞ্চের সামনে দুই হাত তুলে, মাথা হেঁট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

রানি বললেন, 'পুরুতরা স্বীকার করছে, আজ থেকে ওরা আপনাদের দাস হয়ে রইল। আপনারা হাত তুলে ওদের অভয় দিন!'

আমরা অভয় দিলুম মনে মনে হাসতে হাসতে!

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

মৃত্যু-যুদ্ধ

এই যে বিজয়া মেয়েটি, আমাদের সকলেরই চোখে একে বড়ো মিষ্টি লাগল!

দেশে যে-সব আমাদের চেনা মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে বিজয়ার কিছুই মেলে না—সে বাঙালির মেয়ে, ওই পর্যন্ত! আর তার কারণও বোঝা শক্ত নয়। বাল্যবয়স থেকেই সে এই অসভ্যদের দলের ভিতরে বন্য প্রকৃতির মাঝখানে মানুষ হয়েছে—আদব-কায়দা বা সামাজিকতা, কিছুই সে শেখেনি এবং যেটুকু শিখেছিল তাও বোধহয় ভুলে গিয়েছে। তাই বাঙালি পুরুষদেরও চেয়ে সে বেশি সপ্রতিভ এবং বেশি স্বাধীন—পাঁচজন সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে মানুষের যেটুকু আত্মগোপন করার দরকার হয়, সেটুকু খল-কপটতাও তার কথায় বা ব্যবহারে বা ভাব-ভঙ্গিতে ছিল না!

ফলে দিন-দশেকের ভিতরেই বিজয়া আমাদের সঙ্গে একেবারে আমাদেরই মতন হয়ে মিলে-মিশে গেল—আমরা যে যুবক এবং সে যে রূপসী যুবতী, তার ভাব দেখলে মনে হত, এ সংকোচ তার মনের ভিতরে যেন একবারও উঁকি দেয়নি।

সে আমাদের নাম ধরে 'তুমি' বলে ডাকতে শুরু করেছিল এবং আমাদেরও মানা করে দিয়েছে, আমরাও যেন তার 'রানি' উপাধি বাদ দিয়ে নাম ধরে তাকে ডাকি!

এমন এক কল্পনাতীত অবস্থায় তিন যুবকের ভিতরে একটিমাত্র যুবতী এসে পড়লে ঔপন্যাসিকরা কত-রকম মেলোড্রামাটিক ঘটনার সরস কল্পনা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এই মেলামেশার ভিতরে এখনও পর্যন্ত কোনও বিচিত্র রোমান্স বা ওই জাতীয় আর কোনও-কিছুর দেখা পাওয়া যায়নি।

তবে রোমান্সের একটা সন্দেহজনক ছায়া বোধ হয় বীরেনদা আর বিজয়ার মাথার উপরে দুলছে—যদিও সে ছায়াকে এখনও কায়া বলে ভ্রম হয় না।

বীরেনদাকে কোনও প্রশ্ন করলেই সে ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠে। আজকাল আবার বলতে শুরু করেছে যে, 'দ্যাখো, তোমরা যদি এমন ফাজলামি করো, তাহলে এবার আমি গায়ের জোরে তোমাদের মুখ বন্ধ করব!'

অমিয় বলে, 'বীরেনদা! ইংরেজরা বছরে বছরে এত লোককে ফাঁসি দিয়েও আর জেলখানায় পাঠিয়েও দুর্বল ভারতবাসীর মুখ গায়ের জোরে বন্ধ করতে পারেনি। গায়ের জোরে তুমিই বা কেমন করে আমাদের মুখ বন্ধ করবে?...সত্যি বীরেনদা, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না, তুমি কাকে ভালোবাসো?'

বীরেনদা রেগে তিনটে হয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কারুকে না, কারুকে না,—আমি ভালোবাসি খালি নিজেকে!'

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। মনে হচ্ছে, ওই সমুজ্জ্বল রত্ন-গোলকই যেন সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, নিখিল মানবের চিত্ত তাই নিত্য ওরই মধ্যে গিয়ে আলোকশয্যায় শুয়ে থাকতে আর অনন্ত আনন্দের স্বপ্ন রচনা করতে চায়।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর বিপুল সমারোহ ভরা সেই অসীম নীলজলের জগৎ গলিত হীরকস্রোতে পরিণত হচ্ছে।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর জ্যোৎস্না-নির্ঝরে আমাদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত রূপে অপরূপ হয়ে যাচ্ছে। এবং প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে চাইছে, মাটি-মায়ের উদার কোলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা যে বেঁচে আছি, আমরা যে খেলা করছি, এর চেয়ে বড়ো কথা কিছু নেই, আর কিছু নেই!

বালির নরম বিছানায় আমরা তিনজনে বসে আছি আর বিজয়া ছিল উপুড় হয়ে শুয়ে—দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহের উপরার্ধ তুলে!

অজানা দ্বীপের নাম-না-জানা পাখি নিজের ভাষায় কী গান গাইছিল এবং বাতাস করছিল তীরের সবুজ বনের সঙ্গে প্রেমালাপ।

বীরেনদার চোখের দৃষ্টি আজ অনন্ত সাগরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে!

বিজয়া খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বীরেনদার মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর পাতলা ফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট দু-খানি মধুর হাসিতে রঙিন করে তুলে বললে, 'বীরেন, কী ভাবচ ভাই?'

বীরেনদা চমকে মুখ ফেরালে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'দেশের কথা।'

—'কেন ভাই তোমরা খালি দেশের কথা ভাব? আমার কাছে থাকতে কি তোমাদের ভালো লাগে না?'

—'কেন ভালো লাগবে না বিজয়া! খুব ভালো লাগে। কিন্তু সোনার খাঁচায় বসে বনের পাখি মনের সুখে গান গাইলেও সে কি বনের স্মৃতি মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলতে পারে?'

বিজয়া আর কোনও জবাব দিলে না।

অমিয় আনমনে গুনগুন করে গাইতে লাগল—

আজ আকাশের রূপ-সায়রে
যায় ভেসে যায় আঁখি,
মনকে কে আজ দেয় পরিয়ে
রাঙা ফুলের রাখি!

কোন রূপসী দৃষ্টি-বীণায়
নীরব গানের ছন্দ শোনায়,
চিত্ত আমার নৃত্য করে
স্বপ্নপুলক মাখি!

তারার মালা পরবে বলে
ছুটল চাঁদের ঘুম,
বনের ছায়ায় উঠল বেজে
ঝিল্লির ঝুমঝুম!

শ্যামল ধরায় আলোয় আলো!
কে আজ আমায় বাসবে ভালো!

তাই তো আমি মনে মনে
নাম ধরে তার ডাকি!

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল! তারপর বিজয়া আবার বীরেনদাকে শুধোলে, 'আচ্ছা ভাই, আজ যদি এখানে হঠাৎ কোনও জাহাজ এসে পড়ে, তাহলে তোমরা কী করো?'

—'দেশে চলে যাই।'

—'আমাকে এখানে ফেলে?'

—'তোমাকে ফেলে যাব কেন? তোমাকেও নিয়ে যাব!'

বিজয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'বলেছি তো ভাই, দেশের দরজা আমার সামনে বন্ধ। সেখানে আপন বলতে আমার আর কেউ নেই!'

—'কেন, আমরা তো আছি বিজয়া! আমাদের কাছে তুমি থাকবে!'

—'তোমাদের সমাজ আর আমাকে চাইবে কেন? এই বুনোদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার যে জাত গিয়েছে।'

—'মানুষের জাত কখনও যায় না বিজয়া! মানুষ—'

বীরেনদার মুখের কথা মুখেই রইল—হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে একসঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা বন্দুক গর্জন করে উঠল!—তারপরেই অসংখ্য লোকের চিৎকার ও আর্তনাদ এবং তারপর আবার বন্দুকের পর বন্দুকের আওয়াজ!

আমরা সকলেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম!

বিজয়া ভয়ে আঁতকে বলে উঠল, 'ও কীসের গোলমাল? অত বন্দুক কে ছোড়ে?'

গ্রাম থেকে আমরা খানিক তফাতে এসেছি। সমুদ্রতীর আর গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচিলের মতন গাছের সারি। কিন্তু গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে দাউ-দাউ-দাউ আগুনের রক্তহাসি ফুটে উঠল আচম্বিতে। বেশ বোঝা গেল, গ্রামের ভিতরে একটা বিপুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। ...বন্দুকের শব্দ সমান চলছে—মানুষের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে!

বিজয়া বললে, 'গাঁয়ে আগুন লেগেছে! আমার প্রজারা কাঁদছে!' সে ছুটে গাঁয়ের দিকে যেতে গেল!

বীরেনদা এগিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'কোথা যাও? দাঁড়াও!'

বিজয়া আকুল স্বরে বললে, 'ছাড়ো বীরেন, হাত ছাড়ো। দেখছ না, আমার প্রজারা বিপদে পড়েছে? তোমরাও চলো!'

বীরেনদা মাথা নেড়ে বললে, 'তুমিও যাবে না, আমরাও যাব না। যেচে মরণের মুখে গিয়ে লাভ কী! বুঝছ না, বোম্বেটে চ্যাঙের দল জুজুর মন্দির আক্রমণ করেছে? ওরাই বন্দুক ছুড়ছে আর সকলের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু থেমে বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু উপায় কী? চ্যাং আমার নিরীহ প্রজাদের খুন করবে, আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? তা তো হয় না। তার চেয়ে আমি চ্যাঙের কাছে মিনতি করে বলিগে, 'একবার আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার প্রজাদের ক্ষমা করো।' সে আমার কথা শুনবে বোধ হয়।'

—'সে তোমার প্রজাদের ক্ষমা করবার জন্যে এতদূরে আসেনি বিজয়া! চ্যাংকে এখনও তুমি চেনোনি—মানুষের আকারে সে রাক্ষস। তার কাছে গেলে তুমি নিজেও বিপদে পড়বে!'

বিজয়া দৃপ্তকণ্ঠে বললে, 'তাহলে চলো, আমরাও তাকে বাধা দেব!'

বীরেনদা অনুশোচনার স্বরে বললে, 'তাকে বাধা দেবার উপায় থাকলে আমরাই কি এতক্ষণ এখানে থাকতুম? দেখছ না, আমরা বন্দুক আনিনি যে! এখন বন্দুক আনতে গেলেই বন্দি হব!'

বিজয়া হতাশ ভাবে বসে পড়ল। অগ্নিশিখায় তখন আকাশের একদিক লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু বন্দুকের শব্দ কমে এল। গোলমালও অনেকটা থেমে এসেছে—কেবল শোনা যেতে লাগল, কতকগুলো লোক চিৎকার করে কাঁদছে।

আমি বললুম, 'বিজয়া, তোমার সমস্ত প্রজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গিয়েছে। কাঁদছে খালি আহতেরা।'

অমিয় বললে, 'আঃ, হাত দু-খানা যে নিশপিশ করছে! বন্দুক না এনে কী বোকামিই করেছি, চিনে-বাঁদরগুলোকে দেখিয়ে দিতুম মজাটা!'

বীরেনদা বললে, 'ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। ...কিন্তু আমাদের পক্ষে আর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।'

বিজয়া বললে, 'চ্যাং ভাবছে জুজুর মন্দির লুট করে রাজার ঐশ্বর্য পাবে। কিন্তু তার সে আশায় আমি ছাই দিয়ে এসেছি!'

—'কী রকম?'

—'তোমাদের মুখে যখনই শুনলুম দলবল নিয়ে চ্যাং আবার এই দ্বীপে এসেছে, তখনই আমি সাবধান হয়েছি। জুজুর সমস্ত ধনরত্ন আমরা এক লুকনো জায়গায় পুঁতে রেখেছি—চ্যাং সারাজীবন ধরে খুঁজলেও তা পাবে না!'

বীরেনদা বললে, 'তাহলে চলো চলো, আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়! জুজুর মন্দির খালি দেখে চ্যাং এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে। এখানে থাকলে তুমি বিপদে পড়বে!'

অমিয় বললে, 'আর পালানো মিছে! ওই দ্যাখো, কারা এদিকে আসছে।'

সর্বনাশ! সত্যই তো, গাছের তলার পথ দিয়ে জন দশ-বারো লোক হন হন করে এগিয়ে আসছে—আমাদের দিকেই!

আমরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আগন্তুকদের সকলের আগে আগে আসছে কং হিং এবং তার পিছনেই বিপুলবপু চ্যাং,—সমুদ্রের প্রবল বাতাসে তার সেই লম্বা গোঁফ-জোড়া ফরফর করে দু-দিকে উড়ছে!

কং হিং তার সদাহাস্যময় মুখে আরও বেশি হাসি ফুটিয়ে বললে, 'আরে আরে, বীরুবাবু যে! আরে আরে, সরুবাবু—অমিবাবুও যে! তাহলে তোমরা বেঁচে-বর্তে মনের সুখে আছ? বেশ, বেশ! আমি ভেবেছিলুম এতদিনে তোমরা পাতালের ভূত হয়ে পেট ভরে জলপান করছ!'

বীরেনদা বললে, 'আমরাও ভেবেছিলুম তোমাদের ওই সুচেহারা এ জন্মে আর দেখতে পাব না। তাহলে মানোয়ারি জাহাজের গোলা তোমাদের হজম করতে পারেনি?'

—'না। বড়োজোর চণ্ডু কি গুলি খাওয়ার অভ্যাস আছে, ও গোলা-টোলা আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।....আরে, তোমাদের সঙ্গে ওটি কে? এই দ্বীপের রানি বুঝি? আমরা যে ওঁকেই খুঁজতে এখানে এসেছি—সেলাম, রানিসাহেবা!'

বীরেনদা বললে, 'কেন, রানির কাছে তোমাদের কী দরকার?

—'বিশেষ কিছুই নয়। ওঁর কাছে খালি জানতে এসেছি, জুজুর ধনরত্ন উনি কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন?'

বিজয়া সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তেজ-ভরা গলায় বললে, 'সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী?'

কং হিং খিল খিল করে হেসে বললে, 'দরকার একটু আছে বই কি!'

—'আমি বলব না।'

—'রানিসাহেবা, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলবেন। এই যে চ্যাং ভায়াকে দেখছেন, একে চেনেন তো? এর মেজাজ বড়ো ভালো নয়। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে আসুন, ধনরত্নের জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দিন। নইলে—'

—'নইলে?'

—'নইলে আমরা আদর করে আপনাকে ধরে নিয়ে যাব।'

—'আমি যাব না!'

চ্যাঙের দিকে ফিরে কং হিং মিনিটখানেক চিনে ভাষায় কী কথা কইলে।

চ্যাঙের কুৎসিত মুখের একটামাত্র চক্ষু দপ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল!—তাড়াতাড়ি সে বিজয়ার দিকে এগিয়ে এল।

কিন্তু বীরেনদাও তৈরি হয়ে ছিল—সে তখনই চ্যাং আর বিজয়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত শান্তভাবে বললে, 'আমাকে বধ না করে তুমি বিজয়ার গা ছুঁতে পারবে না!

কং হিং বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'ও কী বীরুবাবু, ও কী! আমাদের দলেরই লোক হয়ে তুমি সর্দারকে বাধা দিতে চাও?'

অমিয় খাপ্পা হয়ে বললে, 'কে তোমাদের দলের লোক? জোর করে আমাদের হাতে নীলগোলাপের ছাপ মেরে দিয়েছ বলেই কি ভাবছ, আমরা তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব?'

কং হিং হাসিমুখে বললে, 'তোমরা বিদ্রোহী হলেও আমাদের কিছু ভয় নেই। এইখানেই আমাদের দলের আরও কত লোক আছে, তা দেখছ তো? দরকার হলে আরও লোক আসবে। তার ওপরে তোমরা নিরস্ত্র। আমাদের সঙ্গে গোলমাল বাধালে বেশি সুবিধে করে উঠতে পারবে কি?'

বীরেনদা দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমাকে বধ না করে কেউ বিজয়ার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না!'

কাপড়ের ভিতর থেকে ফস করে একখানা চকচকে ছোরা বার করে বিজয়া বললে, 'আমাকে কেউ ছোঁবার আগে এই ছোরার কথা যেন ভুলে না যায়।' এই বলে সে ছোরাখানাকে বাগিয়ে ধরে এমনভাবে রুখে দাঁড়াল যে, তার সেই মহিমময়ী তেজস্বিনী মূর্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে মূর্তি যেন বাঙালির মেয়ে নয়,—বাংলা দেশের মানুষ হলে বিজয়া হয়তো এমন বুকের-রক্ত-তাতানো অপূর্ব মূর্তি ধারণ করতে পারত না! হ্যাঁ, এই বিজয়া সিংহবাহিনীরই জাত বটে!

অমিয় নিজের বিপদের কথা ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

তুমি বিজয়িনী নারী!
কখনও মধুর, কখনও ভীষণ—
তোমায় চিনিতে নারি!
নয়নে প্রলয়-মেলা,
মরণ খেলিছে খেলা,
ও-রূপ দেখিলে চরণের তলে
হাসিয়া মরিতে পারি!

কং হিংয়ের হাসি আরও মিষ্ট হয়ে উঠল। সে বললে, 'ছোকরা, তুমি গান থামাও। এখন গান শোনবার সময় নয়। ...বীরুবাবু, চ্যাং বলছে যে, তুমি দলের লোক বলেই সে এখনও সহ্য করে আছে, নইলে এতক্ষণে আছাড় মেরে তোমার দেহকে গুঁড়ো করে দিত!'

বীরেনদা সহজ ভাবেই বললে, 'বেশ তো, চ্যাং একবার সেই চেষ্টাই করে দেখুক না!'

—'বলো কী বীরুবাবু! তুমি কি শোনোনি, চ্যাঙের গায়ে জোর কত? চিনদেশে সে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ব্যক্তি—জীবনে সে কখনও কোনওদিন কারুর কাছে হারেনি!'

বীরেনদা হেসে বললে, 'জীবনে আমার সঙ্গেও চ্যাং কোনওদিন লড়াই করেনি।'

—'তাহলে মরো।' —বলেই কং হিং চিনে-কথায় চ্যাংকে কী বললে।

বোধ হয় বীরেনদা তার সঙ্গে লড়তে চায় শুনেই চ্যাং আকাশের দিকে মুখ তুলে বিশ্রী ঝাঁঝরা গলায় তীব্র অট্টহাস্য করতে লাগল—তেমন ভয়ানক হাসি আমি আর কখনও শুনিনি!

বীরেনদা ঠাস করে চ্যাঙের গালে এক চড় মেরে বললে, 'তোমার ওই বেসুরো হাসি আমার ভালো লাগছে না, শিগগির চুপ করো!'

চড় খেয়ে চ্যাঙের মুখের ভাব যে-রকম হল, দেখলেই বুকের কাছটা শিউরে ওঠে! তার সেই প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ যেন আরও উঁচু হয়ে উঠল এবং ভীষণ এক গর্জন করে সিংহের মতন সে বীরেনদার উপর লাফিয়ে পড়ল!

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে যেতে যেতে বীরেনদা দুম করে চ্যাঙের পাছায় এক লাথি বসিয়ে দিলে এবং টাল সামলাতে না পেরে চ্যাং তখনই দড়াম করে মাটির উপরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

চ্যাং-ও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে বীরেনদাকে! তারপরে সেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে গড়াতে গড়াতে খানিক দূর চলে গেল।

বিজয়া কৌতুকভরে বলে উঠল, 'বা বীরেন, চমৎকার, চমৎকার!'

তারপর সে যে বিষম মরণ-যুদ্ধ শুরু হল, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না! চ্যাঙের গায়ে যে এমন আশ্চর্য শক্তি, আমিও তা কল্পনা করিনি। এতক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু এখন আমার ভয় হতে লাগল, আজ বুঝি বীরেনদার মান ও প্রাণ দুইই একসঙ্গে নষ্ট হয়!

কখনও বীরেনদা চ্যাঙের উপরে, কখনও চ্যাং বীরেনদার উপরে এবং ধাক্কাধাক্কি ও আছড়া-আছড়ির সঙ্গে ঘুসি ও চড় সমান চলতে লাগল! বুঝলুম, চ্যাংও কুস্তি, যুযুৎসু ও বক্সিং জানে! তার উপরে তার দেহও বীরেনদার চেয়ে লম্বায়-চওড়ায় দুয়েই বড়ো। হয়তো বীরেনদার গায়ের জোর বেশি, এতক্ষণ ধরে তাই সে গুরুভার চ্যাঙের সঙ্গে যুঝতে পারছে! আর বীরেনদার বয়সও চ্যাঙের চেয়ে অনেক কম, তাই তার দমও বোধ হয় বেশি!

রক্তে দুজনের সারা অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে এবং দাপাদাপিতে সমুদ্রতটের বালিগুলো উড়ছে যেন দমকা ঝড়ের মুখে—আর ঘুসোঘুসি ও পরস্পরের গা-ঠোকাঠুকিতে শব্দ হচ্ছে যেন কাঠের উপরে কে খট খট করে কাঠ ঠুকছে!

অমিয় অশ্রান্তভাবে বলে চলছে—'এইবার বীরেনদা! মারো এক ধোবি প্যাঁচ! না, না,—কাঁচি মারো! চ্যাং কাঁধ নামিয়েছে—এইবেলা ওর চোয়ালে একটা নক-আউট ব্লো ঝাড়ো! সাবধান বীরেনদা, পিছিয়ে যেয়ো না—পিছনে একটা গর্ত! আর ভয় নেই বীরেনদা, চ্যাং খুব হাঁপাচ্ছে—তুমি ওকে দমে মেরে দেবে' প্রভৃতি।

বিজয়া বলছে, 'শাবাশ, বীরেন, শাবাশ! চ্যাং এইবারে ব্যাং হল বলে।'

ফিরে দেখলুম, চিনে-বোম্বেটেগুলো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লযুদ্ধ দেখছে, কিন্তু কং হিং দাঁড়িয়ে আছে পাথরের পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে এবং তার ঠোঁটে তখনও সেই সদাপ্রস্তুত হাসির লীলা!

এতক্ষণে আমার মনে আশা এল। সত্যি, চ্যাং বেজায় হাঁপাচ্ছে!

হঠাৎ চ্যাং আর্তনাদ করে উঠল! তার সেই একটামাত্র চোখের উপরে গিয়ে পড়ল বীরেনদার এক বজ্রমুষ্টি! ডান হাতে চোখটা চেপে ধরে সে তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরে গেল!

কিন্তু বীরেনদা তাকে ছাড়লে না, এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে সে উপরি উপরি আরও গোটাকয়েক ঘুসি বৃষ্টি করলে—অন্ধ চ্যাং প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে, তারপর শুয়ে পড়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিষম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে লাগল!

বীরেনদা মাতালের মতন টলতে টলতে ফিরে দাঁড়াল, হয়তো সে-ও পড়ে যেত—কিন্তু বিজয়া ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরলে!

কং হিং তিক্ত স্বরে হেসে উঠে চিনে ভাষায় চেঁচিয়ে কী বললে—সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন বোম্বেটের আট-দশটা বন্দুকের মুখ ফিরল আমাদেরই দিকে!

—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ হল এবং মনের ভিতর দিয়ে যেন মরণের একটা ঝড় বয়ে গেল!

—কিন্তু আমরা মরলুম না, মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল চার-পাঁচ জন চিনে-বোম্বেটেই!

বিস্মিতভাবে ফিরে দেখি, গাছের তলা থেকে পরে পরে মানোয়ারি গোরার দল বেরিয়ে, বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

আবার কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ! কং হিং আর বাকি বোম্বেটেগুলো হতাহত হয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল।

জাহাজি কাপ্তেনের পোশাক-পরা এক সাহেব ছুটে এসে বীরেনদার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে প্রশংসা-ভরা গলায় বললে, 'আমরা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি! তুমি বীর!'

বীরেনদা শ্রান্ত হয়ে বালির উপরে বসে পড়ে বললে, 'তোমরা আমাদের প্রাণ আর এই বীর-মহিলার মান বাঁচালে! ভগবান তোমাদের পাঠিয়েছেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! এখন এর বেশি আর কিছু বলবার শক্তি আমার নেই!'

সাহেব বললে, 'এই ভীষণ একচোখো বোম্বেটের জন্যে চিন-সমুদ্রে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকার এর দলকে দমন করার জন্যে এই মানোয়ারি জাহাজ পাঠিয়েছেন। আজ ক-দিন ধরে আমরা পিছনে পিছনে আছি, কিন্তু কিছুতেই এদের ধরতে পারিনি। আজও হয়তো এই হলদে শয়তানের বাচ্চারা আমাদের চোখে ধুলো দিত, কেবল তোমাদের জন্যেই আজ একে বন্দি করতে পারলুম। তোমরাও আমার ধন্যবাদ নাও।'

ওদিকে চ্যাং আর-একবার অনেক কষ্টে উঠে বসবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু একটু

উঠেই আবার বালির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কং হিং দুই হাতে ভর দিয়ে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উঠে বসল—তখনও তার সারা মুখ হাসছে আর হাসছে! তেমনি হাসতে-হাসতেই সে বললে, 'বীরুবাবু! তোমাদেরই জিৎ! তোমাদের বাঙালি জাতকে লোকে কাপুরুষ আর দুর্বল বলে কেন? তোমরা বীর, তোমরা মরণের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মতন হাসতে পারো, তোমরা দুর্দান্ত চ্যাং আর তার দলকে কুপোকাত করলে! মরবার সময়ে আমি তোমাদের নমস্কার করছি—নমস্কার, নমস্কার!'—বলেই দু-হাত জোড় করে কপালে ছুঁইয়ে সে আবার এলিয়ে পড়ে গেল—আর একটুও নড়ল না!

কং হিংয়ের রহস্যময় হাস্য এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না!

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

সব ভালো যার শেষ ভালো

আজ সকালের প্রথম সূর্যের আলোয় আকাশ আর পৃথিবী যখন অগাধ শান্তির হাসি হেসে উঠল, আমাদের নৌকাও তখন ডাঙা ছেড়ে সেই মানোয়ারি জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল—কিছু দিন আগে যার ভয়ে আমরা এই অজানা দ্বীপে পালিয়ে এসেছিলুম!

পালিয়ে এসেছিলুম তিনজনে, কিন্তু ফেরবার সময়ে দলে একজন লোক বাড়ল। বোধ হয় বলতে হবে না যে, সে বিজয়া।

আমরা ছাড়া মানোয়ারি জাহাজেও আরও লোক বাড়ল। তারা সেই বোম্বেটের দল—গোরাদের বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে তারা চলেছে আজ ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরবার জন্যে।

তারাও জুজুর ধনরত্ন পেলে না, আমরাও হাতে পেয়ে তা ছেড়ে দিলুম। কারণ বীরেনদা বললে, 'জুজুকে মানি আর না মানি, তিনি এই দ্বীপের দেবতা। এই দেবতার জন্যে বোম্বেটেদের হাতে অনেক সরল, নিরীহ অসভ্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাদের রানিকেও আমরা হরণ করে নিয়ে চলেছি, এখন বেচারিদের দেবতারও গয়না চুরি করলে আমাদের পক্ষে মহাপাপ হবে!'

আমরাও বীরেনদার কথায় সায় দিলুম।

জাহাজ ছাড়ল।

ডেকের উপরে রেলিং ধরে বিজয়া দাঁড়িয়ে আছে—ছবির মতন স্তব্ধ হয়ে।...

নীলাকাশের তলায় সেই সবুজ দ্বীপটি যখন ক্রমেই ছোটো হয়ে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে

গেল, তখন বিজয়ার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু!

বীরেনদা সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'বিজয়া, তুমি কাঁদছ!'

হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বিজয়া বললে, 'একদিন দেশ ছেড়ে এখানে এসে অনেক কেঁদেছিলুম। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বদেশ ছেড়ে আবার বিদেশের দিকে চলেছি।'

আমি বললুম, 'না বিজয়া, তুমি তো বিদেশে যাচ্ছ না! তোমার মনের স্বদেশ যে এখন ওই বীরেনদার বুকের ভিতরেই!'

অমিয় বললে, 'হায় রে হায়! এক যাত্রায় পৃথক ফল! বীরেনদা তো অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে নিজের কাজ দিব্যি গুছোলেন, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরটাকেও স্বদেশ বলে মনে করবার লোক তো পাওয়া গেল না! অদৃষ্ট!'

বিজয়া ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'কেন, তোমাদের হিংসে হচ্ছে নাকি? তাহলে আগে বললেই তো হত, আমার প্রজাদের ভিতরে কুমারী কন্যার অভাব ছিল না!'

অমিয় বললে, 'মন্দ কথা নয়! বীরেনদা দেখবেন রানির চাঁদমুখ, আর আমাদের দগ্ধ ভাগ্যে জুটবে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মতন দুঃস্বপ্ন! তোমার দয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিজয়া!'

বিজয়া বললে, 'কেন ভাই অমিয়। আমি তো চিরদিনই তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব! আমার মতো বন্ধুর প্রেম কি তোমাদের কাছে একেবারেই নগণ্য?'

আমি বললুম, 'বাপ রে, সে কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে পারি। তোমার চকচকে ছোরার কথা এখনও ভুলে যাইনি বন্ধু! তোমার প্রেম নগণ্য, এতবড়ো কথা বলবার মতন বুকের পাটা আমাদের নেই!'

অমিয় গাইলে—

বন্ধু! তোমায় বরণ করি!
কোন গগনের চাঁদ ছিলে ভাই,
পড়লে ধরার ধুলোয় ঝরি।

সাত-সাগরে দিয়ে পাড়ি
এসেছিলেম তোমার বাড়ি,
আর কি গো সই, তোমায় ছাড়ি,
রইব এখন চরণ ধরি—
বন্ধু! তোমায় আপন করি!

চক্ষে তোমার রূপের স্বপন,
বক্ষে আদর-নীড়,

কণ্ঠ তোমার ছন্দ-গানের
　　চলছে টেনে মীড়!

তোমার সাথে মেলা-মেশা,
এ যেন এক কীসের নেশা!
আমার যে ভাই প্রেমের পেশা,
　　তুমি যে ভাই প্রেমের পরি,—
　　বন্ধু! তোমায় প্রণাম করি!

মান্ধাতার মুল্লুকে

আজব জীব

প্রভাতি চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের তারিখের দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, 'ওহে বিমল, আজ সকালেই মি. রোলাঁর আসবার কথা, মনে আছে তো?'

বিমল বললে, 'হুঁ! কিন্তু দুনিয়ার এত লোক থাকতে আমাদেরই তিনি খুঁজে বার করলেন কেন, সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে আসল ব্যাপার তিনি ভাঙতে চাইলেন না, কিন্তু তাঁর কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময় বলে বোধ হল।'

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কুমার বললে, 'বেশ, অপেক্ষা করা যাক, মিঃ রোলাঁর আবির্ভাব হলেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বিমল যেন আপন মনেই বললে, 'রোলাঁ। নাম শুনে বোঝা যায়, ভদ্রলোক জাতে ফরাসি। আমরা তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কেমন করে?'

সিঁড়িতে হল পায়ের শব্দ। একাধিক ব্যক্তির পায়ের শব্দ। তার পরে ঘরের ভিতরে বিনয়বাবু ও কমলের আবির্ভাব।

যাঁরা 'মেঘদূতের মর্তে আগমন', 'ময়নামতীর মায়াকানন,' 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'নীলসায়রের অচিনপুরে' ও 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিনয়বাবু ও কমলের নতুন পরিচয় দেবার দরকার নেই। এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও চিন্তাশীলতায় বিনয়বাবু হচ্ছেন অদ্বিতীয়। লোকে তাঁকে মূর্তিমান সাইক্লোপিডিয়া বলে মনে করে। কমল তাঁর পালিত পুত্র। বিমল ও কুমারের বহু দুঃসাহসিক অভিযানে কমলকে নিয়ে তিনি হয়েছেন তাদের সহযাত্রী। দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছেন বিনয়বাবু এবং সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে কমল।

বিমল একটু বিস্মিত স্বরেই বললে, 'সকালবেলায় নিজের লাইব্রেরির কোণ ছেড়ে আমাদের কাছে আপনি! ব্যাপার কী বিনয়বাবু? এ যে মহম্মদের কাছে পর্বতের আগমন!'

বিনয়বাবু উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নতুন অভিযান, নতুন অভিযান!'

কুমার খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে বিনয়বাবু মুখের দিকে সমুৎসুক দৃষ্টিপাত করলে।

বিমল কৌতূহলী কণ্ঠে শুধোলে, 'নতুন অভিযান? কাদের অভিযান?'

—'আমাদের।'

এমন সময়ে বিনয়বাবুর গলা পেয়ে রামহরি প্রবেশ করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমল বললে, 'আরো চা-টা নিয়ে এসো রামহরি! বিনয়বাবু সুখবর এনেছেন।'

রামহরি হাসিমুখে বললে, 'কী সুখবর গো বাবু? আমাদের খোকাবাবুর জন্যে খুকিবিবি আনবেন নাকি?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা আবার নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।'

রামহরির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে বললে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অভিযান-টভিযানের মানে জানি না। তবে কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আবার বুঝি সবাই মিলে হাঘরের মতো দেশ-বিদেশে ছুটোছুটি করে বেড়াবে?'

বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'বোধ হয় তাই রামহরি, বোধ হয় তাই! বিনয়বাবু বোধ হয় আমাদের কোনও নতুন দেশ দেখাতে চান। তাই নয় কি বিনয়বাবু?'

—'প্রায় তাই বটে। অবশ্য তোমরা যদি রাজি হও।'

রামহরি বিরস কণ্ঠে বললে, 'ত্রিভুবনে পাতাল ছাড়া কোন দেশটা দেখতে তোমরা বাকি রেখেছ খোকাবাবু? তবে কি এবারে তোমরা পাতালের দিকে ছুটে যাবে?'

বিমল বললে, 'দেশের নামটা এখনও শুনিনি রামহরি! তবে নতুন অভিযানের কথা শুনেই আমার পা দুটো দৌড় মারবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ বিনয়বাবু, আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান?'

—'সে কথা যিনি বলবেন, তিনি এখনই এসে পড়বেন। আমি তাঁর অগ্রদূত মাত্র।'

কুমার ভুরু তুলে বললে, 'আপনি কি মি. রোলাঁর কথা বলছেন?'

—'ঠিক তাই।'

—'এইবারে বোঝা গেছে। তাহলে আপনার পরামর্শেই মি. রোলাঁ আমাদের এখানে আসতে চান?'

রামহরির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একরকম তাই বটে।'

রামহরি বিরক্ত স্বরে বললে, 'তাহলে এবারে খাল কেটে কুমির আনছেন আপনিই? হ্যাঁ গো বিনয়বাবু, বুড়োবয়সে কী ভীমরতিতে ধরল? সাধ করে নিজেও খেপতে আর পরকেও খ্যাপাতে চান? আসছেন আমাদের কোন সুমুন্দি, নিয়ে যেতে চান কোন যমের বাড়ি?'

কুমার বললে, 'আচ্ছা রামহরি, ফি বারেই আমরা তোমার কথা কানে তুলি না, তবু ফি বারেই আমরা কোথাও যাব শুনলেই তুমি এমন হলুস্থুলু বাধিয়ে মিথ্যে মুখ ব্যথা করো কেন বলো দেখি!'

—'তোমাদের ভালোর জন্যেই বাপু, তোমাদের ভালোর জন্যেই। মাথার ওপর দিয়ে বারে বারে যে সব ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই জন্যেই মুখ ব্যথা করে মরি, নিয়তিকে চিরদিন কি ফাঁকি দেওয়া যায়?'

কমল খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'তোমার যদি এতই প্রাণের ভয়, তাহলে তো আমাদের সঙ্গে না এলেও পারো।'

রামহরি এক ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'থামো, তোমাকে আর ফ্যাচ ফ্যাচ করতে হবে না! কালকের ফচকে ছোঁড়া, আমাকে এসেছেন উপদেশ দিতে! খোকাবাবুকে এতটুকু বয়েস

থেকে মানুষ করে তুলেছি, ও হচ্ছে আমার সন্তানের মতো। সন্তানকে যমের মুখে পাঠিয়ে কেউ যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে!'

বাড়ির ভিতর থেকে ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল।

বিমল বললে, 'ও রামহরি, তোমার আর এক সন্তান শান্তিভঙ্গ করতে চায় কেন?'

রামহরি বললে, 'কেন আর, খিদের চোটে। বাঘা দেখেছে তোমাদের জন্যে খাবার এনেছি, অথচ তাকে এখনও খুশি করা হয়নি।'

—'যাও যাও, বাঘাকে ঠান্ডা করে এসো।'

রামহরির প্রস্থান।

অল্পক্ষণ পরেই মি. রোলাঁ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। লম্বায়-চওড়ায় দশাসই চেহারা। চোখে চশমা, মুখে বিনয়বাবুর মতো দাড়িগোঁফ এবং বয়সেও তাঁর মতোই প্রৌঢ়, তবে দেহ এখনও যুবকের মতোই বলিষ্ঠ। ভদ্রলোকের শান্ত সৌম্য মুখ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমল ও কুমার তাঁকে সাদরে সোফার উপরে বসিয়ে আবার চা, টোস্ট ও ওমলেট প্রভৃতি আনবার জন্যে রামহরিকে আহ্বান করলে।

বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে রোলাঁ শুধোলেন, 'আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি আপনি এঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন?'

—'না, বিশেষ কিছুই বলিনি, সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছি মাত্র।'

বিমল সহাস্যে বললে, 'কিন্তু সেই ইঙ্গিতটুকুই হয়েছে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। মি. রোলাঁ, আপনি যদি আমাদের কোনও বিপজ্জনক অভিযানে যাত্রা করতে বলেন, তাহলে জানবেন আমরা বাইরে পা বাড়িয়েই আছি।'

রোলাঁ বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি যথাস্থানেই এসে পড়েছি।'

এমন সময় চায়ের ট্রে হাতে করে রামহরির পুনঃপ্রবেশ। ট্রে-খানা টেবিলের উপরে রেখে যাবার সময়ে সে রোলাঁর আপাদমস্তকের উপরে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে গেল।

রোলাঁ বললেন, 'গোড়ায় সংক্ষেপে নিজের কথা কিছু কিছু বলি শুনুন। আমার নিবাস ফ্রান্সে। পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদে কোনওদিন আমাকে জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে হয়নি। কিন্তু পায়ের উপরে পা দিয়ে নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা আমার ধাতে সয় না। আমার দুটি মাত্র শখ আছে—নানা দেশ দেখা আর নানা ভাষা শেখা। পৃথিবীর কত দেশেই যে বেড়িয়েছি—কখনও শহরে শহরে, কখনও জঙ্গলে জঙ্গলে, কখনও পাহাড়ে পাহাড়ে, মরুভূমিতে, নির্জন দ্বীপে। কখনও ভয় পেয়েছি, কখনও মোহিত হয়েছি, কখনও বিস্ময়ে অবাক মেনেছি। এই ভারতবর্ষও আমার পুরাতন বন্ধু, এবার নিয়ে, এখানে আমার তিন বার আসা হল। প্রথম বারে এসেছিলুম হিমালয়ের তুষারমানবদের দেখবার কৌতূহল নিয়ে, কিন্তু পদচিহ্ন ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় বার এসেছিলুম মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা দেখবার জন্যে, তাদের দেখে ভারতের প্রাচীন গৌরবের কথা ভেবে মন আমার শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবারে এখানে এসেছি স্বাধীন ভারতকে দেখবার জন্যে। কিন্তু

দেখছি দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হতে পারেনি।' রোলাঁ কিছুক্ষণ নীরবে চা পান করতে লাগলেন।

বিমল বললে, 'বললেন আপনার নানা ভাষা শেখবার শখ আছে। আমাদের বাংলা ভাষা বোধ হয় এখনও শেখেননি?'

রোলাঁ অত্যন্ত শুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'বিলক্ষণ! যে ভাষার মর্যাদা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সে ভাষা আবার শিখব না?'

বিমল বললে, 'কী আশ্চর্য, তবে আর আমরা ইংরেজিতে কথা কই কেন? ও-ভাষা তো আপনারও নয়, আমাদেরও নয়?'

রোলাঁ হাসতে হাসতে বললেন, 'বেশ, তবে আপনার মাতৃভাষাতেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি রোজ আপনাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে কিছু কিছু লেখাপড়া করি। সেইখানেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় বন্ধুত্বে। তাঁর মুখেই আপনাদের অদ্ভুত কীর্তিকাহিনি শুনি। তাই আজ আপনাদের কাছে এসেছি সাহায্য ভিক্ষা করতে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা কোন দিক দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

রোলাঁ বললেন, 'একটু মন দিয়ে শুনুন, কারণ এইবারে আসল কথা শুরু হবে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের কাছে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দেখা দেয় এক আজব জীব।'

—'আজব জীব?'

—'হ্যাঁ, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে উদ্ভটও বলতে পারেন।'

বিমলের মুখ দেখে বোধ হয়, সে যেন নিজের স্মৃতিসাগর মন্থন করছে মনে মনে। হঠাৎ সে উঠে পড়ে পুস্তকাধারের ভিতর থেকে একখানা রীতিমতো মোটা বই বার করলে। সেখানা হচ্ছে 'স্ক্র্যাপবুক'— খবরের কাগজ থেকে ছোটো-বড়ো নানা অংশ কেটে গঁদ দিয়ে তার মধ্যে জুড়ে রাখা হয়েছে।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থেমে বিমল বললে, '১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সাতাশে অক্টোবর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই খবরটি বেরিয়েছিল—'প্যারিস নগর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী মেলুন নামে গ্রামের বাসিন্দারা গত সপ্তাহকাল ধরে এক আজগুবি জীবের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। জীবটাকে দেখতে গরিলার মতো, তার গায়ে আছে রাঙা ওভারকোট এবং পায়ে আছে পাদুকা। ফরাসি সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, তাকে বন্দি করবার জন্যে খানাতল্লাশিকারীরা দলে দলে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছে। জীবটাকে সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে একদল শিশু, সে তখন অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুলতে দুলতে।' মি. রোলাঁ, আপনি কি এই ঘটনার কথা বলতে চান?'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ।'

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল বললে, 'খবরটা কৌতূহলোদ্দীপক বলেই আমি 'স্ক্র্যাপবুক'-এ তুলে রেখেছিলুম। কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যই কাগজে প্রকাশিত হয়নি। জীবটা কী? গরিলা? কিন্তু জামা-জুতো পরা গরিলার কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি।'

রোলাঁ মাথা নেড়ে বললেন, 'না, সে গরিলা নয়।'

—'তবে কি তাকে আপনি মানুষ বলে মনে করেন?'

—'মানুষ বলতে আমরা ঠিক যা বুঝি, সে তাও নয়।'

—'তার মানে?'

—'মানেটা ভালো করে বোঝাতে গেলে আমাকে সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে হবে—সেই যখন রোমশ ম্যামথ হাতি ও গন্ডার, খাঁড়াদেঁতো বাঘ, গুহাভল্লুক আর অতিকায় বৃষ প্রভৃতি জীবের দল পৃথিবীতে বিচরণ করত।'

—'সে সব কথা আমরাও কেতাবে কিছু কিছু পাঠ করেছি। খালি পশু নয়, তখন মানুষেরও অস্তিত্ব ছিল।'

—'আমি যখনকার কথা বলছি, তখনও 'হোমো সেপিয়েন' বা সত্যিকার মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। নৃবিদ্যাবিশারদরা সত্যিকার মানুষদের নাম দিয়েছেন—'ক্রো-ম্যাগ্নন'। আমি তাদের কথা বলছি না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাদের আগেকার যুগে ইউরোপে যে মানুষদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতদের কাছে তারা 'নিয়ানডার্থাল' মানুষ বলে পরিচিত। সত্যিকার মানুষদের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। তাদের চেহারা অনেকটা গরিলার মতো দেখতে হলেও তারা গুহায় বাস করত, আগুনের ব্যবহার জানত, চকমকি পাথরের হাতিয়ার প্রভৃতি তৈরি করতে পারত। আরও নানা জাতের তথাকথিত মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেমন জাভা দ্বীপের বানর-মানুষ, ইংল্যান্ডের পিল্টডাউন মানুষ, আফ্রিকার রোডেশিয়ান মানুষ! এরাও কেউ সত্যিকার মানুষের জ্ঞাতি নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ-সব হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগেকার কথা, আবার কোনও কোনও জাতের মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে আরো অনেক কাল আগে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে অন্তত দুই লক্ষ বৎসর আগেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষ যে কতকাল ধরে চেষ্টা করে আসছে, তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু মানুষ আজও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি।'

রোলাঁ বললেন, 'হয়তো তা পারবেও না। নিখুঁত হবার আগেই পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্যে মানুষ আজ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। মারাত্মক অ্যাটম বোমা তৈরি করেও সে খুশি নয়, তারও চেয়ে সাংঘাতিক হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে আজ ব্যস্ত হয়ে আছে।'

আলোচনাটা মোড় ফিরে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কুমার বললে, 'মি. রোলাঁ, পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষদের আবির্ভাব যখন হয়নি, আপনি তখনকার কথা বলতে যাচ্ছিলেন না?'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে একজাতীয় মানুষের খুলি আর দেহের হাড় পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতরা পরীক্ষা করে বলেছেন, ইউরোপে যখন নিয়ানডার্থাল মানুষরা বাস করত, খুব সম্ভব সেই সময়েই আফ্রিকায় বর্তমান ছিল এই রোডেশিয়ান মানুষরা। গরিলার সঙ্গে তাদের চেহারার মিল ছিল নিয়ানডার্থালদের চেয়ে বেশি। আজকাল পৃথিবীতে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জাতি বলে গণ্য হয় অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা। হয়তো সুদূর অতীতে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল সেই রকম রোডেশিয়ান মানুষরাই।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আধুনিক ফ্রান্সে যে গরিলার মতো জীবটাকে দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে এসব কথার সম্পর্ক কী?'

—'আমার মতে, ওই জীবটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর।'

—'আমরাও তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর! তা বলে আমাদের তো আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলা চলে না?'

—'তা চলে না। কিন্তু শুনুন। এই বিপুলা পৃথিবীতে আজও হয়তো এমন কোনও কোনও স্থান থাকতে পারে, প্রাচীন বা আধুনিক কোনও সভ্যতারই সংস্পর্শ না পেয়ে স্মরণাতীত কাল থেকেই যেখানকার মানুষের অগ্রগতি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ক্রমোন্নতির জন্যে কোনও চেষ্টাই নেই, বর্তমানকে নিয়েই যারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, তাদের 'বর্তমান'-ও আবদ্ধ হয়ে থাকে সুদূর অতীতের আবহের মধ্যেই। সুতরাং আজও কোনও কোনও অজানা দুর্গম প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ থাকা অসম্ভব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও কোনও মাছের অস্তিত্ব আজও লুপ্ত হয়নি। আমেরিকার প্যাট্যাগোনিয়া প্রদেশে কেউ কেউ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুও দেখেছে। তবে কোনও বিশেষ জাতের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই, এ কথা কি জোর করে বলা যায়?'

বিমল বললে, 'তর্কের অনুরোধে না হয় আপনার কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু ফ্রান্সে যে আজব জীবটা দেখা গেছে, সে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, আপনার এমন অনুমানের কারণ কী?'

রোলাঁ বললেন, 'এ আমার অনুমান নয়, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস।'

—'আপনার দৃঢ়বিশ্বাস?'

—'হ্যাঁ। কারণ তাকে আমি চিনি। সে আমার বাড়ি থেকেই পালিয়ে গিয়েছে।'

বিমল ও কুমার দুইজনেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'তাই নাকি?'

—'ঠিক তাই। সব কথা আগেই আমি বিনয়বাবুর কাছে বলেছি।'

বিমল সাগ্রহে বললে, 'আমরাও সে-সব কথা শুনতে চাই।'

চেয়ারের উপরে ভালো করে বসে রোলাঁ বললেন, 'সেই কথা বলবার জন্যেই আমি

আজ এখানে এসেছি। চায়ের প্রতি আমার অতিভক্তি আছে। আর এক পেয়ালা আনলেও আপত্তি করব না।'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'আমারও ওই মত। অষ্টপ্রহরের কোনও সময়েই চা আপত্তিকর পানীয় নয়। (সচিৎকারে) রামহরি, আবার চা!'

আবার চা এল। পিয়ালায় মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে রোলাঁ বলতে লাগলেন:

'১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমন্ত্রিত হয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলুম বেলজিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত মধ্য-আফ্রিকায়—অর্থাৎ কঙ্গো প্রদেশে। সে এক অদ্ভুত দেশ। সেখানে আছে পিগমি বা বামন জাতের মানুষ আর বামন হাতির দল। সেখানে বড়ো জাতের হাতিও আছে, আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বন্য মহিষ, চিতাবাঘ প্রভৃতি জন্তু। আমরা গিয়েছিলুম গরিলা শিকারে।

'নীলাভ জল নিয়ে যেখানে কিভু হ্রদ টলমল করছে, তারই তীরে আছে কিভুর নিবিড় অরণ্য। সেইখানে আকাশের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে মিকেনো পর্বত। সেখানকার ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতে গেলে দরকার হবে কবির ভাষা। আমি কবি নই, সুতরাং সে চেষ্টা করব না। যদি আবার আমরা কখনও সেখানে যাই, আপনারা সকলেই সমস্ত দেখতে পাবেন স্বচক্ষে। আপাতত সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা সেরে নিতে চাই।

'একদিন আমরা সদলবলে মিকেনো পর্বত থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ রাস্তার পাশে পাহাড়ে-বাঁশবনে জেগে উঠল হাতির ক্রুদ্ধ বৃংহিত, সেই সঙ্গে বিকট আর্তনাদ আর একটা ভারী দেহপতনের শব্দ।

সে অঞ্চলে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু এক রকম গাছ জন্মায়, স্থানীয় লোকরা যার নাম দিয়েছে 'মুসুঙ্গুলা' বা বুনো গোলাপ গাছ। সেই রকম একটা গাছের গুঁড়ির পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, একটা মত্ত হস্তি শুঁড় আস্ফালন করতে করতে আর বাঁশবন দোলাতে দোলাতে বেগে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। সেখানে আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

'কিন্তু আমরা সকলেই যে একটা ভয়াবহ, বিকট আর্তনাদ শুনেছি, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তখন গোধূলি কাল। বনের পাখিরা সব বাসায় ফিরে এসে মুখর কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করছে, একটু পরেই সন্ধ্যা এসে চারিদিকে তিমিরাঞ্চল উড়িয়ে সমস্ত দৃশ্য ঢেকে দেবে। তখনও আমরা পাহাড়ের প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে আছি, সন্ধ্যার আগে পৃথিবীর বুকে গিয়ে নামতে না পারলে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে বিপজ্জনক অপথে বিপথে কুপথে।

'কিন্তু চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে এখনই যে প্রচণ্ড আর্তনাদটা শ্রবণ করলুম, তা কি কোনও মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে? মানুষের কণ্ঠস্বর কি এমন ভাবে বুকের রক্ত হিম করে দিতে পারে?

'পায়ে পায়ে পথ ছেড়ে বনের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, 'কোথা যাও?'

—'কে অমন করে চেঁচিয়ে উঠল, একবার দেখা দরকার।'

—'না, কিছুই দেখবার দরকার নেই। আমাদের আগে এখন নীচে নামা দরকার। এ হচ্ছে আদিম কালের গভীর অরণ্য, মানুষের সভ্যতা এখনও এর অন্দরমহলে ঢুকতে পারেনি। ওখানে কত রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে, কিন্তু তা নিয়ে তুমি-আমি মাথা ঘামিয়ে মরব কেন?'

'আমি বললুম, 'বন্ধু, রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার ধর্ম। এখনই যে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদটা হল, তুমিও তো তা শুনেছ?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমার মতে ওটা হচ্ছে অমানুষিক আর্তনাদ।'

—'হতে পারে। তবু ওটা বোধ হয় কোনও জানোয়ারের চিৎকার নয়। আমি ওর মধ্যে পেয়েছি মানুষের ভাব।'

—'রোলাঁ, তুমি নির্বোধের মতো কথা বলছ। এই গহন বনে যারা বাস করে তারা জন্তুই হোক আর মানুষই হোক, তাদের জীবনের নীতি হচ্ছে একেবারেই স্বতন্ত্র। সকল রকম বিপদ-আপদের জন্যে সর্বদাই তারা প্রস্তুত থাকে, কারণ তাদের ন্যায়শাস্ত্র বলে—'হয় মরো, নয় মারো'! মারতে না পারলে বাঁচতে পারবে না, এই বিপজ্জনক নীতিই যেখানে সর্ববাদিসম্মত, সেখানে পরের ভালো-মন্দ নিয়ে আমরা ভেবে মরব কেন?'

'কিন্তু বন্ধুর যুক্তি আমার মনঃপুত হল না, আমি বললুম, 'এই দুর্গম অরণ্যে সত্য-সত্যই যদি কোনও মানুষ বিপদে পড়ে থাকে, তবে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তাকে সাহায্য করা। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।' এই বলে দুই হাতে ঝোপ সরিয়ে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর সেখানে গিয়ে দেখলুম সে কী দৃশ্য!

'এখানে যেখানে-সেখানে জন্মায় মস্ত মস্ত বিছুটির ঝোপ—স্থানীয় ভাষায় বিছুটিকে বলে, 'কাগারা'। সেই রকম একটা ঝোপের ভিতরে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে শরীরী দুঃস্বপ্নের মতো একটা আশ্চর্য মূর্তি।

'তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কম নয়, প্রকাণ্ড চওড়া বুক, কণ্ঠদেশ নেই বললেই হয়—যেন কাঁধের উপরেই আছে মুখমণ্ডল—আর সে মুখও দেখতে অনেকটা গরিলার মতো। সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা কালো রোম। সে যেন কতক মানুষ আর কতক গরিলার আদর্শে গড়া এক মূর্তি! তার দেহের ঠিক পাশেই রয়েছে একটা বর্শাদণ্ড—ফলক তার পাথরে গড়া!

'অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।'

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

রোলাঁর কাহিনি

'সেই অদ্ভুত, বিভীষণ মূর্তিটার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে, অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ।

'বিমলবাবু, কুমারবাবু, Anthropology, Biology আর Zoology কে আপনাদের

ভাষায় বলে নৃবিদ্যা, জীববিদ্যা আর প্রাণীবিদ্যা। সংসার-চিন্তা আর অর্থাভাব নেই, কাজেই সময় কাটাবার জন্যে শখের খাতিরেই ওই সব বিষয় নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া করতে ছাড়িনি।'

কুমার বললে, 'আপনি দেখছি আমাদের বিনয়বাবুর দলে।'

রোলাঁ হেসে বললেন, 'আপনাদের দেশের প্রবাদে বলে না—রতনেই রতন চেনে?' হয়তো সেইজন্যেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছে। কিন্তু থাক ও-কথা। খানিকক্ষণ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবার পর আন্দাজ করলুম, 'কাগারা' বিছুটির ঝোপের ভিতরে এই যে আশ্চর্য মূর্তিটা পড়ে আছে, রোডেশিয়ার ইতিহাস-পূর্ব যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে এর একটা দূর-সম্পর্ক থাকতেও পারে। আগেই বলেছি, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক শ্রেণির মানুষের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। আমরা এখন কঙ্গো প্রদেশের কিভু হ্রদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু এরই অনতিদূরে পাওয়া যায় সমুদ্রের মতো বিশাল টাঙ্গানিকা হ্রদ। তারই দক্ষিণ প্রান্তে আছে রোডেশিয়া প্রদেশ; সুতরাং স্মরণাতীত প্রাচীনকালে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের কোনও দল যে এ অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়েনি, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

'তারপর এই কঙ্গো হচ্ছে আফ্রিকার এক রহস্যময় প্রদেশ। আধুনিক সভ্যতা এখানকার অনেক রোম্যান্স নষ্ট করে দিলেও, এর বহু স্থলেই আজও তার পদচিহ্ন পড়েনি। পর্যটকদের মুখে সময়ে সময়ে যে-সব কাহিনি শোনা যায়, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। আপনারা কেউ ডবলিউ বাকলে সাহেবের 'Big Game Hunting in Central Africa' নামে পুস্তক পাঠ করেছেন?

'পড়েননি? বেশ, তাহলে আমার মুখ থেকে সংক্ষেপে দুটো কাহিনি শুনুন। বাকলে নিজেও হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারি, আর অন্যান্য শিকারিরাও তাঁর কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। একবার তিনি কঙ্গো প্রদেশের ম'বোমা নদীপথে নৌকাযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। এক জায়গায় গিয়ে শুনলেন, জলপথের সেই অংশটাকে স্থানীয় লোকেরা ভীষণ ভয় করে। সেখানে আছে নাকি এক অতিকায় জলদানব। যখন তার অভিরুচি হয়, সে এক গ্রাসে সমস্ত যাত্রীকে গিলে ফেলে—নৌকা-কে-নৌকা সুদ্ধ! তাই সেখান দিয়ে যাবার সময়ে নৌকার লোকেরা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়, কারণ গোলমাল হলেই জলদানব দারুণ খেপে যায়। কিন্তু মৃদুস্বরে গান গাইলে সে নাকি খুশি হয়! প্রত্যেক নৌকার মাঝি নদীর জলে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করে প্রণামি দিয়ে জলদানবের মেজাজ ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করে। এ গল্প সেখানকার ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষও বিশ্বাস করেন। আপাতত জলদানবকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কারণ ম'বোমা নদীর দিকে কেউ আমরা যেতে চাই না। কিন্তু এইবারে দ্বিতীয় যে গল্পটি বলব, সেটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

'বাকলে বলছেন, 'কঙ্গোর জঙ্গলে বেরিয়েছিলুম হাতিশিকারে একদিন। মদ্দা একটা

হাতির সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু হাতিটা বেজায় চালাক। লোকলস্করের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কখনও জঙ্গল ভেঙে, কখনও জলাভূমি পেরিয়ে হাতিটার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলুম, কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাগাল করতে পারলুম না। অবশেষে বেলা গড়িয়ে এল বিকালের দিকে।

'হাতিটা যে পথ ধরে গিয়েছে, হঠাৎ দেখি সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে কী একটা কালো রংয়ের জানোয়ার। ঘন জঙ্গলের ছায়ায় ভালো করে নজর চলছিল না, তাই প্রথমটায় মনে হল, সেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা হাতি। আরও কাছে এলে বোঝা গেল, সেটা অন্য কোনও জানোয়ার।

'ক্রমেই সে আরও কাছে এসে পড়ল। সে মাথা নামিয়ে হেঁটমুখে আসছিল। তারপর আমার কাছ থেকে হাতচারেক তফাতে এসেই টপ করে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম, কারণ দেখতে তাকে সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের মতো! কয়েক সেকেন্ড ধরে সে তাকিয়ে রইল আমার পানে। তারপর 'ওয়া!' বলে চেঁচিয়ে, কিছুমাত্র ভয়ের ভাব না দেখিয়ে আবার ফিরে গেল বনের দিকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম হতভম্বের মতো। নরহত্যার ভয়ে বন্দুক ছুড়তে হাত উঠল না।

'আমার সঙ্গে দেশীয় অনুচররা বললে, 'বায়ানা (কর্তা), ও হচ্ছে কামা মুনটু। মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের মতোই দেখতে।'

'আমি শিম্পাঞ্জি-গরিলা দেখেছি, এ কিন্তু দেখতে অন্য রকম—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজানা কোনও জীবের মতো। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলুম, এক সময়ে এখানকার অরণ্য থেকে বানরজাতীয় হিংস্র জীবরা বেরিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের আক্রমণ করত, তারপর তাদের বধ করে মৃত দেহগুলো নিয়ে বনের ভিতরে গিয়ে খেয়ে ফেলত।

'বানররা মাংসাশী হয় না, সুতরাং তারা যে বানর নয়, এটুকু সহজেই বোঝা যায়। তবে বাকলে যে জীবটা দেখেছিলেন, আসলে সেটা কী? আজ মিকেনো পাহাড়ের এই 'কাগারা' ঝোপের ভিতরে যে কিম্ভূতকিমাকার জীবটাকে দেখছি, এও কি সেই 'কামা মুনটু'দের নতুন কোনও নমুনা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবছি, হঠাৎ দূর থেকে বন্ধুর সাড়া পেলুম— 'রোলাঁ, রোলাঁ, সন্ধ্যার আর দেরি নেই। তুমি এখনও না এলে আমরা তোমাকে ফেলেই চলে যেতে বাধ্য হব।' আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'তোমরাও বনের ভিতরে এসে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে যাও!'

'বন্ধু সদলবলে 'কাগারা' ঝোপের কাছে এসে সচমকে বলে উঠলেন, 'কী এটা? গরিলা?' আমি বললুম, 'না, মানুষের এক আদি পুরুষ।' বন্ধু বললেন, 'ও বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

'এর পরেই আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলে আমাদের সঙ্গী 'আস্কারি' (দেশীয় সৈনিক বা পাহারাওয়ালা)-র দল। তারা মূর্তিটাকে দেখেই একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল—'কামা

মুনটু, কামা মুনটু!' অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে কেবল এইটুকু জানা গেল, কামা মুনটুরা এই অঞ্চলে বাস করে। তারা কিভুর জঙ্গলের ভিতরে কি মিকেনো পাহাড়ের উপরে থাকে, সে কথা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তাদের ঠিকানা জানবার জন্যে কারুর কোনোই আগ্রহ নেই, কারণ তারা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির, স্থানীয় বাসিন্দাদের দেখলেই মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

'বন্ধু বললেন, 'জানোয়ারটা দেখছি অত্যন্ত জখম হয়েছে বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এর এমন দশা কে করলে?' আমি বললুম, 'খুব সম্ভব কোনও পাগলা হাতি। এখানে বাঁশের (এদেশি ভাষায় 'মিগ্যানো') বনে কচি কচি পাতা খাবার লোভে পাহাড়ের উপরে উঠে আসে দলে দলে হাতি।' বন্ধু বললেন, 'চুলোয় যাক যত বাজে কথা। এখন তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে পড়বে চলো, নইলে অন্ধকারে অন্ধ হতে হবে।' আমি বললুম, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই মূর্তিটাকেও নিয়ে যেতে চাই।' বন্ধু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী? এই মূর্তিটা নিয়ে আমাদের কী লাভ হবে?' আমি বললুম, 'তোমাদের নয়, লাভ হবে কেবল আমারই। আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরিধি আরও একটু বাড়াতে চাই।' কিন্তু বন্ধু অত্যন্ত নারাজ, আমিও একেবারেই নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, আপাতত আহত ও অচৈতন্য মূর্তিটাকে নিয়ে আমরা এক সঙ্গেই ক্যাম্পে ফিরে যাব বটে, কিন্তু তারপরেই হবে আমাদের ছাড়াছাড়ি। যদিও তথাকথিত আদিম মানুষটার জন্যে আমাকে বন্ধু ত্যাগ করতে হল, তবু প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্য আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, বন্ধুকে হারিয়েও আমি কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করলুম না।

'আর এক কারণে জাগ্রত হয়েছিল আমার বিশেষ কৌতূহল। মূর্তিটার কণ্ঠদেশে শুকনো চামড়ার বন্ধনীতে সংযুক্ত ছিল একটা জিনিস, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে একখণ্ড কাচ বলেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু আসলে তা হচ্ছে মস্ত একখণ্ড হীরক! খনির ভিতরে এমনি আকাটা হিরা পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি নামক স্থানে বেড়াতে গিয়ে এই অকর্তিত খনিজ হিরা আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি, সুতরাং আমার ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল না। হিরাখানা আকারে মস্ত, এমন অসাধারণ রত্ন যে অত্যন্ত মূল্যবান, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন দুর্লভ জিনিস এই অসভ্য বন্য জীবটার দখলে এল কেমন করে? তবে কি তাদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও হিরার খনির অস্তিত্ব আছে? কিন্তু বন্ধুর আবির্ভাবে এ সব কথা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার সময় আমি পাইনি। বলা বাহুল্য, অন্য কেউ দেখতে পাবার আগেই হিরাখানা আমি নিজের পকেটের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছিলুম।

'তারপরের কথা সবিস্তারে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সুতরাং মোদ্দা কথা আমি খুব সংক্ষেপেই বলতে চাই। আমার 'আদিম মানুষ'কে নিয়ে আমি উগাণ্ডা প্রদেশের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া হ্রদের কাছে গিয়ে পড়লুম। স্থলপথে বেশি দূর যাত্রা করলে পাছে যার-তার কাছে গিয়ে প্রচুর জবাবদিহি করতে হয়, সেই ভয়ে আমি অবলম্বন করলুম জলপথ। নিজস্ব নৌকায় নীলনদ দিয়ে যাত্রা করলুম আবার সভ্যজগতের দিকে।

'এই জাতের আদিম মানুষকে এখানকার লোকে 'কামা মুনটু' বলে ডাকে। আমি সংক্ষেপে তার নাম রাখলুম, মুনটু। কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তার স্বরূপ লুকোবার জন্যে আমাকে কম বেগ পেতে হয়নি। তবে সে অত্যন্ত আহত ছিল বলে আমি সেই সুবিধা গ্রহণ করতে ছাড়লুম না। সব চেয়ে বীভৎস ছিল তার মুখখানা, তা একেবারেই অমানুষিক। কেবল চোখদুটো ছাড়া তার মুখমণ্ডলের সবটাই আমি ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখলুম। প্রথম দশ দিনের ভিতরে মুনটুর জ্ঞান ফিরে আসেনি; কিন্তু চেতনা লাভ করবার পরেই আমাকে দেখে তার দুই চক্ষের মধ্যে যে ভয়াল জিঘাংসু দৃষ্টি ফুটে উঠল, তা অবর্ণনীয় বলা চলে। তৎক্ষণাৎ সে তার মুখের ও দেহের ব্যান্ডেজ খুলে ছিন্নভিন্ন করে ফেললে। আমরা বাধ্য হয়েই কয়জনে মিলে তার হাতে পরিয়ে দিলুম হাতকড়ি। কিন্তু এমনি তার আসুরিক শক্তি যে, সেই আহত, পঙ্গু অবস্থাতেও সে হাতকড়ি ভেঙে ফেললে অবলীলাক্রমে। তখন শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে রাখতে হল।

'ফ্রান্সে ফিরে তাকে মেলুন গ্রামে নিজের বাগানবাড়িতে এনে রাখলুম। এবং তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলুম নিজেই। মুনটুর দেহের তিনখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিল, মাথাতেও সে বিষম চোট খেয়েছিল। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ হলে নিশ্চয়ই সে বাঁচত না, কিন্তু মুনটুর অসাধারণ শক্তিশালী দেহ ও বন্য স্বাস্থ্যই তাকে খুব তাড়াতাড়ি আবার আরোগ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। কিছুকালের মধ্যেই সে আবার শক্তসমর্থ হয়ে উঠল।

'বনের ভিতরে তার দেহ ছিল প্রায় উলঙ্গ, কেবল তার কোমরে লম্বমান ছিল এক টুকরো চামড়ার আচ্ছাদন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ভিতরে তো তাকে সেই অবস্থায় রাখা চলে না, তাই আমরা জোরজার করে তাকে পরিয়ে দিয়েছিলুম জামা, ইজের, জুতো।

'মুনটু যখন বুঝলে আমাদের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তখন সে দায়ে পড়ে আর কোনও বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। কিন্তু সর্বক্ষণই সে মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকত, তাকে কথা কওয়াবার কোনও চেষ্টাই আমাদের সফল হয়নি, এমনকি সে উচ্চারণ করেনি একটা টুঁ-শব্দও। অবাক হয়ে ভাবতুম, সে কি বোবা, না তার কোনও ভাষা নেই?

'বনের দুর্দান্ত সিংহও অবশেষে মানুষের পোষ মানতে বাধ্য হয়। আমিও ভাবলুম, এতদিনে নিশ্চয় মুনটুর আক্কেল হয়েছে। প্রথমে তার পায়ের, তারপর তার হাতের বাঁধন খুলে দিলুম। বন্ধনমুক্ত হয়েও সে কোনওরকম বেচাল করলে না, গুম হয়ে চুপ করে বসে রইল, সে খুশি হয়েছে কি না তাও বোঝা গেল না।

'কিন্তু পরদিন প্রভাতেই আবিষ্কার করলুম, গত রাত্রে জানালা ভেঙে মুনটু দিয়েছে চম্পট। তারপর খবরের কাগজে পলাতক মুনটুর কাহিনি প্রকাশিত হতে লাগল। আপনারা এদেশে বসেও তার খবর পেয়েছেন। ফ্রান্সের নানা জায়গায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হল—জামা, ইজের, জুতো পরা গরিলার মতো ভয়াবহ জন্তু, এ আবার কী ব্যাপার! আমি কিন্তু সাত-পাঁচ কিছুই ভাঙলুম না। মুনটুর শেষ দেখা পাওয়া যায় ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে আল্পস গিরিমালার ব্ল্যাঙ্ক পাহাড়ের কাছে। তারপর থেকেই সে একেবারে নিরুদ্দেশ।'

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

রামহরির আশা

রোলাঁর কাহিনি শুনে সকলেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ভুত মানুষ নয়, এই কাহিনির মধ্যে ছিল আরও এমন সব বিচিত্র কথা এবং অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত, যা মনকে অভিভূত না করে পারে না।

দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে রামহরিও গল্প শুনতে ছাড়েনি। তার আগ্রহ হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। বিমল ও কুমারের চড়ুকে পিঠ যে কত সহজে সড়সড় করে ওঠে, এটা তার কাছে মোটেই অজানা ছিল না। কে একটা উটকো সাহেব কোথা থেকে হঠাৎ এসে আবার যখন তাদের খেপিয়ে তুলতে চায়, তখন এই খ্যাপামির দৌড় কত দূর, সেটা জানবার জন্যে তার কৌতূহল জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক।

রোলাঁর কাহিনির কতক কতক সে বুঝতে পারলে বটে, আবার তার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেল অনেক কথাই। কিন্তু একটা কারণে তারও উৎসাহ জেগে উঠতে বিলম্ব হল না।

রোলাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে সাগ্রহে বলে উঠল, 'ও সায়েব, তুমি কী বললে? সেই বনমানুষটার হাতে ছিল মস্ত একখানা হিরে?'

তার রকম-সকম দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ।'

—'এ যে অবাক কথা বাপু! হিরে থাকে তো হিরের খনিতে, জহুরির দোকানে আর রাজা-রাজড়ার লোহার সিন্দুকে! বনমানুষ আবার হিরে পেলে কোত্থেকে?'

রোলাঁ বললেন, 'আমরা যে জায়গায় গিয়েছিলুম, নিশ্চয়ই তার কাছাকাছি কোথাও হিরার খনি আছে।'

কমল বললে, 'আপনি যে জীবটার কথা বললেন, তাকে দেখলেই নাকি গরিলা বলে মনে হয়! এমন কোনও জীব কি হিরার খোঁজে খনি কাটতে পারে?'

রোলাঁ শুধোলেন, 'আপনি হিরার খনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'যে-অঞ্চলে হিরার খনি আছে, সেখানে খনির বাইরেও এখানে-ওখানে হিরা কুড়িয়ে পাওয়া যায়।'

—'ব্যাপারটা বুঝলুম না।'

—'শুনুন। হীরকের জন্যে আগে প্রাচ্যদেশ—বিশেষ করে আপনাদের ভারতবর্ষই ছিল বিখ্যাত। গোলকুণ্ডায় এখন বোধ হয় হিরা পাওয়া যায় না, কিন্তু আগে দুনিয়ার সবাই গোলকুণ্ডা বললেই বুঝত হীরকের দেশ। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যের এই গৌরব অটুট ছিল। তারপর পৃথিবীর আরও নানা দেশে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। আজকাল তো দক্ষিণ আফ্রিকা হীরকের ব্যবসায় প্রায় একচেটে করে ফেলেছে। সেখানে অনেক সময়ে হীরক আবিষ্কার করবার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয় না, কখনও কখনও কাঁকরের সঙ্গে এখানে-

ওখানে এমন হীরকও কুড়িয়ে পাওয়া যায়, যা সত্য-সত্যই সাত রাজার ধন মানিকের মতো মূল্যবান। আমার কী বিশ্বাস জানেন? ওই রকম কোনও হীরকের খনির কাছেই আছে মান্ধাতার মানুষদের আধুনিক বসতি। খুব সম্ভব তারা হীরকের খনির কোনও ধারই ধারে না, হীরক যে দুর্লভ রত্ন এ খবরও রাখে না, কেবল তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এইটুকুই অনুমান করতে পেরেছে যে, এ হচ্ছে কোনও অসামান্য স্ফটিক, একে অলঙ্কারের মতন অঙ্গে ধারণ করা উচিত।'

কুমার বললে, 'আপনি যে হিরাখানা পেয়েছেন তার ওজন কত?'

—'একশো ক্যারেট।'

—'তার কত দাম হতে পারে?'

—'বলেছি তো, সেখানা হচ্ছে আকাটা হিরা, আদিম অসভ্য মানুষরা হিরা কাটবার আর্ট জানে না। ঠিক ভাবে কাটতে পারলে তার রং, রূপ, চাকচিক্য আর দাম যথেষ্ট বেড়ে যাবে বলেই মনে করি। তবে বর্তমান অবস্থাতেই একজন পাকা জহুরি সেখানা আমার কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

রামহরি দুই চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে বললে, 'বলো কী সায়েব, তোমার ওই মান্ধাতার মুল্লুকে গেলে আমাদের কি পদে পদে হিরেমানিক মাড়িয়ে চলতে হবে!'

রোলাঁ হেসে উঠে বললেন, 'হিরা-মানিক পথের ধুলো নয় বন্ধু, তা এত সস্তা ভেব না। দু-এক খানা মহার্ঘ স্ফটিক আমরাও হয়তো কুড়িয়ে পেতে পারি, কিন্তু সে হচ্ছে দৈবাতের ব্যাপার। আসল খনি আবিষ্কার করতে গেলে প্রচুর কাঠ-খড় না পোড়ালে চলে না।'

এতক্ষণ পরে বিমল মুখ খুলে বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, তাহলে আপনার এই নতুন অভিযানের আসল উদ্দেশ্য কী? আপনি কি ধনকুবের হবার জন্যে হিরার খনি আবিষ্কার করতে চান?'

কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে রোলাঁ বললেন, 'হঠাৎ আপনি এমন প্রশ্ন করলেন কেন?'

বিমল বললে, 'ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রত্ন-শিকার', আমার আর কুমারের পক্ষে সেটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ভগবান আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়েছেন, তাকে আরও অসামান্য করে তোলবার জন্যে আমরা আর পৃথিবীময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে রাজি নই। রাশি রাশি হীরকের মোহে আপনি যদি মুগ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের আশা ছেড়ে দিয়ে আপনাকে একলাই যাত্রা করতে হবে, কারণ লক্ষ্মীলাভের লোভে আমরা আর সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে পারব না।'

রোলাঁ বললেন, 'না, না বিমলবাবু, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। এই বিংশ শতাব্দীতেও মান্ধাতার মানুষদের জীবনযাত্রা দেখবার সুযোগ পাওয়া যে অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা, এটা আর ফলাও করে না বললেও চলবে। তাই দেখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আর বিনয়বাবুও আমার পক্ষে। আপনারাও আমাদের সহযাত্রী হবেন, সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। যদি হিরার খনির লোভই আমাকে পেয়ে বসত, তাহলে প্রথম বারেই আমি সে চেষ্টা করতে ছাড়তুম না। তবে ওই হীরকঘটিত ব্যাপারটা যে এই

অভিযানের আনুষঙ্গিক আকর্ষণ, এ কথা অস্বীকার করবার চেষ্টা আমি করব না।'

কুমার বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, আপনার ওই মান্ধাতার মানুষ ফরাসি দেশে আত্মপ্রকাশ করে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার গুপ্তকথা জানবার জন্যে ফরাসি পুলিশও কোনও পাথর ওলটাতে বাকি রাখেনি। হয়তো অনেক কথাই তারা জানতে পেরেছে—এমনকি ওই একশো ক্যারেট হীরকের কথাও।'

মস্তকান্দোলন করে রোলাঁ বললেন, 'না, কেউ কিছু জানতে পারলে এত দিনে আমিও সেটা জানতে পারতুম। পেটের কথা আমি ঘুণাক্ষরেও কারুর কাছে প্রকাশ করিনি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'মান্ধাতার মানুষের কথা প্রকাশ করলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হত না। তা নিয়ে আমাদের মতন দুই-এক জন পাগল ছাড়া আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইবে না। কিন্তু গোল বাধবার সম্ভাবনা ওই হিরার খনি সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে। অর্থলোভ হচ্ছে সবচেয়ে প্রবল লোভ।'

রোলাঁ বললেন, 'তার গুপ্তকথাও আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

—'কিন্তু আমি বরাবরই দেখে আসছি, ও-সব কথা লুকিয়ে রাখা যায় না। মঁসিয়ে রোলাঁ, আপনি বললেন না, হিরাখানার জন্যে একজন জহুরি দেড় লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল?'

—'হ্যাঁ। হিরাখানা কোন জাতের তা পরীক্ষা করবার জন্যে আমি তার কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম।'

—'তাহলেই বুঝুন, আর একজন বাইরের লোকও আপনার হিরার কথা জানে।'

—'কিন্তু ওই পর্যন্ত! হিরার ঠিকানা বা কার কাছ থেকে তা পেয়েছি, এসব কিছুই সে জানে না।'

—'কিন্তু আপনার মতো অব্যবসায়ীর কাছে এত দামি একখানা আকাটা হিরা দেখে সহজেই কি তার কৌতূহল জাগ্রত হবে না?'

—'জাগ্রত হলেই বা ক্ষতি কীসের?'

বিমল বললে, 'ক্ষতি কীসের, শুনুন। তাহলে তার মুখে আরও কোনও কোনও লোক এ কথা শুনতে পেয়ে ওই হিরাখানা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।'

—'মাথা ঘামালেও আমি কেয়ার করব না। কারণ, আমাদের এই অভিযান তো হিরার খনি আবিষ্কার করবার জন্যে নয়!'

কুমার বললে, 'তা নয় বটে, তবু উদোর বিপদ যে বুধোর ঘাড়ে এসে পড়বে না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না।'

—'কিন্তু বিপদের কথা কী বলছেন? একটা কথা সত্য বটে, এ রকম অভিযান সর্বদাই বিপজ্জনক—আমরা যাচ্ছি পদে পদে বিপদের দেশে। এর জন্যে আমরাও অপ্রস্তুত নই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনা তো আমি দেখছি না!'

বিমল বললে, 'দেখছেন না? যদি ভাসা ভাসা খবর পেয়ে একদল রত্নসন্ধানী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে?'

—'আমাদের উদ্দেশ্য তাদের বুঝিয়ে দেব।'

—'যদি তারা আমাদের কথায় তত সহজে বিশ্বাস না করে?'

—'তাহলে তাদের আমি সোজা জাহান্নমে যেতে বলব।'

—'বেশ, তাই বলবেন! ফলেন পরিচীয়তে। এখন কোন পথে, কোন দিক দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে তাই বলুন দেখি।'

—'প্রথমে সমুদ্রপথ। সরাসরি উঠব গিয়ে আফ্রিকার কেনিয়া কলোনির মোম্বাসা বন্দরে। সেখান থেকে রেলপথে নাইরোবি শহরে। তারপর উগান্ডা প্রদেশের ভিতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থান কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে। এই হল মোটামুটি পথের বিবরণ।'

বিমল বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, কঙ্গোর গহন বনে প্রবেশ করতে হলে আমাদের তো রীতিমতো তোড়জোড় করতে হবে।'

—'তা তো হবেই।'

—'যথা—'

—'সেজন্যে আপনাদের কোনও চিন্তাই করতে হবে না, আপনাদের ব্যবস্থাপক হব আমি নিজেই। আপনাদের পেলেই আমি আর কিছু চাই না।'

—'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে রোলাঁ, আফ্রিকায় আমরাও এই প্রথম যাচ্ছি না, ওখানকার পথ-ঘাট আছে আমাদের নখদর্পণে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, এরকম অভিযানের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের দরকার হয়।'

—'কিছু ভাববেন না, সমস্ত অর্থ ব্যয়ের ভার গ্রহণ করব আমিই।'

—'ক্ষমা করবেন মহাশয়, ওইখানেই আমার আপত্তি।'

—'আপনি কী করতে চান?'

—'খরচের অর্ধেক দায় আমাদেরও।'

—'উত্তম, আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।'

—'ধন্যবাদ! তাহলে পরের দৃশ্য আমাদের অভিনয় শুরু হবে একেবারে আফ্রিকার বুকে।'

রামহরি বললে, 'চুলোয় যাক তোমাদের মান্ধাতার মানুষ! ও সব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা খারাপ করতে রাজি নই, আমি দেখব খালি হিরের খনি! এক কোঁচড় হিরে পেলেই আমাদের চলবে, কী বলিস রে বাঘা?'

বাঘা কুকুর কী বুঝলে জানি না, সে বললে, 'ঘেউ, ঘেউ ঘেউ।'

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

দুঃসংবাদ

আরবদের একটি প্রবাদ: 'নীল নদের জল একবার যে পান করেছে, আবার তা পান করবার জন্যে তাকে প্রত্যাগমন করতে হবেই।'

প্রবাদটা হয়তো অমূলক নয়। কারণ এবার নিয়ে এ অঞ্চলে বিমল ও কুমারের আসা

হল বার বার—তিন বার। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ভ্রমণকাহিনি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'আবার যকের ধন' ও 'রত্নপুরের যাত্রী' উপন্যাসে।

দ্বীপনগরী মোম্বাসা—আগে ছিল (১৮৮৭-১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে) ইংরেজ-অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী। বয়স তার প্রাচীন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দেও বিখ্যাত আরব ভ্রমণকারী ইবন বতুতা তাকে একটি বৃহৎ জনপদ বলে বর্ণনা করেছেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দেও পর্তুগিজ নৌ-বীর ভাস্কো-ডি-গামা এখানে এসে ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখে গিয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে জলপথে পূর্ব আফ্রিকায় আসতে গেলে আজও প্রথমে এসে নামতে হয় মোম্বাসার কিলিন্দিনি বন্দরে।

মোম্বাসাকে নিয়ে আরব ও পর্তুগিজের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গিয়েছে—কখনও জিতেছে আরবরা, কখনও পর্তুগিজরা। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা এখানে যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল, আজও তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু এখন আর তা আরব বা পর্তুগিজ কারুর ভোগেই লাগে না। মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সর্বগ্রাসী ইংরেজরা, সেখানে আছে তাদের সামরিক রসদের ভাণ্ডার এবং কয়েদখানা। এই প্রাচীন দুর্গটির অবস্থান সুন্দর, চল্লিশ ফুট উঁচু প্রবালশৈলের উপরে দাঁড়িয়ে সে কাটিয়ে দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং তার সুমুখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে যায় সুনীল ভারতসাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গমালা।

বন্দর থেকে বিমল, কুমার, রোলাঁ, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি প্রমুখ নিয়ে রিকশাগুলো ছুটতে লাগল হোটেলের দিকে এবং আরোহীদের কৌতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে রইল রাজপথের দৃশ্যের দিকে।

আফ্রিকাকে আগে সকলে মনে করত রহস্যময় দেশ, কিন্তু তার পূর্ব প্রান্তরে সমুদ্র-তীরবর্তী নগরগুলো এখন যেন হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। রাজপথ দিয়ে ছুটছে রিকশা, মোটর, ট্যাক্সি ও লরি এবং তাদের আরোহীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হরেক-রকম পোশাক পরা নানান দেশের নানান জাতের লোক। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, কালো-কুচকুচে 'সোয়াহিলি' বা স্থানীয় বাসিন্দা, অপেক্ষাকৃত অল্প-কালো আরব এবং সাধারণত শ্যামবর্ণ ভারতীয়।

বহু ভারতবাসী এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। রাজপথের নানা স্থানে দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক—হিন্দু, মুসলমান, পার্সি। দিকে দিকে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কত মন্দির ও মসজিদ এবং তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, ভারতবাসীর সংখ্যা এখানে নগণ্য নয়। এমনকি, এখানে ভারতীয় বাজারেরও অভাব নেই।

একটি বিখ্যাত চলতি কথা আছে: 'কোনও ভৃত্যের কাছেই তার প্রভু বীর বলে গণ্য হয় না।' বলা বাহুল্য, এ কথা খাটে কেবল মনুষ্য সমাজেই।

কিন্তু কুকুররা হচ্ছে প্রভুগত প্রাণ। প্রভুই তাদের দেবতা। কাজেই বিদেশে এসে বাঘা তার প্রভুর সঙ্গ ছাড়তে রাজি হয়নি, কুমারের পিছনে-পিছনেই রিকশায় এসে উঠেছে। ভালো করে আঘ্রাণ নিয়েই সে বুঝতে পেরেছে এ দেশ তার কাছে মোটেই নতুন নয়—এখানে বাতাসে বাতাসে মিশিয়ে আছে পুরাতন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ! তার মনের ভিতরে জেগে উঠল বোধ করি নতুন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, কারণ লাঙ্গুল-পতাকা উত্তোলন

করে উদগ্র উৎসাহে সে চিৎকার করতে লাগল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কমল হচ্ছে দলের মধ্যে সকলের ছোটো। সে এর আগে আর কখনও আফ্রিকায় আসেনি বটে, কিন্তু পর্যটকদের পুস্তকে এখানকার বহু রোমাঞ্চকর কাহিনি পাঠ করেছে। তার কাছে আফ্রিকা হচ্ছে এক বিচিত্র রোমান্সের দেশ—যেখানে দিকে দিকে শোনা যায় সিংহ, গন্ডার, হাতি, হিপো আর গরিলার গর্জন, যেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে বাজতে থাকে জুলু, হটেন্টট ও মাসাই প্রভৃতি অসভ্য যোদ্ধাদের রণ-দামামা, যেখানে পথে-বিপথে পদে পদে অতর্কিতে হয় ভয়াবহ বিপদের আবির্ভাব!

কাজেই এখানে এসেও সে সেই নিত্যপরিচিত নাগরিক দৃশ্য এবং একান্ত-সাধারণ, পোষ-মানা মনুষ্য-জাতীয় জীবদের একঘেয়ে জনতা দেখে মোটেই তৃপ্ত হতে পারলে না, হতাশ ভাবে বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ এখানে এসে মনে হচ্ছে না তো আমার স্বপ্নে-দেখা আফ্রিকায় এসে হাজির হয়েছি। এ যে দেখছি বাংলা দেশের মফস্‌সলের কোনও শহরের মতো একটা জায়গা!'

রোলাঁ মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এখান থেকে আমরা যাব এরও চেয়ে একটা বড়ো শহরে। নাম তার নাইরোবি, সেটা হচ্ছে কেনিয়ার রাজধানী।'

কমল মুখ ভার করে বললে, 'তাহলে আমরা কি আফ্রিকায় এসেছি শহরের পর শহর দেখবার জন্যেই?'

—'আপাতত তাই বটে। কমলবাবু, প্রথমে আমাদের গোড়া বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে অনেক লটবহর, তাঁবু, মোটর, লরি, আগ্নেয়াস্ত্র, একদল আস্কারি—'

—'আস্কারি আবার কী?'

—'এখানে আস্কারি বলে সেপাই আর পাহারাওয়ালাকে।'

—'কোথায় তারা?'

—'ভারতবর্ষে থাকতেই যথাসময়ে তারবার্তা পাঠিয়ে আমার এজেন্টকে সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখতে বলেছি। এখনই ব্যস্ত হবেন না, অজ্ঞাত আফ্রিকার বুকে ঝাঁপ দেবার আগে যথাস্থানেই সব হাজির থাকবে।'

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে কমল বললে, 'তাহলে এখনও অজ্ঞাত আফ্রিকার অস্তিত্ব আছে?'

রোলাঁ বললে, 'এখনও আছে কমলবাবু, এখনও আছে। কাপড়ের ধারে ধারে থাকে যেমন পাড়, আফ্রিকার চার প্রান্তেই আছে তেমনি সভ্যতার বসতি। কিন্তু তার অন্তঃপুর হচ্ছে এমন বিরাট যে, সেখানে কোথায় যে কী হচ্ছে আর কী না হচ্ছে, আজও কেউ নিশ্চিতরূপে সে সন্ধান রাখতে পারে না। এই তো সবে প্রস্তাবনা, এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন কেন?'

বুঝতে পারছি, কমলের মতো অনেক পাঠকও এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবেই প্রাথমিক পথের বর্ণনা দিয়ে আমরা মূল ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হব।

দিন-দুই মোম্বাসার দুঃসহ কাঠফাটা উত্তাপ সহ্য করে অবশেষে তারা ট্রেনে চড়ে নাইরোবির দিকে যাত্রা করলে।

দুই দিকে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঝোপঝাপ, বনজঙ্গল এবং মাঝে মাঝে ধূসর পাহাড়। সেখানে বিচরণ করছে হরিণ, উটপাখি, জেব্রা ও জিরাফের দল। এক জায়গায় খানার ধারে দাঁড়িয়ে জলপান করছিল একটা চিতাবাঘ, ছুটন্ত ট্রেনের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই সে দৌড় মেরে একটা ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বললে, 'কুমার, মনে আছে, প্রথম বারে এ অঞ্চলে এসে কী বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছিলুম? সে যেন নানা জাতের জীবজন্তুর বিপুল শোভাযাত্রা!'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, এক জায়গায় ট্রেনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা-দুটো নয়, একদল সিংহ!'

বিমল বললে, 'এখানকার জীব-রাজ্যকে ক্রমেই ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা আর আগ্নেয়াস্ত্র। আজ যা দেখছি, দু-দিন পরে তাও আর থাকবে না।'

তারপর সুদুরের রহস্যময়, কুয়াশা-মাখা নীলবর্ণের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল এক রৌদ্রবিধৌত পর্বতের মেঘভেদী সমুজ্জ্বল তুষার-মুকুট।

কমল সবিস্ময়ে বললে, 'দারুণ গ্রীষ্মের কবলে ছটফট করছিলুম, এখন এ যে দেখছি বরফের পাহাড়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম কিলিম্যাঞ্জেরো।'

রামহরি বললে, 'উঁহুঁ, এটা হচ্ছে এখানকার হিমালয়। বাবা মহাদেব এদিকে বেড়াতে এলে ওইখানে গিয়েই ওঠেন'—এই বলে সে ভক্তিভরে দুই হাত যুক্ত করে বাবা মহাদেবের উদ্দেশে ঘন ঘন প্রণাম করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কমল সাগ্রহে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন, আবার একটা বরফের পাহাড়।'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ, মাউন্ট কেনিয়া। মাথায় তুষারের গম্বুজ থাকলেও এ হচ্ছে আগ্নেয় পর্বত—কিলিম্যাঞ্জেরোর চেয়ে দুই হাজার ফুট নিচু। ওরই বুকের ভিতরে আছে আফ্রিকার বহু হ্রদ আর নির্ঝরের মূল।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে রামহরি বললে, 'বাবা, এদেশে একটা নয়, দু-দুটো হিমালয় আছে!'

অবশেষে ট্রেন এসে থামল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির সুনির্মিত আধুনিক রেল-স্টেশনে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থেকে নামল শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর দল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কামরায় ছিল যথাক্রমে ভারতীয় ও আফ্রিকার দেশীয় যাত্রীরা।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কমল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'শুনেছিলুম আফ্রিকা হচ্ছে পশুরাজ সিংহের স্বদেশ। কিন্তু হায় রে, এতখানি পথ পার হয়ে এলুম, তবু পশুরাজের একগাছা ল্যাজের ডগাও তো দেখতে পেলুম না!'

রোলাঁ বললেন, 'প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ম্যাপে নাইরোবির নাম খুঁজে পাওয়াও সহজ ছিল না। তখন এ জায়গা ছিল সিংহদের শখের বেড়াবার জায়গা। শহরের পত্তন হবার

অনেক পরেও বড়ো বড়ো রাস্তায় বিচরণ করত সিংহের দল। তাদের ভয়ে রাত্রে কেউ বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে ভরসা করত না। বাড়ির ভিতরে থেকেও গৃহস্থদের শান্তি ছিল না, কারণ সিংহরা খাবারের লোভে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজা ঠেলাঠেলি করত। শহরে সিংহের কবলে মৃত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের কবর এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন আর নেই, আজকের নাইরোবি হচ্ছে যে কোনও সভ্য দেশের উপযোগী সম্পূর্ণ আধুনিক নগর। সিংহেরা আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী নয়। তারা ঘৃণাভরে এ অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়েছে। বাসিন্দারা এখন রাস্তায় শুয়েও ঘুমোতে পারে।'

এমন সময়ে স্টেশনের জনতার ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে রোলাঁকে অভিবাদন করলে। লম্বায় সে প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, গঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। পরনে খাকি রঙের কোট, প্যান্ট ও জুতো।

রোলাঁ বললেন, 'গেল বারে এ ছিল আমার সাফারির সর্দার। এর নাম কামাথি, জাতে কিকুয়ু, অত্যন্ত বিশ্বাসী।'

কমল শুধোলে, 'সাফারি কাকে বলে?'

রোলাঁ বললেন, 'লটবহরবাহী কুলির দল।'

রোলাঁ স্থানীয় ভাষায় কামাথির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠল কেমন একটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

বিনয়বাবু বললেন, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, আপনি কি কোনও অশুভ খবর পেয়েছেন?'

রোলাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, অশুভ খবর—অত্যন্ত অশুভ খবর। গত কল্য আর একদল শ্বেতাঙ্গ কঙ্গো প্রদেশের দিকে যাত্রা করেছে।'

—'এজন্যে আমাদের ব্যস্ত হবার কোনও কারণ আছে?'

—'নিশ্চয়ই আছে! আমাদের মতো তাদেরও গন্তব্য স্থান হচ্ছে মিকেনো পর্বত। বড়োই দুঃসংবাদ, বড়োই দুঃসংবাদ!'

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

সর্দার ডাকু এবং মউ মউ

দুঃসংবাদ শুনে বিমল নীরব হয়ে রইল।

তারপর কুমার বললে, 'দেখছেন মঁসিয়ে রোলাঁ, শেষটা আমাদের অনুমানই সত্য হয়ে দাঁড়াল?'

রোলাঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তাই তো দেখছি! মনুষ্য-চরিত্রে আমার চেয়ে যে আপনাদের অভিজ্ঞতা বেশি, এটাও বুঝতে পারছি! কিন্তু কথা হচ্ছে এই, গেল যারা মিকেনো পর্বতের দিকে যাত্রা করেছে, তারা কারা? কামাথি, গেল বারে তুমি তো আমাদের দলে ছিলে, সবাইকেই তুমি চেনো। এরা কি তারাই?'

কামাথি মাথা নেড়ে বললে, 'না কর্তা, এদের কারুকেই আমি চিনি না। কিন্তু আমি খবর পেয়েছি, এরা আপনাদের কথা জানে।'

কুমার বললে, 'আমার বিশ্বাস, একদল রত্নলোভী মানুষ ফ্রান্সেই আপনার ওই একশো ক্যারেট হিরাখানার ইতিহাস জানতে পেরেছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, তারা ধরে নিয়েছে, ওই হীরকের জন্মভূমি আবিষ্কার করবার জন্যেই এবার দেশ ছেড়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছেন। হয়তো আমাদের পিছনে পিছনেই আছে তাদের চর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ড হবে তাদের সমস্ত আশা-ভরসা। হিরা-মানিকের লোভে আমরা আসিনি, খুব সম্ভব হিরার খনির সন্ধানও আমরা পাব না!'

বিনয়বাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'বুড়ো-বয়সে জঙ্গলে ঢুকে খুন-খারাপি কাণ্ডে যোগ দিতে আমার মন চাইছে না। তুমি কী বলো রামহরি?'

বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রামহরি বললে, 'আমিও তো ওই কথাই বলি বাবু, কিন্তু আমাদের খোকাবাবুর কথা বাদ দিন—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি!'

কমল বললে, 'ধর্মের কাহিনি শোনবার জন্যে এত তোড়জোড় করে সাগর পার হয়ে আমরা এখানে আসিনি রামহরি! আসুক সিংহ, আসুক গন্ডার, আসুক দলে দলে শত্রু—আমরা কারুর তোয়াক্কা রাখি না!'

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো বাচাল গোঁয়ার কোথাকার! ফাঁকা ঢেঁকির শব্দ বেশি!'

রোলাঁ বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু ভীরু নন মঁসিয়ে রোলাঁ, তিনি হচ্ছেন আমাদেরই দলে, তবে আমাদের চেয়ে সাবধানী!'

বিমল বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, গেল বারে যে বন্ধুর সঙ্গে আপনি মিকেনো পর্বতে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম কী?'

—'ক্লেমাঁ। আপনি কি ভাবছেন, বুঝেছি। না, এবারে যারা মিকেনোর দিকে যাচ্ছে, ক্লেমাঁ নিশ্চয়ই এদের দলে নেই। মিকেনো সম্বন্ধে আমার চেয়ে সে কম বিশেষজ্ঞ নয়। আর হিরাখানার কথা ঘুণাক্ষরেও তাকে টের পেতে দিইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এবারে যারা যাচ্ছে তারা হচ্ছে নতুন লোক। তারা জানে না, ঠিক কোনখানে গিয়ে আমরা হিরাখানা পেয়েছি, তাই আমাদেরই মুখাপেক্ষী তারা। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, কামাথির কাছ থেকে সব কথা আমি আরও ভালো করে জেনেনি।'

রোলাঁ একটু তফাতে গিয়ে কামাথির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথোপকথনে নিযুক্ত হলেন। বিমল ও কুমার মালপত্তর তদারক করতে লাগল। রামহরিকে নিয়ে বিনয়বাবুও একদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন—তাঁদের দুজনেরই মুখ রীতিমতো বিরক্ত।

কমল বেচারা কোনও জুটি না পেয়ে বাঘার কাছে গিয়ে বললে, 'আয় রে বাঘা, আমরা দুজনেও গল্প করি!'

বাঘা ল্যাজ নেড়ে তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'ঘেউ!'

—'তোর ওই ঘেউ মানে কী রে বাঘা?'

বাঘা পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা বাড়িয়ে কমলের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

—'একবারের বদলে চারবার ঘেউ? তবু মানে কিছু বোঝা গেল না তো?'

ওদিকে খানিক পরে কামাথির সঙ্গে কথা বলে রোলাঁ যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর ভাবভঙ্গি দেখাচ্ছিল অত্যন্ত উত্তেজিত!

কুমার বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এইবারে উনি আরও একটা রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদে বসবেন!'

রোলাঁ বললেন, 'ঠিক তাই কুমারবাবু, ঠিক তাই! তবে একটা নয়, দুটো গল্প!'

—'যথা—'

—'একে একে বলব। এবারে যারা মিকেনো পর্বতে যাচ্ছে, তাদের নায়কের নাম জোফার।'

—'কে সে মহাপুরুষ?'

—'ফ্রান্সের এক কুখ্যাত দস্যু-দলপতি। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ফেরারি আসামি। তার সঙ্গে আছে আরও দশজন ইউরোপীয়, নিশ্চয়ই তাদের কেহই মহাত্মা নয়; আর আছে বিশজন দেশীয় আস্কারি (সৈনিক)। তাদের সাফারিতেও আছে দু-ডজন কুলি।'

—'মোট পঞ্চান্নজন লোক। বিমল, শুনছ?'

—'শুনছি বইকি! মসিয়ে রোলাঁ, আমাদের লোকসংখ্যা কত হবে?'

—'আমরা ছয়জন, আস্কারি বারোজন আর কুলি ত্রিশজন—সবশুদ্ধ আটচল্লিশজন লোক।'

—'হুঁ। যদি মারামারি বাঁধে, তবে সংখ্যায় তারা খুব বেশি হবে না।'

—'তা হবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মারামারি বাঁধলে দুই দল থেকেই নিরীহ কুলিরা তাড়াতাড়ি দূরে সরে দাঁড়াবে।'

—'আপনার বিশ্বাস বোধ হয় ভ্রান্ত নয়। সে-ক্ষেত্রে একত্রিশজন শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাদের আঠারোজনকে। তা সেজন্যে আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই।'

রোলাঁ চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু ভয় পাবার আর একটা কারণ আছে।'

—'আবার কী কারণ?'

—'আপনি কেনিয়ার মউ মউ আন্দোলনের কথা শুনেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, খবরের কাগজে পড়েছি। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে এই মউ মউ আন্দোলন। কিকিয়ু জাতের অনেক লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আপনার ওই কামাথিও তো জাতে কিকিয়ু?'

—'হ্যাঁ। যদিও কামাথি ওই দলে যোগ দেয়নি, তবু মউ মউ আন্দোলনের সব কথাই সে জানে। সমস্ত কেনিয়া প্রদেশেই জ্বলছে এখন দারুণ অশান্তির আগুন। তারই খানিকটা শিখা ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকে—অর্থাৎ উগাণ্ডা-কঙ্গোর সীমান্ত প্রদেশে। মউ মউ আন্দোলনকারীদের একটা ভাঙা দল ইংরেজদের তাড়া খেয়ে

পালিয়ে এসে ওখানকার পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নাকি মারমুখো হয়ে আছে—তাদের ত্রিসীমানায় যাওয়া এখন নিরাপদ নয়।'

—'মঁসিয়ে রোলাঁ, আমি শুনেছি এই বিদ্রোহীদের যত রাগ ইংরেজদের উপরেই। আপনিও শ্বেতাঙ্গ বলে আপনার যদি ভয় হয়, তবে ছদ্মবেশ ধারণ করে চটপট ভারতীয় হয়ে পড়ুন না!'

রোলাঁ মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'না, বিমলবাবু, ব্যাপারটা অত সহজে উড়িয়ে দেবার নয়। খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু কথা বলি শুনুন: কেনিয়া প্রদেশে কৃষ্ণাঙ্গজাতির লোকসংখ্যার তুলনায় ইউরোপীয়রা তুচ্ছ—অর্থাৎ পঞ্চান্ন লক্ষের ভিতরে মাত্র বিয়াল্লিশ হাজার। এই সংখ্যায় নগণ্য শ্বেতাঙ্গরা অধিকাংশ ভালো জমি জোর করে নিজেদের দখলে রেখেছে। এখানে খুব ফলাও করে কফির চাষ হয়। শ্বেতাঙ্গরা হাজার হাজার কফির চারা বপন করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের একশোর বেশি চারা বপন করবার অধিকার নেই। ইংরেজরা এখানে নিরঙ্কুশ প্রভু, আফ্রিকানরা হুকুমের দাস মাত্র—তাদের জন্ম যেন কেবল কুলির মতন খেটে মরবার জন্যেই। রাজকার্যে শিক্ষিত আফ্রিকানরাও ইংরেজদের ছায়ার পাশেও দাঁড়াতে পারে না। কেনিয়ায় কয়েক জাতের আফ্রিকান বাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কিকিয়ু জাতের লোকেরা। তারা অধিকতর শিক্ষিত, সংখ্যাতেও প্রায় দশ লক্ষ। তারা আর স্বদেশে প্রবাসীর মতন ক্রীতদাসের মতন থাকতে রাজি নয়—ন্যায়ত ধর্মত নিজেদের যা প্রাপ্য তারা তা আদায় করে নিতে চায় এবং এই নিয়েই তাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বেঁধেছে। কিকিয়ুদের বহু লোক মউ মউ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘোষণা করেছে—(১) ইংরেজদের কেনিয়া ছাড়তে হবে। (২) আমাদের প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। (৩) আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। (৪) আমাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। ইংরেজরা একেবারেই নারাজ। বিদ্রোহীরা করেছে অস্ত্রধারণ। ইংরেজরাও নির্বিচারে কিকিয়ু জাতির উপরে সশস্ত্র অত্যাচার চালিয়েছে—গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারী, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্রদেরও ক্ষমা করছে না, যারা মউ মউ আন্দোলনে যোগ দেয়নি, সন্দেহক্রমে তাদেরও দলে দলে গুলি করে মেরে ফেলছে। বিদ্রোহীরাও দমবার পাত্র নয়, তারাও প্রতিশোধ নিচ্ছে সদসৎ যে কোনও উপায়ে। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে ইউরোপীয়দের হত্যা করছে। ইংরেজরা বিলাত থেকে অসংখ্য সৈন্য আমদানি করেছে; তাদের সঙ্গে আছে বড়ো বড়ো কামান আর বোমারু বিমান প্রভৃতি, বিদ্রোহীরা তাই সম্মুখ-যুদ্ধে তাদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে না, তারা করে গেরিলা-যুদ্ধ। বেগতিক দেখলেই তারা জঙ্গলে-পাহাড়ে গা-ঢাকা দেয়। এই রকম একটা পলাতক দল কোনও গতিকে উগান্ডা-কঙ্গোর জঙ্গলে এসে লুকিয়ে আছে। কামাথির মতে তাদের দলে লোক আছে প্রায় পাঁচশো। বিমলবাবু, একদিকে দস্যুসর্দার জোফার, আর একদিকে পাঁচশো মউ মউ বিদ্রোহী,—মাঝখানে পড়ে আমাদের অবস্থা হবে কীরকম, আন্দাজ করতে পারছেন কি? এমন সব সম্ভাবনার কথা আগে জানলে আপাতত আমি এ পথে পদার্পণ করতুম না!'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু ভারতীয়দের উপরে মউ মউ বিদ্রোহীদের আক্রোশ নেই তো?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, তোমার এ কথার মানে হয় না! মউ মউ বিদ্রোহের সব খবরই আমি রাখি। এই কেনিয়ায় এসে বাসা বেঁধেছে হাজার হাজার ভারতীয় ব্যবসায়ী, তাদের অনেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের মধ্যে আবার এক শ্রেণির নির্বোধ লোক আছে, যারা দুই শত বৎসর ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করেও আজ স্বাধীন হয়ে সে দুর্দশার কাহিনি ভুলে গিয়েছে। কেনিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ না দিয়েও তারা নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার তা করেনি। তারা অত্যাচারী ইংরেজদের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে সহযোগিতা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ফল হয়েছে অত্যন্ত খারাপ। বিদ্রোহীরা ভারতীয়দেরও শত্রু বলে ভাবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন ভারতীয় তাদের হাতে মারা পড়েছে। মসিয়ে রোলাঁ, তাই নয় কি?'

—'ঠিক তাই। বিমলবাবু, বিদ্রোহীদের কবলে পড়লে ভারতীয় বলে আপনারাও রেহাই পাবেন না।'

বিমল বললে, 'সব বুঝলুম। কুমার, তোমার মত কী?'

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমরা এতদূরে এসেছি কীসের জন্যে? তুচ্ছ হীরক, যা খেয়ালি ধনীর কাছে পরম ঐশ্বর্যের মতো তার লোভে নয়! আমরা এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে, নতুন দেশ দেখবার জন্যে, পৃথিবীর অজানা আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে ফিরে যাব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা!'

বিমল বললে, 'বলা বাহুল্য, আমিও তোমার কথায় সায় দি। বাধা আর বিপদ আর মৃত্যুকে ভয় করা আমাদের কোষ্ঠীতে লেখেনি। শক্তির উপরে গণ্য করি আমি বুদ্ধিকে। আসে যদি শত্রু, বুদ্ধিবলে করব শত্রুসংহার। আমার মূলমন্ত্র—আগে চলো, আগে চলো ভাই!'

কমল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ধন্য বিমলদা, সাধু কুমারদা!'

বিনয়বাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'কমল, আবার?'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, আমাদের আস্কারির দল, সাফারি আর লটবহর কোথায় আছে?'

—'উগান্ডা-কঙ্গোর সীমান্তে বেহুঙ্গি গ্রামে।'

—'উত্তম, তাহলে আর মাথা ঘামানো নয়, চলুন সবাই বেহুঙ্গির দিকে!'

॥ সপ্তম পর্ব ॥

ভয়াবহ পরিস্থিতি

আহা, কী সুন্দর বেহুঙ্গি! এ নয় জনপদ, একে বলতে হয় লীলাবতী প্রকৃতির মনোহর নাচঘর!

তার মস্ত রঙ্গমঞ্চ সাজানো পূর্বে উগান্ডা থেকে পশ্চিমে কঙ্গোর সীমান্ত পর্যন্ত। দিকে

দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, সবুজে ছাওয়া উপত্যকা, মনোরম শৈল-বীথিকা, শস্য-বোনা ক্ষেত্র, নীলিমা-মাখানো হ্রদ, বেণুবনের সারি এবং দূরে দূরে পরে পরে যেন প্রহরায় নিযুক্ত মরা আগ্নেয়গিরির তুঙ্গ শিখর—তাদের নাম সিবিঁইনিয়ো, মুহাবুরা, মুহাহিঙ্গা! সূর্যাস্তের সময়ে চক্ষে জাগে মহিমময় বর্ণাঢ্য দৃশ্য! আবার তুষারমুকুট পরা অথচ অগ্নিগর্ভ জ্যান্ত পাহাড়ও আছে, নাম তার নিয়ামলাজিরা—সূর্যের পর চন্দ্র বিদায় নিলেও পৃথিবীকে সে তিমিরাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকতে দেয় না, নৈশ আকাশকে করে রাখে আলোয় আলোময়! এবং সেই সমুজ্জ্বল আকাশের তলায় গভীর রাত্রির মৌনব্রত ভেঙে দেয় বিনিদ্র বনগ্রামবাসীদের মুখর সব দামামা—দূরদূরান্ত থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তাদের রহস্যময় দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি, যেন প্রাগৈতিহাসিক আদিম আফ্রিকার মৃত্যুহীন ভাষা!

এমন সব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে বিমল ও কুমার প্রমুখ যাত্রা করেছে যাদের বর্ণনা দিতে গেলে আমাদের গল্প বলা বন্ধ হয়ে যাবে। এত রকম দৃশ্য এবং এত তাড়াতাড়ি দৃশ্য পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোথাও কল্পনাতীত। তুষার-শুভ্র উত্তুঙ্গ পর্বতমালা; জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি; যোজনের পর যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত মহারণ্য; দুষ্পার, দু-কূলপ্লাবী, দুরন্ত নদ-নদী; নৃত্যশীল ঝরঝর নির্ঝর; শব্দায়মান জলপ্রপাত এবং দিকে দিকে ছড়ানো হ্রদের পর হ্রদ। এত কাছাকাছি এত বড়ো বড়ো হ্রদও আর কোনও দেশে দুর্লভ—ভিক্টোরিয়া (২৭ হাজার বর্গ-মাইল), অ্যালবার্ট (দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ এবং ২৫ মাইল), এডওয়ার্ড (দৈর্ঘ্যে ৪৪ মাইল), জর্জ, কিভু, কিঙ্গা, মোয়েরু ও টাঙ্গানিকা প্রভৃতি। ভিক্টোরিয়া ও টাঙ্গানিকাকে দেখলে সমুদ্র বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা শিকেয় তুলে রেখে এখন গল্পকথাই শুরু করি।

সবাই যেখান দিয়ে চলেছে তার উত্তরে আছে এডওয়ার্ড হ্রদ ও দক্ষিণে কিভু হ্রদ। যতক্ষণ যাচ্ছিল কেনিয়া ও উগান্ডা প্রদেশের ভিতর দিয়ে, ততক্ষণ তারা আধুনিক সভ্যতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, কিন্তু এইবারে সকলে এসে পড়ল যেন আদিম পৃথিবীর বন্য জীবনের নির্জনতার মধ্যে। কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, কিন্তু হিংস্র জন্তুদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় যত্র-তত্র। বনভূমির জঙ্গল ভেঙে মাটি কাঁপিয়ে চলে যায় হাতির পাল ও হিপোর দল, গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়ায় ছোটো-বড়ো নানাজাতের বানররা—একদিন দেখা গেল একদল শিম্পাঞ্জিও। রাত্রে শোনা যায় বনে বনে পশুপতি সিংহদের কণ্ঠে মেঘগর্জনের অনুকরণ এবং ছিঁচকে চোর হায়েনাদের হা-হা-হা-হা হাস্যধ্বনি। কোনও কোনও দিন সকালে উঠে মাটির উপরে দেখা যায় অতি-সাবধানী চিতাবাঘের থাবার দাগ।

বুরঙ্গা নামে একটি পাহাড়ে জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়েছে। অনেক তফাতে মাঝে মাঝে রয়েছে বনবাসী কৃষাণদের 'সাম্বা' বা শস্যখেত। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো গাছের ঝাড় ও ঝোপঝাপ। একটা অজানা পত্রহীন গাছে ফুটে রয়েছে থোকা থোকা রক্তরঙা ফুল। এবং বহু—বহু দূরে নিম্নভূমিতে সূর্য-কিরণে চকচক করে উঠছে কিভু হ্রদের নীলজল।

চায়ের পালা সাঙ্গ হবার পর রামহরি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে রান্নাবান্নার আয়োজনে নিযুক্ত হয়েছে।

কমল এসে বললে, 'রামহরিদা, আজ টাটকা মাংস খাবার সাধ হয়েছে। রোজ রোজ কি টিনে প্যাক-করা মাংস খেতে ভালো লাগে?'

রামহরি বললে, 'শোনো একবার ছেলের কথা! এই বনমানুষের দেশে কি হুট বললেই টাটকা মাংস পাওয়া যায় বাপু? টাটকা মাংস খাবে তো বন্দুক নিয়ে বনের ভিতরে যাও, হরিণ কি পাখি মেরে আনো।'

কমল বললে, 'আরে ধেৎ, সে পথ যে বন্ধ! তুমি কি জানো না, পাছে শত্রুরা টের পায় সেই ভয়ে আপাতত আমাদের বন্দুক ছুড়তে মানা?'

—'তবে আবার টাটকা মাংস খাবার আবদার ধরেছ কেন?'

কমল বললে, 'টাটকা মাংসের ভাবনা কী? কাছেই তো দেখলুম চাষাদের 'হেমা' রয়েছে, সেখানে গেলে কি 'কুকু'—নিদেন পক্ষে 'কণ্ডু'রও খোঁজ পাওয়া যাবে না?'

রামহরি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'ও কমলবাবু, বনে বনে ঘুরে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? 'হেমা', 'কুকু', 'কণ্ডু'—এ-সব কী মাথামুণ্ডু বকছ?'

কমল খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'রামহরি হে, এদেশি ভাষায় 'হেমা' বলতে কুঁড়েঘর, 'কুকু' বলতে মুরগি আর 'কুণ্ডু' বলতে ভেড়া বুঝায়!'

রামহরি রেগে গিয়ে বললে, 'যাও যাও, আর পাকামি করতে হবে না! আমাকে কি আফ্রিকার কাফ্রি-ভূত পেয়েছ যে আমার কাছে ওই সব ছিষ্টিছাড়া কথা কপচাতে এসেছ?'

ওদিকে তাঁবুর ভিতরে বসে রোলাঁ, বিনয়বাবু, বিমল ও কুমার।

বিনয়বাবু বলছিলেন, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, কামাথির খবর বোধহয় ঠিক নয়। আমরা এতখানি পথ এগিয়ে এলুম, ডাকাত জোফারদের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না তো!'

রোলাঁ বললেন, 'মৃত্যুকে দেখা যায় না, সে আসে আমাদের অজ্ঞাতসারেই!'

কুমার বললে, 'আমার কিন্তু এই কথা ভেবেই অস্বস্তি হচ্ছে, মৃত্যু আছে আমাদের সামনে না পিছনে সেটা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না!'

বিমল বললে, 'ধরে নাও মৃত্যু আছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই! একটু যদি অসাবধান হও, তারপর আর অনুতাপ করবারও ফুরসত পাবে না!'

সেইদিনই রাত্রি নিয়ে এল বিপদের প্রথম সঙ্কেত।

অন্ধকারে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। তাঁবুর মধ্যে সবাই নিদ্রায় অচেতন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে ঢুলছে কেবল একজন প্রহরী।'

আচম্বিতে বাঘার ক্রুদ্ধ গর্জন! তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মানুষের কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! ধস্তাধস্তির শব্দ!

চকিতে টুটে গেল বিমল ও কুমারের সতর্ক নিদ্রা।

—'কুমার, কুমার!'

—'আমি উঠেছি!'

—'বাঘার চিৎকার,—কারা ধস্তাধস্তি করছে!'

—'বাইরে চলো—ওইদিকে!'

বাইরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল অভাবিত দৃশ্য!

মাটির উপরে চিৎপাত হয়ে পড়ে ছটফট করছে একটা মনুষ্য-দেহ এবং বাঘা রয়েছে তার গলা কামড়ে ধরে বুকের উপরে চেপে বসে!

ততক্ষণে রোলাঁ, রামহরি, বিনয়বাবু, কমল, কামাথি এবং আরও অনেকে চারিদিক থেকে ছুটে এল। সকলে মিলে বাঘার কবল থেকে রক্ষা করলে লোকটাকে। যদিও তার কণ্ঠদেশটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, তবু পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সে যতটা ভয় পেয়েছে ততটা আহত হয়নি।

রোলাঁ বললেন, 'একে তো আমাদের দলের লোক বলে মনে হচ্ছে না!'

কামাথি বললে, 'না কর্তা, এ হচ্ছে ওয়াহুটু জাতের লোক। কাপুরুষের একশেষ!'

—'এত রাত্রে লোকটা কেমন করে এখানে এল?'

বিমল বললে, 'রাত দুটো বেজে গেছে। এমন সময়ে এই মারাত্মক অরণ্যে কেউ শখ করে বেড়াতে আসে না। নিশ্চয় এ লোকটা হয় চোর নয় গুপ্তচর!'

কুমার বললে, 'চোর তত বিপজ্জনক নয়। কিন্তু গুপ্তচর হচ্ছে ভয়াবহ জীব। আমরা এর ভাষা জানি না, কেমন করে এর পরিচয় পাব?'

রোলাঁ বললেন, 'ওয়াহুটুদের ভাষা আমিও বুঝি না। তবে এখনই আমি সে ব্যবস্থা করছি। কামাথি!'

—'কর্তা!'

—'কামাথি, এ লোকটা চোর কি গুপ্তচর বুঝতে পারছি না। যেমন করে পারো, তুমি এর পেটের কথা আদায় করে নাও। পারবে?'

—'খুব পারব কর্তা!' বলেই কামাথি তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ফস করে শাণিত 'পাঙ্গা' খানা বার করে ফেললে। এদেশে তরবারিকে বলে 'পাঙ্গা'।

রোলাঁ বললেন, 'ও কী, তুমি পাঙ্গা বার করলে কেন? ওকে কেটে ফেলবে নাকি?'

কামাতি হেসে বললে, 'না কর্তা, মরা লোক কথা কয় না। ওকে পাঙ্গা বার করে ভয় দেখাব—তবে দু-একটা খোঁচাও দিতে পারি। ও যদি ওয়াটুসি জাতের লোক হত, তবে পাঙ্গার খোঁচা খেয়েও পেটের কথা ফাঁস করত না। কিন্তু ওয়াহুটু জাতের লোকরা হচ্ছে হায়েনার চেয়েও কাপুরুষ। পাঙ্গা দেখলেই সব কবুল করে ফেলবে!'

রোলাঁ বললেন, 'উত্তম। আসল কথা যদি আদায় করতে পারো, মোটা বকশিশ পাবে।'

কামাথি সেলাম ঠুকে বললে, 'সান্তা সামা (বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ)!'

কামাথির উপরে বন্দির ভার অর্পণ করে সবাই আবার ছাউনির ভিতরে গিয়ে বসল।

রোলাঁ বললেন, 'রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। এখন একটু কফি পেলে মন্দ হত না।'

সদাপ্রস্তুত রামহরি তৎক্ষণাৎ কফির জন্যে জল গরম করতে গেল।

বাঘাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে কুমার বললে, 'দেখছেন মঁসিয়ে রোলাঁ, আমার বাঘা হচ্ছে মানুষের চেয়ে হুঁশিয়ার চৌকিদার?'

—'হ্যাঁ কুমারবাবু, বাঘাকেও ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই!'

কফির পেয়ালা নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামাথির আবির্ভাব।

রোলাঁ শুধোলেন, 'কী সমাচার, কামাথি?'

—'সমাচার শুভ নয় কর্তা! লোকটা সত্য সত্যই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর!'

—'ডাকাত জোফার ওকে পাঠিয়েছে?'

—'হ্যাঁ কর্তা! ও লুকিয়ে আমাদের ভিতরকার খবরাখবর নিতে এসেছিল।'

—'তারপর?'

—'শত্রুরাও এই পথেই আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।'

—'তারা কত পিছনে আছে?'

—'মাইল তিন-চার।'

—'তাদের উদ্দেশ্য কী?'

—'বন্দি তা জানে না।'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি। আমরা পথের ঠিকানা জানি, তারা জানে না। খুব সম্ভব তারা হঠাৎ চড়াও হয়ে আমাদের বন্দি করতে চায়।'

—'বিমলবাবু, আপনার অনুমান বোধহয় ভুল নয়। এখন উপায়?'

—'উপায়, খুব তাড়াতাড়ি—অর্থাৎ দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে যাওয়া। আগে তো মিকেনো পর্বতে গিয়ে পৌঁছই, পরের কর্তব্য যথাসময়ে স্থির করা যাবে। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এ যে রক্তারক্তির উপক্রম! এত হামলার মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি আবার ফিরে যাই?'

রোলাঁ বললেন, 'শত্রুরা আমাদের পথ আগলে থাকবে, আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব!'

তখনই তাঁবু তোলবার ব্যবস্থা হল। সূর্যোদয়ের আগেই তারা লটবহর নিয়ে এগিয়ে চলল সদলবলে।

চারিদিক রোদের সোনালি মেঘে ঝলমল করছে। আর শস্যক্ষেত্র নেই, দিকে দিকে দেখা যায় কেবল যেন পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছোটো-বড়ো শৈলশ্রেণি, মাঝে মাঝে শ্যামল উপত্যকা, কলরোলে মুখর জলপ্রপাত, মর্মরসংগীতে পূর্ণ বনস্পতি। দূরে তাদের পিছন থেকে আকাশের অনেকটা ছেয়ে দাঁড়িয়ে তুষারমৌলি আগ্নেয়পর্বত নিয়ামলাজিরা।

বেলা যখন দুপুর, ঊর্ধ্বশ্বাসে ভীত মুখে ছুটে এসে কামাথি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কর্তা, কর্তা,! কেবল পিছনে নয়, আমাদের সামনের পথও বন্ধ। এইমাত্র আমাদের এক অগ্রদূত খবর নিয়ে এসেছে, সামনের পথ দিয়েও ছুটে আসছে মউ মউ বিদ্রোহীদের মস্ত একটা দল!'

॥ অষ্টম পর্ব ॥

বিমলের রণকৌশল

তিক্ত হাস্য করে বিনয়বাবু বললেন, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য? আমাদের সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু—বিমল, এখন কোন বুদ্ধিবলে তুমি দু-দিক সামলে এদের কবল থেকে উদ্ধারলাভ করবে?'

বিমল কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে শান্ত ভাবেই বললে, 'সামনের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ শুনেছি সংখ্যায় তারা প্রায় পাঁচ শত। কিন্তু পিছনের শত্রুরা দলে বেশি ভারী নয়, তাদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে পারি।'

—'কিন্তু পরীক্ষার ফলে আমরাই হয়তো পরাজিত হব।'

—'অসম্ভব নয়।'

—'তবে?'

সে-জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, মিকেনো পর্বতে যাবার পথ কি এই একটিমাত্র?'

'এ অঞ্চলে এই পথ দিয়েই সকলে মিকেনোর দিকে যায়। আমি আর কোনও পথের কথা জানি না। আচ্ছা, কামাথিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

তারপর কামাথির সঙ্গে কথা কয়ে রোলাঁ বললেন, 'বিমলবাবু, এখান থেকে সামনের দিকে মাইলখানেক তফাতে ডান দিকে আছে একটা দুর্গম, বন্ধুর, সংকীর্ণ বন্য পথ। কিন্তু সে-পথটা এত ঘুরে-ফিরে নানা পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে মিকেনো পর্বতের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণত কোনও পথিকই তার উপর দিয়ে চলাচল করে না।'

বিমল বললে, 'আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি পাশের ওই পাহাড়টার উপরে উঠে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ করে আসি।'

পথ থেকে নেমে এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে অল্প দূর অগ্রসর হলেই সেই জঙ্গলময় পাহাড়টার নাগাল পাওয়া যায়। পাহাড়টা আকারে ছোটো, উচ্চতায় দুই শত ফুটের বেশি হবে না। দেখতে দেখতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বিমলের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোলাঁ উত্তেজিতভাবে কামাথির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কইতে লাগলেন। কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে একটা গাছতলায় বসে রইল—তার মুখ-চোখের ভাব পরম নিশ্চিন্ত। দলে রক্ষীরা বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল—অতিরিক্ত গম্ভীর মুখে। কুলিরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখলেই মনে হয়, তারা যেন পালাবার জন্যে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে।

বিনয়বাবু হতাশভাবে বার বার মাথা নাড়তে থাকেন আর তাই দেখে কমল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ফিক ফিক করে হাসে।

রামহরি বলে, 'ওগো বিনয়বাবু, আপনি অত ভাবছেন কেন? বিমলকে মানুষ করেছি,

তাকে আমি 'খোকাবাবু' বলে ডাকি বটে, কিন্তু তার মগজটি মোটেই খোকার মতো নয়। তার ওপরে বিশ্বাস রাখুন, বিপদ তাকে দেখলে ভয়ে পালায়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু বিমল তো অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে না! সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু—দাঁড়াব কোথায়?'

এমন সময়ে বিমল পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আবার সকলের কাছে এসে দাঁড়াল।

রোলাঁ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখলেন?'

—'দূরবিন দিয়ে দেখলুম, জোফারের দল আসছে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। মউ মউ বিদ্রোহীরা আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। দুই দলই এখান থেকে প্রায় তিন মাইল তফাতে আছে!'

—'এখন আমাদের কর্তব্য?'

—'সামনের দিকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া।'

—'নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে?'

—'না, এক মাইল দূরে ডান দিকের ছোটো অচল পথের কাছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বুঝেছি। তুমি বড়ো পথ ছেড়ে ওই পথটাই অবলম্বন করতে চাও। কিন্তু শত্রুরা কি এতই বোকা যে এই তুচ্ছ কৌশলটাও বুঝতে পারবে না?'

—'কেন বুঝবে না? কিন্তু অসময়ে বুঝবে। তখন আমরাও তাদের অনায়াসে—বুঝেছেন, অনায়াসেই বাধা দিতে পারব। আমি আমার যুদ্ধকৌশল স্থির করে ফেলেছি। চলুন সবাই! বেগে এগিয়ে চলুন! বিলম্বে সব পণ্ড হবে! কামাথি, তুমি আমাদের পথ-প্রদর্শক হও।'

আবার হল যাত্রা শুরু। কুলিদের যাবার ইচ্ছা ছিল না—কেমন করে তারা গোপন খবর পেয়ে গেছে! কিন্তু সশস্ত্র সেপাইদের তাড়নায় তারা যেতে বাধ্য হল।

প্রায় মিনিট-পনেরো পথ চলার পর কামাথি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'এইখানে!'

দুই ধারে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, মাঝখানে শুঁড়িগলির মতো একফালি পথ। তিনজনের বেশি লোক পাশাপাশি চলতে পারে না।

কামাথি বললে, 'কেবল কাঠুরেদের জন্যেই এ পথের অস্তিত্ব বজায় আছে। আর কেউ এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করে না।'

বিমল বললে, 'ওই পথই হবে আমাদের বাঁচবার পথ।'

কামাথি গলা তুলে বললে, 'কিন্তু ভাইসব, খুব হুঁশিয়ার। উপরকার গাছের ডালে অজগররা লুকিয়ে থাকে। প্রায়ই তারা ছোবল মেরে মানুষ ধরে!'

কুমার বললে, 'কী সুসংবাদ! শুনলেই অঙ্গ শীতল হয়ে যায়!'

কিন্তু সেদিন বোধ হয় অজগরদের ছুটির দিন। তারা অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে সকলেই নিরাপদে একটা প্রায় প্রান্তরের মতো বড়ো মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝখানে রোদে ইস্পাতের মতো চকচক করছে জল।

বিমল কামাথির দিকে চেয়ে শুধোলে, 'কী ওটা? নদী?'

—'না, জলাভূমি। আমাদের ওটা পেরিয়ে আবার মাঠের উপর দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

—'জলায় কতটা জল আছে?'

—'হাঁটুভর।'

বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে কী চিন্তা করতে লাগল।

কুমার সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এর মধ্যেই এদেশি ভাষায় কতকগুলো গাছের নাম জেনে নিয়েছে।

কোথাও রয়েছে 'কাগারা' বা বিছুটির ঝোপ, কোথাও 'মুসুঙ্গুরা' বা বন্য গোলাপ গাছ, কোথাও 'মুকেরি' বা কালো-জাম জাতীয় গাছ, কোথাও 'রুগানো' বা বাঁশবন, কোথাও ঝুলছে 'সারান্দা' বা একরকম গুল্ম এবং কোথাও বা দোদুল্যমান 'রুহুন্‌গাঙ্গেরি' বা হলদে-ফুল-ফোটা দ্রাক্ষা জাতীয় লতা। অনেক বড়ো বড়ো গাছের নাম কুমার এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু আগাছার জঙ্গলই সেখানে সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কন্টক-তরুলতারও সংখ্যা হয় না—তাদের দুষ্প্রবেশ্য ব্যূহ ভেদ করে মানুষ তো দূরের কথা, বন্য পশুরাও অগ্রসর হতে পারে না।

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, এখানকার অরণ্যে কখনও দাবানল দেখেছেন?'

—'দেখেছি। সে এক দিগন্তবিস্তৃত ভয়াবহ কাণ্ড! বর্ণনা করাও সহজ নয়!'

আচম্বিতে কেঁপে উঠল যেন দিগবিদিক! দুটো-চারটে নয়, একসঙ্গে বহু আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ গর্জন! দুইবার-একবার নয়, বারংবার!

বিনয়বাবু সচমকে বলে উঠলেন, 'ও আবার কী ব্যাপার! শত্রুদের আক্রমণ?'

বিমল সানন্দে বললে, 'ওই ব্যাপারের জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছি!'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হচ্ছে!'

রোলাঁ বললেন, 'তবে কি মউ মউ বিদ্রোহীরা জোফারের দলকে আক্রমণ করেছে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'ঠিক তাই। আমি জানতুম এ অবশ্যম্ভাবী। আমি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে চেয়েছিলুম। মাঝখান থেকে আমরা সরে এসেছি যথাসময়ে। জোফারের দল এসে পড়েছে মউ মউ বিদ্রোহীদের সামনাসামনি। এই তো আমার রণকৌশল!'

কমল প্রায় নাচতে নাচতে বললে, 'বিমলদা, আপনার কথাই সত্য! বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য!'

তখনও আওয়াজের পর আওয়াজ হচ্ছে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! আকাশে কান্তারে পাহাড়ে প্রান্তরে ছুটোছুটি করছে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি!

কমল বললে, 'জোফার বাবাজি হেলে ধরতে এসে কেউটের সামনে পড়ে গেছে,—তার আর রক্ষা নেই!'

বিনয়বাবু প্রশংসাভরা কণ্ঠে বললেন, 'বিমল, তুমি আমার অভিনন্দন নাও। অদ্ভুত এই বুদ্ধির খেলা!'

রামহরি বললে, 'কী গো বিনয়বাবু, কী বলেছিলুম?'

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু জোফারের দলকে সাবাড় করতে বিদ্রোহীদের বেশিক্ষণ লাগবে না। বিমলবাবু, তারপর তারা যদি আমাদের খোঁজ করে?'

—'আমাদের খোঁজ পাবে না। জোফারদের মতো তারাও তো জানে না আমরা যেতে চাই মিকেনো পর্বতে।'

—'কিন্তু—'

—'কিন্তু তবু যদি তারা আমাদের পিছু নেয়?'

—'তারা আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

—'কে তাদের বাধা দেবে?'

—'দাবানল।'

—'মানে?'

—'তাদের আর আমাদের মাঝখানে থাকবে দারুণ দাবানল।'

—'কোথায় দাবানল?'

—'সেই ভয়ংকরকে আমন্ত্রণ করব আমরাই। পাহাড়ের টঙে উঠে চারিদিক দেখতে দেখতে সব প্ল্যান আমি স্থির করে ফেলেছি। দেখছেন তো, এখানকার জঙ্গল রোদে পুড়ে বারুদের মতো হয়ে রয়েছে? ওই জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া কত সহজ বুঝতে পারছেন তো? বন্দুকের আওয়াজ এইবারে কমে আসছে, কামাথি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের হুকুম দিন, এখনই তারা জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিক। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দিকে দিকে তাধিন তাধিন তাণ্ডবে মেতে উঠবে প্রমত্ত দাবানলের লেলিহান শিখা!'

রোলাঁ একেবারে চমৎকৃত!

কমল ভয়ে ভয়ে বললে, 'দাবানল যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

'অসম্ভব। প্রথমত, হাওয়ার গতি বিদ্রোহীদের দিকে। দ্বিতীয়ত, এদিকে আছে ধু ধু খোলা মাঠ আর জলাভূমি। আমরা জলারও ওপারে গিয়ে দাঁড়াব।'

পনেরো-ষোলো জন লোক ছুটে গিয়ে অরণ্যের নানাস্থানে ভাল করে পেট্রল ঢেলে ও ছড়িয়ে দিলে। তারপরই জ্বলন্ত দীপশলাকার ছোঁয়া পেয়ে এখানে ওখানে দপদপিয়ে জ্বলে উঠল কয়েকটা খণ্ড খণ্ড আগুন। অনতিবিলম্বে সব আগুন একাকার হয়ে সৃষ্টি করলে এক প্রকাণ্ড, অখণ্ড ও প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড! দেখতে দেখতে ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল সেই দীপ্যমান অরণ্যের জ্বালাময় পরিধি! তখন খোলা মাঠে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরও সর্বাঙ্গ যেন বিষম উত্তাপে ঝলসে যেতে লাগল। জাগ্রত বায়ুতরঙ্গে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি অগ্নিকণা!

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'সবাই আরও দূরে চলো—জলাভূমির ওপারে!'

তারা যখন জলার ওপারে গিয়ে উঠল সীমাবদ্ধ অগ্নিকাণ্ড তখন পরিণত হয়েছে বিরাট এক সীমাশূন্য দাবানলে—যা ক্রমেই অধিকতর বিস্তৃত ও বিভীষণ হয়ে চমকপ্রদ অগ্ন্যুদগার করে যেন দৃশ্যমান সবকিছুকেই করতে চায় ভস্মসাৎ! সেই ঘোরশব্দময় অরণ্যানীর এদিক

থেকে ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টি জুড়ে হাজার হাজার ক্রুদ্ধ অগ্নিসর্প আকাশ নীলিমাকে রক্তারক্ত করে মারতে লাগল ছোবলের পর ছোবল এবং নীড় থেকে বিতাড়িত হয়ে শূন্যমার্গে উড়তে লাগল হাজার হাজার ত্রস্ত বিহঙ্গ। নীচেও সেই নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী দাবানলের কবল থেকে নিস্তারলাভ করবার জন্যে বন থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে একসঙ্গে ছুটে পালাতে লাগল দলে দলে হাতি, সিংহ, গন্ডার, হিপো, বরাহ, বন্যমহিষ, জেব্রা ও নানাজাতের হরিণ প্রভৃতি!

সেই দীপ্তোজ্জ্বল অরণ্যের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে বিমল বললে, 'এই আমার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ—এর মধ্যে আহুতি দিতে চাই শত্রুদের প্রাণ পতঙ্গ! যে দাবানল জ্বাললুম, কয়েক দিনের আগে তা নিববে না। এইবারে অগ্রসর হও মিকেনো পর্বতের দিকে—পথ এখন নিরাপদ!'

আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন তখন আর শোনা যাচ্ছিল না।

॥ নবম পর্ব ॥

(অতঃপর কুমারের ডায়েরি শুরু হল)

'টিকে টিকে'

চলেছি আর চলেছি। বেলা দুপুরে সূর্যের তাপ বেড়ে দুঃসহ হয়ে উঠলে এবং সন্ধ্যাকালে বনে-জঙ্গলে দুর্ভেদ্য অন্ধকার নেমে এলে সকলে মিলে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করি, তারপর আবার উঠে নিয়মিত যাত্রারম্ভ করি যখন ঊষাকালীন নীলাম্বরের পূর্বপ্রান্তে লাগে রক্তোৎপলের তাজা ছোপ।

জোফার ও মউ মউ বিদ্রোহীদের মাঝখানে পড়ে আমাদের পিষে মরবার কথা, কিন্তু বিমলের আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি কেবল যে সেই মারাত্মক দু-মুখো আক্রমণ ব্যর্থ করে আমাদের বিপদের সীমানার বাইরে নিয়ে এসেছে তা নয়; উপরন্তু রণদক্ষ প্রতিভাবান সেনাপতির মতো সমূহ বিপদকেও নিজেদের কাজে লাগিয়ে অমঙ্গলের ভিতরেই করেছে মঙ্গলের পত্তন—অর্থাৎ এক শত্রুর দ্বারা হয়েছে আর এক শত্রুর ধ্বংসসাধন!

তবু খুঁত খুঁত করতে থাকেন মঁসিয়ে রোলাঁ। বলেন, 'পাঁচশো বিদ্রোহীর সামনে জোফারের পঞ্চান্নজন লোক যে ঝড়ের মুখে খড়ের কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এত অল্পে কি বিদ্রোহীরা তুষ্ট হবে? তারা আমাদের খোঁজ পেয়েছে—শিকারের সন্ধান পেলে ক্ষুধার্ত সিংহ কি নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'জোফারও হয়তো মরেনি, জনকয় সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে এই বনেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে, সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাগাড় দেবে।'

কিন্তু এ-সব ভয়-ভাবনা সম্ভাবনার কথা বিমল শুনেও কানে তোলে না, তার সমস্ত মন এখন একাগ্র হয়ে আছে সেই অজানা, অদেখা, রহস্যময় মিকেনো পর্বতের দিকে।

রামহরির লোভ হিরার খনির প্রতি। রোলাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তিনিও ও-সম্বন্ধে খুব নির্লোভ নন—যদিও কেবল ধনকুবের হবার উদ্দেশ্য নিয়েই সাত সাগর তেরো নদীর পারে পাড়ি দেননি। আমাদের মতো তিনিও দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। তফাত খালি এই, আমাদের মতো তাঁরও জীবনযাত্রাপথে কাঞ্চনকৌলীন্য নগণ্য নয়!

হিরার খনি আবিষ্কার করবার কোনও আশাই আমরা রাখি না। আমরা এসেছি জীবনবৈচিত্র্য দেখতে এবং উপভোগ করতে দুঃসাহসের উত্তেজনায়! রক্ত ঠান্ডা রাখা আমরা পছন্দ করি না—সে যে জড়ভরতবৃত্তি! বলা বাহুল্য, মুখে যতই সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করুন, প্রাচীন বিনয়বাবুও হচ্ছেন আমাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত—দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনলেই তাঁরও চড়ুকে পিঠ সড় সড় করে!

দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যের জন্যে আমাদের একটা বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। মিকেনো পর্বতে গিয়ে পৌঁছবার পথ হয়ে উঠেছে দীর্ঘতর। আমাদের যাত্রা হবে বিলম্বিত। এবং এ পথ কেবল দুর্গম ও বিসর্পিত নয়, এর মধ্যে নাকি আরও নানা বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় হতে পারে! সাফারি বা কুলির দল এ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে অত্যন্ত নারাজ, সঙ্গে সশস্ত্র 'আস্কারি' না থাকলে তাদের বাগে আনা সহজ হত না। পাছে তারা চম্পট দেয় সেই ভয়ে কুলিদের আগে ও পিছনে এক এক দল সেপাই মোতায়েন রেখে তবে আমাদের পথ চলতে হচ্ছে।

অরণ্য ক্রমেই অধিকতর দুশ্চর হয়ে উঠছে। অবশেষে আমরা এমন নিবিড় বনে প্রবেশ করলুম যেখানে অরণ্য বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছ ডালপালা ও লতাপাতার জাল বিছিয়ে—আকাশ ও সূর্যালোককে একেবারে আড়াল করে রেখেছে। আমরা এসে পড়লুম যেন এক বিষণ্ণ কুজ্ঝটিকার জগতে, উপর থেকে ঝরছে আর্দ্রতা, পায়ের তলার মাটিও জলার মতো ভিজে স্যাঁৎসেতে। দিনের বেলাতেও চোখ বেশি দূর চলে না, ঘন বিন্যস্ত জঙ্গল পদে পদে ব্যাহত করে অগ্রগতি এবং মাঝে মাঝে সকলে মিলে অস্ত্র চালিয়ে ঝোপঝাপ কেটে পথ করে নিতে হয়। শুনলুম এই ভয়াবহ অরণ্য ভেদ করে বাইরে যেতে তিন দিন লাগবে।

সেই অপার্থিব ও অদ্ভুত বনভূমির ভিতরে একটা ছোটো নদীর ধারে প্রথম রাত কাটাবার জন্যে তাঁবু ফেলা হল। সেই নিরানন্দ জায়গায় নৃত্যশীলা তটিনী বা সুমধুর কলধ্বনি কেমন যেন খাপ খাচ্ছিল না। আসন্ন রাতের আবছায়া ভালো করে ঘনিয়ে উঠতে না উঠতেই অসংখ্য কীটপতঙ্গের আক্রমণে তাঁবুর ভিতরে পিঠটান দিতে হল। সেখানেও দলবদ্ধ মশকের বিক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রয় নিতে হল মশারির দুর্গে। বাঘা বেচারা পুঞ্জ পুঞ্জ মশা কপাকপ গিলে ফেলেও কিছুমাত্র সুবিধা করতে পারলে না।

তারপর সে কী গোলমেলে রাত্রি! সেই বিভীষণ জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার সংখ্যা বোধ করি কোটি কোটির কম হবে না। একসঙ্গে অত ঝিঁঝির কান-ঝালাপালা করা বেয়াড়া চ্যাঁচামেচি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তারপর চিত্তকে উচ্চকিত করে তুললে যেন ভূতুড়ে আঁতুড়ের অমানুষিক শিশুদের কান্নার মতো গেছো বাসায় শকুনবাচ্চাদের চিৎকার! প্যাঁচা ও অন্যান্য অজানা নিশাচর পাখিরাও চুপ করে ছিল না। এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা মেলাচ্ছিল আফ্রিকায় সুলভ বৃক্ষচর মণ্ডুকের দল।

শব্দময়ী রাত্রিও আমাদের শ্রান্ত দেহ-মনকে নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারলে না বটে, কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। আচম্বিতে বিষম ঘেউ ঘেউ চিল্লাচিল্লি শুনে জেগে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে টর্চের আলো ফেলে দেখি, বাঘা শিকল ছিঁড়বার জন্যে লাফালাফি করছে!

—'কী হল রে বাঘা, কী হল?'

বাঘা উৎকর্ণ হয়ে কী শুনলে, তারপরেই তাঁবুর বাইরে যাবার চেষ্টা করলে।

আমরা বন্দুক নিয়ে বাইরে গেলুম, কিন্তু দেখলুম কেবল এদিক-ওদিক আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে নিবাত-নিষ্কম্প অরণ্যানী যেন চিত্রার্পিত! চলন্ত বা নড়ন্ত কোনও কিছুই আকৃষ্ট করে না দৃষ্টি।

রোলাঁ বললেন, 'বাঘা অকারণেই আমাদের ঘুম ভাঙালে।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব। বিশেষ কারণ ছাড়া বাঘা কখনোই উত্তেজিত হয় না।'

বিমল বললে, 'আমিও এ কথায় সায় দি। বাঘার চিৎকারের পিছনে আছে নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণ।'

কিন্তু সেই বিশেষ কারণটা যে কী, আন্দাজ করা গেল না।

মশারির ভিতরে ঢুকলুম বটে, কিন্তু অস্বস্তির জন্যে চোখে এল না তন্দ্রার আমেজ। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এপাশ-ওপাশ করবার পর মনে হল নিদ্রাদেবী এইবারে বোধ হয় দয়া করবেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁবুর বাইরে শোনা গেল মাটি থরথরিয়ে ধুপ ধুপ করে অনেকগুলো ভারী ভারী পায়ের শব্দ! ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ!

গাত্রোত্থান করে দেখি, বাঘাও কান খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এবারে আর চিৎকার করছে না; বিপুল বিস্ময়ে শূন্যে মুখ তুলে যেন সে কোনও বিজাতীয় গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করছে!

সকলে একজোট হয়ে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালুম—সেই ধুপধুপনি শব্দ প্রত্যেকেরই কানে গিয়েছে।

কয়েকটা টর্চের দীর্ঘ শিখা বিদ্যুৎতীব্র অস্ত্রের মতো ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলে জঙ্গলের নিরবচ্ছিন্ন প্রগাঢ় অন্ধকার।

মনে হল কতকগুলো বড়ো জাতের ষাঁড় ধূসর ও ধুমসো দেহ দুলিয়ে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে!

রামহরি আশ্চর্য স্বরে বললে, 'ও বাবা, ওগুলো কী জানোয়ার গো!'

রোলাঁ বললেন, 'বামন-হাতি!'

কমল বললে, 'একসঙ্গে অতগুলো হাতি বামন?'

—'হ্যাঁ, ওরা জাত-কে-জাত বামন। এখানকার কোনও হাতিই ভাগলপুরি ষাঁড়ের চেয়ে বড়ো হয় না।'

—'আশ্চর্য!'

—'কেবল হাতি নয়, এ মুল্লুকে বামন-হিপো, বামন-মহিষও পাওয়া যায়।'

—'ভারী আজব দেশ তো।'

—'কুমারবাবু, আপনার বাঘা বোধ হয় এই বামন হাতিদের সাড়া পেয়েই অত গোলমাল করছিল।'

বললুম, 'না। বাঘার ধরন-ধারণ আমি জানি। হাতিদের অস্তিত্ব টের পেয়ে সে বিস্মিত হয়েছিল বটে, কিন্তু গর্জন বা চিৎকার করেনি।'

—'ব্যাপারটা তাহলে রহস্যময়!'

কিন্তু রহস্যভেদ হতে দেরি লাগল না।

সেই অসূর্যম্পশ্যা বনভূমির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে পরদিনেও এল সন্ধ্যা, এল রাত্রি। পড়ল তাঁবু। রজনী হল শব্দময়ী। আশ্রয় নিলুম বিছানায়। ঝর ঝর করে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জল-ঝরার টুপটাপ শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে এল তন্দ্রায়।

তারপর হল আবার গতকল্যকার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

আবার বাঘার উভরায় গর্জন, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ, শয্যাত্যাগ, তাঁবুর বাইরে আগমন।

কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ! সেই অন্ধকারে অন্তর্লীন জঙ্গলের দঙ্গল, তার মধ্যে কোথাও নেই জনপ্রাণী! আমরা অবাক!

এবারে রোলাঁর দৃঢ় ধারণা হল, খামোকা চ্যাঁচামেচির দ্বারা রাত্রির শান্তি ভঙ্গ করাই হচ্ছে বাঘার স্বভাব।

কিন্তু পরদিন প্রভাতেই রোলাঁকে মত পরিবর্তন করতে হল।

তাঁবুর বাইরে কালকের বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট কাদার প্রলেপের উপরে পদচিহ্নের পর পদচিহ্ন! একজনের নয়, কয়েকজনের পায়ের দাগ! পা টিপে টিপে তারা এসেছিল, কিন্তু বাঘার কানকে ফাঁকি দিতে পারেনি!

এই আড়ি-পাতুনিয়ারা কারা?

বিমল বললে, 'কুমার, পদচিহ্নগুলোর একটা বিশেষত্ব লক্ষ করেছ?'

বললুম, 'হ্যাঁ। যারা এসেছিল তারা বালক। বয়সে নয়-দশ বছরের বেশি নয়।'

—'আশ্চর্য!'

—'অত্যন্ত!'

—'এই গহন বনে, চির-অন্ধকারের দেশে, নিশুতি রাতে, হিংস্র জন্তুর আস্তানায় একদল বালক এসেছিল আমাদের খবরাখবর নিতে? না কুমার, এ যুক্তি মনে লাগে না!'

উদ্ভট, অতিশয় উদ্ভট! কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণকেও তো অস্বীকার করা চলে না!

বিনয়বাবু বললেন, 'আরও একটা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, যেখানে শত্রুমিত্র বা জনমানবের সাড়া নেই, সেখানে আমাদের খবর নিতে আসে কারা? লুকিয়ে আসে কেন? দেখা না দিয়ে পালায় কেন?'

রামহরি এককথায় সব সমস্যার সমাধান করে দিলে। বললে, 'ভূত!'

কমল হাসি চেপে বললে, 'ভূত! ভূতরা ভিতু নয়, তারা পালায় না, দেখা দেওয়াই তাদের পেশা!'

রোলাঁ নিম্নস্বরে কামাথির সঙ্গে কথা কইছিলেন। এখন আমাদের কাছে এসে বললেন, 'কামাথি কী বলে জানেন?'

—'কী বলে?'

—'এখানে আড়ি পাততে এসেছিল মউ মউ বিদ্রোহীদের চর।'

—'বালক চর!'

—'না, নারী চর!'

—'কী বলছেন!'

—'নারীদের পায়ের দাগ ছোটো হয়।'

—'জানি। কিন্তু এখানে নারীর উপস্থিতি আরও অসম্ভব। বিদ্রোহীদের দলে কি পুরুষ নেই?'

—'পুরুষ আছে, নারীও আছে।'

— [illegible]নে?'

—'কামাথি বলে, বিদ্রোহীরা জনকয় নারীকেও দলে নিয়েছে। তারা চরের কাজ করে, দরকার হলে অস্ত্র চালাতেও পারে। তাদের হাতে থাকে 'সিমি'। কিকিয়ুরা 'সিমি' বলে একরকম দু-মুখো তরবারিকে, লম্বায় প্রায় এক হাত।'

বিমল সকৌতুকে বলে উঠল, 'ভাই কুমার, এ-সব শুনছি কী? শেষটা কি নারীর সঙ্গে হাতাহাতি করতে হবে?'

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, 'যুগমাহাত্ম্য ভায়া, যুগমাহাত্ম্য! আধুনিক নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকায় চায়!'

কমল বললে 'পৌরাণিক যুগেও নারীরা পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করত। প্রমাণ—'

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো জ্যাঠা ছেলে কোথাকার!'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, কামাথির সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত নয়। মউ মউ বিদ্রোহীরা সংখ্যায় নাকি পাঁচশো। আমাদের মুষ্টিমেয় দলকে যমালয়ে পাঠাতে চাইলে তারা চোরের মতো চর পাঠাত না, ডাকাতের মতো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তবে কি জোফার সদলবলে পঞ্চত্বলাভ করেনি, জনকয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে লম্বা দিতে পেরেছে?'

—'কিন্তু জোফার এতগুলো বালক আমদানি করবে কোত্থেকে?'

—'তাও তো বটে!'

আচমকা শূন্যপথ দিয়ে একঝাঁক তির এসে টপাটপ করে পড়ল মাটির উপরে—কিন্তু কোনওটাই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে না!

বিমল চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি! সবাই তাঁবুর আড়ালে গা-ঢাকা দাও!'

খানিক দূরে ছিল কতকগুলো ঝোপঝাপ। তিরগুলো এসেছিল সেই দিক থেকে।

আমরা উপর-উপরি দুইবার সেইদিকে গুলিবৃষ্টি করলুম। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা মানুষের আর্তনাদ এবং দেখা গেল, ঝোপের পর ঝোপ দুলিয়ে কারা যেন লুকিয়ে দূরে—আরও দূরে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে!

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরেও আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। জঙ্গল আবার নিথর ও নীরব।

কিন্তু কারা এই অদৃশ্য শত্রু?

আমরা আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তিরগুলো একে একে কুড়িয়ে নিলুম।

অদ্ভুত তির!

প্রত্যেকটাই যেন ছেলেখেলার তির! —তির তো ভারী, শক্ত কাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়, কাঠির ডগাটা ছুঁচলো করে নেওয়া হয়েছে মাত্র, লোহা বা অন্য কোনও ধাতু দিয়ে ফলা তৈরি করা হয়নি। তিরের পিছনে পালকও নেই, কাঠির গোড়ার দিকটা চিরে নিয়ে গাছের একখানা পাতা গুঁজে দেওয়া হয়েছে, বাতাস কাটবার সুবিধা হবে বলে। এমন আজব তির কখনও দেখিনি।

হঠাৎ কামাথি বলে উঠল, 'টিকে টিকে, টিকে টিকে!'

রোলাঁ বললেন, 'কী বললে কামাথি? টিকে টিকে? ঠিক ঠিক! আমি নির্বোধ, এতক্ষণ ধরতে পারিনি! টিকে-টিকেই বটে, ঠিক, ঠিক!'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললুম—'মঁসিয়ে রোলাঁ, টিকে টিকে ব্যাপারটা কী বলুন দেখি?'

—'মউ মউ বিদ্রোহীদের ভয়ে আমার ভীমরতি ধরেছিল, এখন তিরগুলো দেখে সব বোঝা যাচ্ছে!'

কামাথি আবার বললে, 'টিকে টিকে!'

রামহরি ভুরু কুঁচকে বললে, 'আরে গেল, খালি খালি বলে টিকে টিকে! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে না আছে হুঁকো, না আছে তামাক, খামোকা টিকে টিকে করা কেন বাপু?'

রোলাঁ বললেন, 'টিকে টিকেরাই এ-রকম তির ব্যবহার করে থাকে।'

আমি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু টিকে টিকেরা আবার কারা?'

—'বামন-মানুষরা।'

—'বামন-মানুষ?'

—'হ্যাঁ। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, বামন-হাতি, বামন-হিপো, বামন-মহিষের সঙ্গে এ অঞ্চলে বামন-মানুষরাও বাস করে। মাথায় তারা বালকের মতোই—সাধারণত সাড়ে তিন থেকে চার ফুটের বেশি উঁচু হয় না। তাদের মধ্যে যাদের বলা চলে অতিকায়, তারাও উঁচু হয় বড়ো জোর সাড়ে-চার ফুট।'

কমল বললে, 'ওহো, কী মজা। গলিভার সাহেব গিয়েছিলেন লিলিপুটে, যেখানকার মানুষ বালখিল্যদের মতো খুদে খুদে। আর আমরা এসেছি বামনদের দেশে—এখানে মানুষ আর জন্তু কেউ মাথায় বাড়ে না!'

—'মাথাতেও না, গায়েও না। এখানকার মানুষ মোটা হয় না, ওজনেও ত্রিশ সেরের মধ্যে!'

—'আপনার মতে, ওই টিকে টিকেদেরই পায়ের দাগ আমরা দেখেছি?'

—'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কামাথি নিজের ভাষায় ওদের টিকে টিকে বলছে বটে, কিন্তু ওদের মধ্যেও নানান জাত আছে—যেমন 'আক্কা' আর 'বাতোয়া' প্রভৃতি। ওরা যাযাবর। এক জায়গায় স্থায়ী বাসা বাঁধে না, শিকার করে খায়, এক বনে শিকারের অভাব হলে অন্য বনে যায়। শোয় আদুড় মাটিতে—ঘটি-বটি-গেলাস-থালার ধার ধারে না, যাকে বলে নিছক বন্য জীবন!'

কমল বললে, 'ভাগ্যিস এই বামনের দেশে জন্মাইনি!'

—'হ্যাঁ, তাহলে আমরাও বামন হতুম। সূর্যালোক হচ্ছে প্রকৃতির আশীর্বাদ, তার অভাবে কোনও জীব—এমনকি গাছপালা পর্যন্ত আকারে বাড়তে পারে না। আজ দু-দিন আমরা এই গহন বনের মধ্যে রোদ বা আকাশের আলোর বদলে দেখছি কেবল দিনে আবছায়া আর রাতে অন্ধকার! এর মধ্যে আমাদেরই প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।'

বিমল বললে, 'বামনগুলো ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু বন্দুক ছোড়বার পর একটা বিকট আর্তনাদ শুনেছি। মনে হচ্ছে বামন-তিরন্দাজদের কেউ আহত বা নিহত হয়েছে। এসো কুমার, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।'

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু খুব সাবধান, এখানে আগে থাকতে মৃত্যুর পদশব্দ শোনা যায় না। কামাথি বলছে, টিকে টিকেদের তির দেখতে ছোটো বটে, কিন্তু তার ডগায় মাখানো থাকে বিষ!'

বিমল বললে, 'তাই নাকি! আয় রে বাঘা, তুইও আয়! টিকে টিকেরা যতই লুকিয়ে থাকুক, নিজেদের গায়ের বুনো গন্ধ তো লুকিয়ে রাখতে পারবে না, বাঘার সূক্ষ্ম, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঠিক তা আবিষ্কার করে ফেলবে!'

বিশেষ সন্তর্পণে আমরা সম্মুখবর্তী অরণ্যের দিকে অগ্রসর হলুম। সেদিকটা হচ্ছে আবছায়ামাখা সূর্যকরহারা জঙ্গলের মধ্যেই অধিকতর নিবিড় আর একটা অরণ্য, সেখানকার ঘনান্ধকারে দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যেতে চায়! পা চলতে চলতে থেমে যায়, বুক চমকে চমকে ওঠে, বদ্ধ আবহের মধ্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে! বাতাসের অভাবে গাছপালা লতাপাতা সব যেন আড়ষ্ট। চারিদিকে গহীন বিজনতা এমন থম থম করছে যে, মনের মধ্যে সৃষ্ট হয় একটা অপার্থিব পরিস্থিতি!

হঠাৎ বাঘা কান খাড়া করে মুখ তুলে চাপা গর্জন করে উঠল! নিশ্চয় শত্রুর গন্ধ পেয়েছে!

তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলুম দিকে দিকে। অদৃশ্য শত্রু! বিষাক্ত তির!

কিন্তু মৃত্যুর ইঙ্গিতে ভয়াবহ সেই ছায়াধূসর নিঃশব্দ বনানী নিজের জঠরের গভীরতার মধ্যে কোথায় যে গোপন করে রেখেছে ছায়াচর শত্রুদের, বাহির থেকে বুঝতে পারা অসম্ভব!

এখানে গলা তুলে কথা কইতেও আতঙ্ক হয়! রোলাঁ ফিস ফিস করে বললেন, 'বিমলবাবু, ফিরে চলুন।'

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। বাঘার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

বাঘা তখন মাটির উপরে নাক রেখে একদিকে অগ্রসর হয়েছে নিশ্চিত পদে।

আমি সাগ্রহে বললুম, 'বাঘা শত্রুর নাগাল ধরতে পেরেছে, চোখের সাহায্যে যে দুশমনকে দেখা যায় না, বাঘা নাকের সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়বে না!'

বাঘা যাচ্ছিল সকলের আগে আগে। আগাছার ভিতরে জেগে আছে খালি তার মাথা আর উর্ধ্বোত্থিত লাঙুলের অগ্রভাগ। তার সামনেই একটা বড়ো, ঝুপসি কাঁটাঝোপ। সেটা পেরিয়ে গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার সেই উর্ধ্বকর্ণ, চমকিত ও হঠাৎ-আড়ষ্ট ভাব দেখলেই আন্দাজ করা যায়, এমন একটা কিছু সে দেখেছে, যা সাধারণ নয়!

বাঘার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমরাও যা দেখলুম তা হচ্ছে এই :

একজন প্রৌঢ়বয়স্ক লোকের বালকের মতো ছোটো মৃতদেহ সেখানে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। মাথায় চার ফুট লম্বা হবে কি না সন্দেহ! তার মুখ প্রায় নিগ্রোর মতো দেখতে, কিন্তু গায়ের রং হরিদ্রাভ তামাটে। বামহাতের মুঠোয় খেলনার মতো পুঁচকে ধনুক এবং দেহের পাশে মাটির উপরে চামড়ার তূণীর। দেহ প্রায়-নগ্ন, কেবল কোমরে ঝুলছে এক টুকরো চামড়ার প্রচ্ছাদনী।

কামাথি বললে, 'টিকে টিকে!'

রোলাঁ বললেন, 'বামন-মানুষ!'

বিনয়বাবু বললেন, 'সিংহল দ্বীপেও 'বেদা' বলে এইরকম আদিবাসী আছে। তারাও বনে বনে বেড়ায়, শিকার করে খায়।'

রোলাঁ বললেন, 'দেখেছি। কিন্তু তারাও এতটা খর্বকায় নয়।'

পরদিনও কাটল সেই চিরছায়াছন্ন বন্য দুঃস্বপ্ন-জগতে, কিন্তু বামন মানুষদের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে ও বর্ষণে তাদের পিলে বোধহয় চমকে গিয়েছে!

তারপর সেই সুদূরবিস্তৃত অরণ্যানীর বিশাল কুক্ষি থেকে নির্গত হয়ে পেলুম ভগবানের অতুল্য দাক্ষিণ্য—অমৃতায়মান সূর্যকরধারা! আঃ, আলো কী চমৎকার!

॥ দশম পর্ব ॥

সিন্ধাদের স্বর্গে

বনবাস থেকে রেহাই পেয়ে আমাদের যে আনন্দ, বাঘাও তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করতে ছাড়লে না, অন্ধকার থেকে আলোকে এসে চারিদিকে বেগে ছুটোছুটি, লাফালাফি ও চ্যাঁচামেচি করে প্রকাশ করতে লাগল নিজের প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগকে।

আমাদেরও পা না ছুটলেও পুলকিত মন শতদলের মতো পাপড়ি মেলে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে—অবারিত আকাশের নীলিমায়, সোনালি রোদের উদারতায়, এবং বাঁধনহারা বাতাসের স্বাধীনতায়।

এখানেও অরণ্যের অভাব নেই, কিন্তু তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। কোথাও অরণ্য, কোথাও প্রান্তর, কোথাও পর্বত, কোথাও প্রপাত, কোথাও নদী। প্রকৃতি যে কত বিচিত্র রূপিনী, চলতে চলতে চোখে পড়ে তারই অফুরন্ত দৃষ্টান্ত।

কখনও দেখা যায় 'কুডু' কি 'ইল্যান্ড' কি কতকটা কৃষ্ণ ষাঁড়ের মতো দেখতে 'নিউ' জাতীয় হরিণের দল (তাদের মাথায় মহিষের মতো শিং, ল্যাজ ঘোড়ার মতো এবং পা মৃগের মতো—তারা অতিশয় হিংস্র) মানুষের সাড়া পেয়ে দূর থেকেই ধুলো উড়িয়ে সরে পড়ে; কোথাও দেখি একপাল হৃষ্টপুষ্ট জেব্রা আপন মনে তৃণভূমির উপরে বিচরণ করছে; কোথাও 'ওয়ার্ট-হগ' নামে আফ্রিকাদেশীয় বরাহদল আমাদের দেখেই ঘোঁত ঘোঁত করে ঝোপেঝাপে ঢুকে যায়; কোথাও বা নদীর মাঝখানে ভেসে ওঠে বা ডুব মারে কুমির আর হিপোপটেমাস। এক জায়গায় ঝোপের ওপাশ থেকে লম্বা গলা তুলে উঁকি মারলে একটা জিরাফ। আর এক জায়গায় দেখা গেল গাছের ডালে জড়ানো রয়েছে মস্তমোটা কাছি—আসলে সেটা পাইথন বা অজগর!

হঠাৎ আঙুল তুলে একদিক দেখিয়ে দিয়ে কমল চোখ পাখিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন মি. রোলাঁ! ওটা আবার কী জানোয়ার? গাধা, না বামন-জিরাফ?'

জন্তুটা মাথায় হবে আন্দাজ পাঁচ ফুট উঁচু; অসাধারণ দ্রুতগতিতে একটা বড়ো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোলাঁ বললেন, 'ওর নাম ওক্যাপি। ওকে দেখতে ক্ষুদ্র সংস্করণের জিরাফের মতোই বটে! কিন্তু জিরাফ হচ্ছে বোবা জীব, আর ওক্যাপি গলাবাজির জন্যে বিখ্যাত। ও জীবটি বড়োই দুর্লভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও ওর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু একালে আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও ওক্যাপি দেখতে পাওয়া যায় না!'

কমল খুশিমুখে বলে, 'হ্যাঁ, এইবারে কতকটা মনে হচ্ছে আমরা সত্যসত্যই আফ্রিকায় এসে পড়েছি!'

চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত প্রাণে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কামাথি এসে সতর্ক করে জানিয়ে দিয়ে গেল, এখানটা হচ্ছে 'সিম্বা'দের নিজস্ব চারণভূমি। এদেশি ভাষায় 'সিম্বা' বলতে বুঝায় সিংহ!

প্রথম দিন সন্ধ্যার আগে পশুরাজের লাঙুল পর্যন্ত দেখা গেল না বটে, কিন্তু গভীর রাত্রে তাদের ভৈরব কণ্ঠসাধনায় নিদ্রাদেবী সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। মনে হল, রাজ্যের সিংহ যেন সেখানে এসে দলবদ্ধ হয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সমস্বরে। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র শোনা গেল মুহুর্মুহু সিংহগর্জন—এত সিংহকে একসঙ্গে ডাকাডাকি করতে শুনিনি আর কোথাও আর কখনও! চূর্ণ হয়ে গেল রাত্রির স্তব্ধতা, থর থর করে ভয়ে কাঁপতে লাগল যেন বনজঙ্গল!

বন্দুকটা আরও কাছে টেনে নিলুম বটে, কিন্তু নিজেদের একান্ত অসহায় বলেই মনে হতে লাগল! সিংহরা হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েছে, এতগুলো হিংস্র ক্ষুধিত ও দুরন্ত সিংহ যদি এক জোট হয়ে নড়বড়ে তাঁবুর উপরে এসে হানা দেয়, আমাদের বন্দুক তাহলে কিছুতেই তাদের ঠেকাতে পারবে না!

মাঝে মাঝে তাদের প্রচণ্ড প্রশ্বাসে তাঁবুর কানাত ওঠে দুলে দুলে, তারপরে খুব কাছ থেকেই ঘন ঘন সিংহনাদ! বুঝতে পারি, তাদের আনাগোনার জন্যে নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক উৎপাতের মতো আমাদের তাঁবুগুলোর অভাবিত আবির্ভাব দেখে সিংহেরা সবিস্ময়ে নির্ণয় করতে এসেছে প্রকৃত তথ্য!

রোলাঁ আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সিংহেরা যতক্ষণ গলাবাজি করে, ততক্ষণ সবাই নিরাপদ। তারা শিকার ধরে চুপিসাড়ে!'

রাত্রি যত শেষের দিকে এগিয়ে চলল, মেঘ গর্জনের মতো সিংহনাদ ততই দূরে সরে গিয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে! তার খানিকক্ষণ পরেই শোনা গেল, আসন্ন প্রভাতি উৎসবে বিহঙ্গদের কনসার্ট! আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, তাঁবুর চারিপাশ ঘিরে সিংহদের থাবার দাগ! তারা যথাস্থানে এসেছে, কিন্তু মানুষের গন্ধ পেয়েও আক্রমণ করেনি! এর একমাত্র কারণ বোধহয় তাদের জঠরানল ছিল নির্বাপিত!

প্যাটারসন সাহেবের 'ম্যান ইটার্স অফ স্যাভো'* নামে বিখ্যাত শিকারের কেতাবে পাঠ করেছি, যখন ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকা রেলওয়ে-র জন্যে লাইন পাতা হয়, তখন শত শত ভারতীয় কুলি সেখানে কাজ করত; কিন্তু অভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ শিকারিদের বহু সাবধানতা ও বিনিদ্র প্রহরা সত্ত্বেও সিংহরা প্রতিদিন নিঃশব্দে এসে তাঁবুর ভিতর থেকে ঘুমন্ত কুলিদের মুখে করে তুলে নিয়ে যেত!

একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। প্রান্তরের সুদূর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণি, মাঝে মাঝে তরুকুঞ্জ এবং ছোটো ছোটো গাছগাছড়ার ঝাড়—এদেশি ভাষায় যাদের বলে 'বোমা'। তা ছাড়া দিকে দিকে পড়ে আছে কেবল উন্মুক্ত তৃণভূমি—যেখানে হরিণ চরে, জেব্রা বেড়ায় এবং আরও যারা বিচরণ করে, একদিন হঠাৎ তারা অযাচিতভাবেই দেখা দিলে!

দুই ধারে খোলা মাঠ, মাঝখানে উঁচু পথ দিয়ে চলেছি আমরা।

হঠাৎ বিমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'কমল, তুমি না আফ্রিকার স্বাধীন সিংহ দেখতে চাও?'

—'নিশ্চয়!'

—'ওই দ্যাখো!'

বিমল একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে। দেখেই আমার চক্ষু হয়ে উঠল উচ্চকিত। হ্যাঁ,

---

*'মানুষের গন্ধ পাই' নামে বাংলায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দ্বারা অনূদিত হয়েছে।

তাই তো বটে! একটা নয়, দুটো নয়, অনেকগুলো! সিংহ, সিংহিনী এবং তাদের কাচ্চাবাচ্চা! নিশ্চয়ই তারা এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ আমি গুনে দেখলুম, সংখ্যায় তারা মোট সাতাশটা! আজ কি এখানে সিংহদের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান?

ত্রস্তভাবে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলুম।

রোলাঁ বললেন, 'কেউ যেন বন্দুক না ছোড়ে! সিংহরা বাঘের মতো হিংস্র নয়, ক্ষুধার্ত না হলে ওরা আক্রমণ করে না—ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই!'

সত্য, সিংহগুলোর পেটে ক্ষুধা আছে বলে মনে হল না! তাদের কেউ চার পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কেউ মাটির উপরে চিত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ থেবড়ি খেয়ে বসে অবসাদগ্রস্তের মতো হাই তুলছে এবং একটা 'বোমা'-র ওপাশ থেকে মুখ তুলে কয়েকটা সিংহ নিশ্চিন্তভাবেই আমাদের পানে তাকিয়ে রয়েছে! গোটা চার সিংহশিশু মায়ের সামনে ঠিক কুকুর-বিড়ালের ছানার মতোই পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে।

কেবল একটা জোয়ান সিংহ কতকটা কৌতূহল প্রকাশ করলে। আমাদের হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে সে হন হন করে বেশ খানিকটা এগিয়ে এল, যেন কতকগুলো বাজে, দ্বিপদ জীবের অতর্কিত আবির্ভাবে তার মেজাজ রীতিমতো গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দুই চক্ষে স্পষ্ট জিজ্ঞাসার ভাষা—যেন সে শুধোতে চায়, 'তোমরা কে বট হে? কোত্থেকে এলে? কী মতলবে এলে?'

বিনয়বাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে দ্যাখো! তাহলে সিংহরাও গাছে চড়ে!'

তাই তো! 'বোমা'-র পিছনে রয়েছে একটা মস্ত অশ্বত্থ-বটের মতো দেখতে গাছ। তারই একটা একতলা-সমান উঁচু মোটা ডাল জড়িয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আলস্যজড়িত চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করছে আর-একটা ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড সিংহ!

কমলের দেহ তখন মূর্তির মতো স্থির, চক্ষু, নিষ্পলক, হতভম্ব মুখে নেই রা! স্বাধীন, বন্য সিংহের এতটা পোষমানা ভাব সে বোধ হয় কখনও কল্পনা করতে পারেনি!

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু এই সিংহই রাগলে হয় মহাভয়ংকর! তখন সময়ে সময়ে আট-দশ জন শিকারিও বন্দুক নিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। বিশ্ববিখ্যাত মার্টিন জনসনের এক শিকার কাহিনিতে দেখা যায়, দলবদ্ধ শিকারিদের দ্বারা চারিদিক থেকে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হয়েও একটা সিংহ কয়েকজন শত্রুকে আহত ও নিহত করে এবং অবশেষে মারা পড়ে পঁচিশটা বুলেটের আঘাত পাবার পর! এক সিংহেই রক্ষা নেই, আর এখানে আছে সাতাশটা সিংহ!'

সিংহদের আখড়া থেকে নিরাপদ ব্যবধানে যাবার জন্যে যতটা পারি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। তারপর মাইল-দুয়েক এগিয়ে যাবার পরই দেখলুম আর এক অচিন্তিত দৃশ্য!

মাঠের উপরে পড়ে রয়েছে একটা জেব্রার সদ্যমৃত রক্তাক্ত দেহ এবং একটা সিংহ তার পেট চিরে ফেলে তারই ফাঁকে সমস্ত মুখখানা ঢুকিয়ে দিয়ে মাংস ভক্ষণ করছে। ছয়-সাত হাত তফাতে চুপ করে বসে বসে তার খাওয়া দেখছে একটা সিংহী—সে বোধ হয় বউ,

স্বামী প্রভুর ভোজন-কাণ্ড শেষ হবার পর সে-ও নিজের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে, নইলে বেয়াদপির জন্যে নখের ভীষণ চপেটাঘাত খাবার সম্ভাবনা!

আরও দূরে থেকে সন্তর্পণে পশুরাজের আহারের সমারোহ নিরীক্ষণ করছে গোটাকয়েক সেয়ানা হায়েনা। সিংহ ও সিংহী পরিতৃপ্ত হয়ে বিদায় নিলে পর তাদের ভোজনাবশেষ নিয়ে কামড়া-কামড়ি করবার পালা আসবে হায়েনাদের!

সিংহী একবার মুখ তুলে আমাদের দেখলে, তারপর আবার অবহেলাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে। জ্যান্ত দ্বিপদ জীবের চেয়ে মৃত চতুষ্পদের খণ্ডিত দেহটাই তার কাছে মনে হল অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

সিংহও আমাদের সাড়া পেয়ে জেব্রার ছিন্নভিন্ন উদরগহ্বর থেকে নিজের রক্তকরাল মুখখানা বার করে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'গর্‌র্‌র্‌র্‌!' (অর্থ বোধ করি—'খবরদার, কাছে এলে মজাটা টের পাবে!') তারপর আবার মাথাটা ঢুকিয়ে দিলে জেব্রার ফেঁড়ে-ফেলা পেটের গর্তে।

রোলাঁ বললেন, 'সিংহদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হচ্ছে জেব্রার মাংস। তাই যেখানে জেব্রা, সেইখানেই থাকে সিংহ।'

প্রান্তরের প্রান্তে যাবার আগেই আবার আর একদল সিংহের সঙ্গে মূলাকাত হল। সংখ্যায় এক ডজন। সার বেঁধে তারা যাচ্ছিল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, এবং যেতে যেতে মাঝপথে মানুষের আবির্ভাবে প্রত্যেকেই একবার করে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে, কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না।

কমল অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাবা, এযে সিংহদের স্বর্গ!'

রোলাঁ বললেন, 'এই আফ্রিকা! আর সিংহ হচ্ছে তার প্রধান গৌরব!'

আমি বললুম, 'একসময়ে ভারতবর্ষও এই গৌরব করতে পারত। সিংহকে আমরা 'পশুরাজ' উপাধি দিয়েছিলুম, আর আদ্যাশক্তির বাহন রূপে নির্বাচন করেছিলুম তাকেই। আজ আর সেদিন নেই। ভারতের সিংহ আজ কোণঠাসা, নামরক্ষার জন্যে কোনওরকম টিকে আছে মাত্র।'

বিমল বললে, 'এর কারণ মানুষের অত্যাচার। মানুষ সিংহ আর ব্যাঘ্রকে হিংস্র বলে অভিযোগ করে বটে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব লোপ করবার জন্যে মানুষ যে চেষ্টা করেছে তার তুলনাই নেই। এই আফ্রিকাও সিংহদের নিয়ে বেশিদিন আর গৌরব করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আজ তো আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমায় মানুষ হয়েছে বলীয়ান। কিন্তু যখন আগ্নেয়াস্ত্রের চলন হয়নি, সেই হাজার হাজার বৎসর আগেও মানুষ বুদ্ধিবলে আফ্রিকার অসংখ্য সিংহ বন্দি করে চালান দিত ইউরোপে। যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার আগেও রোমের বিভিন্ন সম্রাট যে কত হাজার সিংহ বন্দি করেছিলেন তার কোনও হিসাব নেই। খেলা দেখবার জন্যে পম্পি, জুলিয়াস সিজার আর অক্টোভিয়াস আগস্টাস যথাক্রমে ছয় শত, চার শত আর আড়াই শত সিংহকে ধরে রেখেছিলেন।'

রোলাঁ বললেন, 'বুঝুন তাহলে ব্যাপারটা! যুগ যুগ ধরে সিংহদের বধ আর বন্দি করা হচ্ছে, কাজেই আফ্রিকার ভাণ্ডার ক্রমেই খালি হয়ে আসছে। এর মধ্যেই আফ্রিকার কোনও কোনও সিংহপ্রধান অঞ্চল একেবারেই সিংহশূন্য হয়ে গিয়েছে।'

পথ চলতে চলতেই এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। সকলে তখন প্রান্তর-প্রান্তের একটা তরুকুঞ্জের কাছে এসে পড়েছিল।

সহসা আঙুল তুলে কমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন!'

দেখা গেল, কয়েকটা মস্ত মস্ত বানর একটা উঁচু গাছের ডালে ডালে বসে সাগ্রহে পথিকদের লক্ষ করছে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বুঝেই তারা লম্বা লম্বা লাফ মেরে গাছের ঘন পাতার অন্তরালে একেবারে গা ঢাকা দিলে।

রোলাঁ বললেন, 'শিম্পাঞ্জি!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল, আকার হিসাবে বনমানুষ জাতীয় লাঙুলহীন বানর গরিলা ও ওরাংউটানের পরেই হচ্ছে শিম্পাঞ্জিদের স্থান। মাথায় এরা চার ফুটের চেয়ে কম উঁচু হয় না। এরা সহজেই পোষ মানে আর সব কাজেই মানুষের নকল করতে ভালোবাসে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাঞ্জি সিগারেট টানতেও শিখেছিল। গরিলার মতো শিম্পাঞ্জিরও জন্মভূমি হচ্ছে এই আফ্রিকা। গায়ের জোরে শিম্পাজিকে মানুষ বশ করতে পারে না, রাগলে সে হয় বিপজ্জনক।'

—'আর গরিলা?'

—'একটা গরিলা ছয়জন মানুষের মতো শক্তিশালী।'

—'গরিলাদের দেশ আরও কত দূরে?'

রোলাঁ বললেন, 'আমরা তার কাছেই এসে পড়েছি।'

॥ একাদশ পর্ব ॥

হাইর‍্যাক্স, ব্যাসেঞ্জি ও কামা মুনটু

ওই মিকেনো! উচ্ছ্রিত, উদ্ধত, জলদজালজড়িত! বিস্ময়কর, ভীতিকর, প্রীতিকর! যথাস্থানে পৌঁছেছি।

হ্যাঁ, চোখের সামনে দৃষ্টিসীমা জুড়ে বিরাজ করছে অভ্রভেদী মিকেনো পর্বতের দিগন্তব্যাপী বিরাট দেহ। মিকেনো হচ্ছে মরা 'ভলকেনো'—আগে করত ঝলকে ঝলকে অগ্নিপ্রসব। তার শুভ্র তুষার-শিখর সমুদ্রতল থেকে চৌদ্দ হাজার চারশো বিশ ফুট ঊর্ধ্বে উঠে সদর্পে স্পর্শ করতে চায় যেন গগনের সুদূর নীলিমাকে! মিকেনোর শিখরের অনেক নীচে দিয়ে অচলতার পটভূমিকায় গতির আলপনা আঁকতে আঁকতে এবং শূন্যপথে অস্থায়ী ও বিচিত্র সব কাল্পনিক মূর্তি গড়তে গড়তে ভেসে আর ভেসে যাচ্ছে মেঘপুঞ্জের পর মেঘপুঞ্জ—তাদের ভেসে যাওয়ার আর ভাঙাগড়ার অন্ত নেই!

আপাতত শিবির সন্নিবেশ করা হয়েছে মিকেনোর পায়ের তলায় জঙ্গালাকীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে এসেই পড়েছি দুরন্ত বর্ষার কবলে। তিন দিন তিন রাত ধরে অবিরত অঝোরে ঝরছে বৃষ্টিধারা, মাঠ-ঘাট জলে জলে জলময়, দিনের বেলাতেও আরণ্য তিমির মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে পিছনে-ফেলে-আসা বামন-অধ্যুষিত জঙ্গলের অপ্রীতিকর স্মৃতি!

গতকল্য রাত্রে বারংবার হতে হয়েছে জ্বালাতন।

একে তো উটকো জায়গা, মশা ও হরেকরকম পতঙ্গের অত্যাচার, আর চিতাবাঘের উৎপাত; তার উপরে এখানে আবার আর এক নতুন উপসর্গের সাড়া পাওয়া গেল। জনৈক কুলি ঘুটঘুটে অন্ধকারে এ তাঁবু থেকে ও তাঁবুতে যাবার জন্যে লণ্ঠন হাতে করে বাইরে বেরিয়েছিল। ব্যাস, আর যায় কোথা। ঠিক যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগল! সেখানে কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল একদল গেছো 'হাইর‍্যাক্স', আলো দেখেই তারা সকলে মিলে সমস্বরে জুড়ে দিলে তুমুল আর্ত চিৎকার! তেমন উদ্ভট ও অবর্ণনীয় চিৎকার আমি আর শুনিনি এবং তাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দিলে হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকা আর ভেক—সেই বিকট শব্দতরঙ্গে নিদ্রার কথাও হয়ে উঠেছিল অচিন্তনীয়! ...গেছো হাইর‍্যাক্স হচ্ছে আফ্রিকার আর এক বিশেষত্ব, একরকম শশকজাতীয় জীব। আকার খরগোশের মতো পুঁচকে বটে, কিন্তু জীবতত্ত্ববিদরা বলেন, তারা নাকি গোদা হাতির খুদে জ্ঞাতি!

তাঁবুর বাইরে পা ধাড়াবার উপায় নেই, তাঁবুর ভিতরকার অবস্থাও আদৌ সন্তোষজনক নয়—এখানে-ওখানে কিলবিল করে কেঁচো, বিছে, জোঁক! হাত-পা গুটিয়ে ক্যাম্প খাটের উপরে বসে বসে জীবনটা একেবারেই ভারবহ হয়ে উঠত, ওরই মধ্যে যদি না সান্ত্বনা দিত অদ্বিতীয় সূপকার রামহরির সুপটু হাতের প্রসাদ! আমি বরাবরই দেখে আসছি, আমাদের জীবনযাত্রা যখন আলস্য-শিথিল ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে, তখনই ভালো করে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে রামহরির রন্ধন-প্রতিভা! এই অস্থানে গভীর অরণ্যে খাবার জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দুর্যোগ মাথায় করেও বিমল, কমল ও রোলাঁর সঙ্গে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি এবং একদিন হরিণ, একদিন বুনো হাঁস এবং একদিন জংলি মুরগি না এনে ছাড়িনি। তার আগে একদিন বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল নিরামিষ, কিন্তু রামহরির হাতের গুণে নিরামিশ ভোজ্যও হয়ে উঠেছিল লোভনীয় ও মুখরোচক—রেঁধেছিল সে নিরামিষ চপ, আলুর দম, নিরামিষ ভিণ্ডালু ও নিরামিষ আর্মেনিয়ান পোলাও।

এরই মধ্যে একদিন বনের ভিতরে অদ্ভুত এক জাতের কুকুর দেখলুম। আমাদের সাড়া ও দেখা পেয়ে তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না, কেবল দূরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোলাঁর মুখে শুনলুম, তারা নাকি বোবা, ঘেউ ঘেউ করতে পারে না! আরও শুনলুম, খ্রিস্ট-পূর্ব যুগে প্রাচীন মিশরেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। শিকারের সময়ে এই জাতের কুকুর ব্যবহার করা হত। একালে কঙ্গো ও মধ্য-আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। এ জাতের কুকুরের নাম হচ্ছে 'ব্যাসেঞ্জি'। বোবা কুকুর? আশ্চর্য!

আজও মেঘলা মেঘলা করে আছে বটে, কিন্তু দুপুরের পর বৃষ্টি ধরেছে।

রোলাঁ বললেন, 'গেল বারে মিকেনো পর্বতে উঠেছিলুম অন্যদিক দিয়ে কিন্তু এ অঞ্চলের পথঘাট আমার অজানা। সেইজন্যেই ভাবনা হচ্ছে।'

বিমল শুধোলে, 'কীসের ভাবনা?'

—'কামা-মুণ্টুদের খুঁজে বার করতে পারব কি না! মিকেনোর বিস্তার যোজনের পর যোজন জুড়ে, তার কোথায় আছে কী রহস্য সে-সব আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়।'

আমি বললুম, 'বেশ তো, আজ আকাশ তো একটু ধরেছে, আহারাদি সেরে নিয়ে তিনজনে মিলে একবার একটু বেরিয়ে পড়া যাক না! আর কিছু নয়, অন্তত এখানকার পরিস্থিতি কতকটা আন্দাজ করতে পারব।'

বিমল বললে, 'প্রস্তাব মন্দ নয়। রামহরি, 'লাঞ্চ' নিয়ে এসো। খেয়েদেয়ে আমরা তিনজনে একটু বেড়িয়ে আসব।'

কমল বললে, 'আর আমরা?'

—'বিশ্রাম করবে। অর্থাৎ নাকে সর্ষের তেল দিয়ে—'

—'ঘুমোবার চেষ্টা করব?'

—'ঠিক তাই।'

—'মাপ করতে হল বিমলদা! তিন দিন ধরে বিশ্রাম করে গাঁটে গাঁটে বাত ধরবার মতো হয়েছে! খানিক হাত-পা না চালালে আর যে চলে না!'

—'উত্তম। ডন দাও, বৈঠক দাও, মুগুর ভাঁজো, ব্যায়াম করলে বাত ধরে না। তারপর ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম ভাঙবার পর যদি পেটের জ্বালা ধরে, রামহরি আছে। আমরা তিনজন যাচ্ছি কেবল অগ্রদূতের মতো। বৃষ্টি না পড়লে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরেই থাকব। রামহরি, লে আও খানা!'

সেদিন ভোজ্য ছিল চিকেন গ্রিল, চিকেন স্টু ও চিকেন আফগানি পোলাও প্রভৃতি।

রোলাঁ বললেন, 'রামহরিকে অভিনন্দন দি। সে হচ্ছে যাদুকর। আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না যে, আমরা বনবাসে আছি, না শহুরে হোটেলে বাস করছি। ধন্য!'

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লুম। বাঘাও ছোড়নেওয়ালা নয়, পিছু নেবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু তাকে বন্দি করা হল লৌহশৃঙ্খলে। পথে যেতে যেতে দূর থেকে শুনতে পেলুম, বাঘা তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে আমাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। বাঘা বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন কিছু দেখবার নেশা তাকে পেয়ে আছে। ইংরেজি প্রবাদে বলে, যেমন মনিব তেমনি কুকুর! ঠিক! বাঘারও স্বভাব হয়েছে আমাদেরই মতো।

মিকেনোর পাদদেশটা চিরহরিৎ জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। জলধারার তালে তালে উপলে উপলে সংগীত সৃষ্টি করে একটি নদী উচ্চভূমি থেকে নাচতে নাচতে নীচের দিকে আসছে। পাহাড়ে-বর্ষায় উপর থেকে ঢল নেমে তার স্রোতকে করে তুলেছে পরিপুষ্ট, গতির কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠেছে অরণ্যভূমি।

এই তটিনীই পাহাড়ের উপরে হয় নির্ঝরিণী। পাছে পথ হারাই সেই ভয়ে তার তীর

ধরেই আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম, নামবার সময়ে এই নদী বা নির্ঝরিণীই দেবে আমাদের পথের নিশানা।

খানিকক্ষণ পরে রোলাঁ বললেন, 'আপনারা একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন?'

—'কী?'

—'পাহাড়ের গা এখানে নীলাভ?'

—'হ্যাঁ। তাতে কী বোঝায়?'

—'এইরকম জায়গাতেই হিরার খনি থাকবার সম্ভাবনা।'

—'কিন্তু আমাদের পক্ষে খনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? বহু লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি আনিয়ে তোড়জোড় করে আর কাঠখড় পুড়িয়ে পাথর খুঁড়ে তবে খনির খোঁজ পাওয়া যেতে পারে—আর পাওয়া যে যাবে শেষপর্যন্ত তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

শুকনো হাসি হেসে রোলাঁ বললেন, 'তা নেই। তবে এ রকম জায়গায় এলে সম্ভাবনার স্বপ্নই যে মানুষকে আশান্বিত করে তোলে! তা ছাড়া আগেই বলেছি তো, এমন সব জায়গায় প্রায়ই পথ চলতে হিরা কুড়িয়ে পাওয়া যায়! পৃথিবীর কোনও কোনও হীরক এইভাবেই মানুষের হস্তগত হয়েছে।'

—'যদি সময় পাই আমরাও না হয় পথে পথে হিরে কুড়োবার চেষ্টা করে দেখব।'

আমরা উঠছি—উপরে, উপরে, আরও উপরে! মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বনবলয়িতা, তটিনীমেখলা শ্যামাঙ্গী ধরণী অনেক নীচে পড়ে রয়েছে বন্ধুর মানচিত্রের মতো।

যে দিকে তাকাই, বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়! এত বাঁশঝাড় আমি আর কোথাও দেখিনি—সেই ঘনবিন্যস্ত বংশবন ভেদ করে অগ্রসর হতে গেলে মানুষের হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাঁশগুলো উচ্চতায় দশ থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট, মাথায় তাদের ঝিলমিলে পত্রভূষণ। নীচের দিকে জন্মেছে সব চারা আর লতা, তাদের গায়ে পাটকিলে ও সাদা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে এবং সেইসঙ্গে আরও আছে বেগুনি, লাল ও হলদে রঙের সমুজ্জ্বল অর্কিড আর বিছুটির জঙ্গল। বাগান-বিলাসীদের আদরের 'ফিউসা'-র মতো দেখতে একরকম সাদা সাদা ফুলও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেখানে বাঁশবন নেই সেখানে দেখা যায় সব একশো ফুট কি তারও চেয়ে বেশি উঁচু মস্ত মস্ত গাছ।

আমি বললুম, 'লোকে কথায় বলে—বাঁশবনে ডোম কানা! আমাদেরও সেই অবস্থা হবে নাকি? এই বাঁশের জঙ্গলে এসে দিগ্বিদিক জ্ঞান যে হারিয়ে ফেলতে হয়!'

রোলাঁ বললেন, 'শুনলে অবাক হবেন যে, এই দুর্গম অরণ্যেও অনায়াসে পথ কেটে নিয়ে আনাগোনা করে হাতি আর গরিলা আর বন্যমহিষরা। বাঁশের পাতা হচ্ছে গরিলা আর হাতিদের অতিশয় প্রিয় খাদ্য। গেলবারে এমনি 'রুগানো' বা বৃহৎ বাঁশের জঙ্গলেই আমি এসেছিলুম গরিলা-শিকারে।'

—'আপনি কত বড়ো গরিলা দেখেছেন?'

—'আন্দাজ ছয় ফুট উঁচু। শুনি, সাত ফুট উঁচু গরিলাও পাওয়া গেছে। আমি নিজে একটা পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি উঁচু গরিলা মেরেছিলুম। তার বুকের পাটার মাপ ছিল বাষট্টি ইঞ্চি আর ওজন ছিল পাঁচ মন।'

—'মানুষের সঙ্গে গরিলার সম্পর্ক কী রকম?'

—'বিশেষ প্রীতিজনক বলতে পারি না। তবে গরিলাকে চটিয়ে না দিলে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর মতো সে তেড়ে এসে গায়ে পড়ে মানুষকে আক্রমণ করে না। সে জানে মানুষের চেয়ে তার গায়ের জোর ঢের বেশি, আর বোধ হয় সেই কারণেই দলবদ্ধ মানুষ দেখলেও ভয় পায় না। আমি স্বচক্ষে গরিলার শারীরিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটা বড়ো চিতাবাঘ একবার একটা শিশু গরিলাকে আক্রমণ করেছিল। তৎক্ষণাৎ একটা ধাড়ি গরিলা বেগে ছুটে এসে অত্যন্ত অনায়াসে কামড়ে আর আছাড় মেরে চিতাবাঘটার দফা রফা করে দিলে!'

ঊর্ধ্বে মেঘের আস্তরণ ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছিল। বাতাসও বেশি ঠান্ডা হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। দূরে পশ্চিম আকাশটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চিরজ্বলন্ত নিয়ামলাগিরার বিরাট অগ্নিযজ্ঞে। তার অতল ও প্রকাণ্ড চিতা থেকে মুহুর্মুহু জেগে উঠছে আকস্মিক দীপ্তি এবং উপরের পুঞ্জীভূত মেঘের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে ছুটে যাচ্ছে শত শত লকলকে অগ্নিশলাকা!

অনেকটা উপরে উঠেছি এবং যতই উঠছি শীতও বাড়ছে। আরও উপরে এখানে পাওয়া যাবে বোধহয় হিমালয়ের শীত। এরই মধ্যে বুকে জাগল দস্তুরমতো কাঁপুনি।

বললুম, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, এমন কনকনে ঠান্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আকাশের গতিকও সুবিধার নয়—এত ঠান্ডায় ভিজে মরবার ইচ্ছা নেই, এইবারে আবার নীচে নামা উচিত।'

কিন্তু আমার কথা রোলাঁর কানে ঢুকল না, তিনি তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনছিলেন। আমি এবং বিমলও শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

অনেকটা শিঙার আওয়াজের মতো। হস্তীর বৃংহতি? না, এ আওয়াজে তেমন জোর নেই।

সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে হচ্ছে আর এক আওয়াজ। কে যেন ঢাকে কাঠি পিটছে!

—'ও কীসের শব্দ মঁসিয়ে রোলাঁ?'

—'গরিলার ডাক!'

আমাদের পিছনে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করে রোলাঁ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সামনেই একটা বড়ো ঝোপ। তারই ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, সামনেই খানিকটা অপেক্ষাকৃত খোলা জমি এবং সেখানে নানা ভঙ্গিতে বিরাজ করছে একদল গরিলা! গুনে দেখলুম, তেইশটা!

পুরুষ ও নারী—বুড়ো, জোয়ান, শিশু। চার-পাঁচটা বাচ্চা খেলা করছে—ছুটছে, লাফাচ্ছে,

গাছে চড়ছে। একটা বাচ্চা মায়ের স্তন্যপান করছে। কয়েকটা জোয়ান গরিলা দুমড়ানো বাঁশডাল থেকে মুখ দিয়ে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটু তফাতে গম্ভীর ভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড এক গরিলা—কী চ্যাটালো তার বুক, কী ধামার মতো তার ভুঁড়ি, কী মোটা মোটা তার বাহু, তার সর্বাঙ্গ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে অসাধারণ পশুশক্তির উচ্ছ্বাস! নিশ্চয় দলের সর্দার!

আচম্বিতে মস্তবড়ো গরিলাটা দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং দুই হাত দিয়ে নিজের বুক সশব্দে চাপড়াতে লাগল!

রোলাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'সরে আসুন, শিগগির সরে আসুন!'

—'হঠাৎ কী হল বলুন দেখি?'

—'সর্দার বাতাসে আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে! ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, চলুন, আর এখানে নয়!'

—'কোন দিকে যাব?'

—'নীচের দিকে। যে খোঁজে এদিকে এসেছিলুম, ব্যর্থ হল। এ অঞ্চলে গরিলারা আছে, মান্ধাতার মানুষরা নিশ্চয়ই এদিকে থাকে না।'

আমাদের গতি হল নিম্নাভিমুখী। নামতে নামতে মাথার উপরে বেড়ে উঠল মেঘের ঘটা। একে তো রোদ ওঠেনি, তার উপরে ঘনায়মান মেঘতিমিরে বেলাশেষের টিমটিমে আলোটুকুও হয়ে উঠল অধিকতর ঘোরালো। ঘন ঘন বিদ্যুৎপ্রভা—থেকে থেকে বজ্রনাদ—বাতাসে তুষারের নিশ্বাস! ধারাপাতের আর দেরি নেই!

যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে নামতে লাগলুম। তারপর উৎরাই শেষ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টিপাত।

রোলাঁ বললেন, 'যথাসময়ে নেমে আসতে পেরেছি, নইলে আজ তাঁবুতে ফিরতে পারতুম না।'

বিমল বললে, 'কেন?'

—'আর মিনিট-পনেরো দেরি হলে উপরের জল নেমে ওই পাহাড়ে নদী ফেঁপে ফুলে আরও খরস্রোতা হয়ে উঠত—এপারে আসবার কোনও উপায়ই থাকত না!'

এদেশের বৃষ্টিরও কী প্রতাপ! বাংলা দেশের খুব জোর বৃষ্টিও তার কাছে হার মানে! হয়তো এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কেবল চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত বৃষ্টি!

মোটা মোটা ফোঁটা! দেহকে ব্যথা দেয় রীতিমতো, অন্ধ করে দেয় চোখকে! ছুটতে ছুটতে শিবিরের কাছে এসে পড়লুম।

শোনা গেল বাঘার উচ্চ চিৎকার—অতিশয় ক্রুদ্ধ চিৎকার!

মানুষদেরও হট্টগোল! গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ। একটু তফাতে হুড়মুড় করে জঙ্গল ভাঙার শব্দ, ঝোপঝাপের ঝটপটানি! কে বেগে দৌড়চ্ছে—তার দ্রুত পদের ধুপ ধুপ আওয়াজ!

—'বিমল!'

—'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! দৌড়ে চলো, দৌড়ে চলো!'

আড়াল থেকে রামহরির গলা পেলুম।—'কোন দিকে গেল, কোন দিকে গেল!' বলতে বলতে সে তাঁবুর ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল—তার হাতে বন্দুক। বাঘার চ্যাঁচানি তখনও থামেনি।

—'কী হয়েছে রামহরি, এত হইহল্লা কেন?'

চোখ খত্তাল করে রামহরি বললে, 'ভূত খোকাবাবু, ল্যাংটা ভূত!'

—'পদে পদে ভূত দ্যাখো তুমি, ভূত তো তোমার হাতধরা! আর জ্বালিয়ো না, থামো!'

—'ঠাট্টা নয় খোকাবাবু, এ হচ্ছে মানুষ-ভূত। গায়ে লম্বা লম্বা কালো চুল, ইয়া রাক্ষুসে চেহারা, দেখলেই ভিরমি যেতে হয়।'

এমন সময়ে বিনয়বাবু, কমল ও কামাথি প্রভৃতিরও আবির্ভাব।

—'বিনয়বাবু, ব্যাপার কী?'

—'আমি দেখিনি, কমল দেখেছে।'

কমল বললে, 'ভালো করে কিছু দেখতে পাইনি বিমলদা! তবে বাঘার চিৎকারে চমকে উঠে দূর থেকে দেখলুম, গরিলার মতো একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি সাঁৎ করে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল! রামহরি আর কামাথিও দেখেছে, তারা তখনই বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগেনি।'

কামাথি বললে, 'কামা মুনটু!'

চমৎকৃত কণ্ঠে রোলাঁ বললেন, 'কামা মুনটু! যার খোঁজে আমরা এসেছি, সেই-ই এসেছিল আমাদের কাছে! মহম্মদের কাছে পর্বতের আগমন! আশ্চর্য!'

একদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে কমল বললে, 'মূর্তিটা ওইদিকে গেছে!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমরাও ওইদিকের জঙ্গল দুলতে দেখেছি!'

বিমল বললে, 'ওদিকেও একটু এগুলেই নদী। তারপরেই পাহাড়। নদীর জল এখনও বোধ হয় বেশি বাড়েনি। তাহলে খুব সম্ভব সে নদী পেরিয়ে পাহাড়েই উঠেছে!'

রোলাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ আর তার পিছু ধরবার উপায় নেই। একে এই দারুণ বৃষ্টি, তার উপরে সন্ধ্যার অন্ধকার আসন্ন।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আজকের পরে আছে, কাল। আমাদের ফাঁকি দিয়ে সে যাবে কোথায়? খুব ভোরে উঠেই কাল আমরা ওইদিক দিয়ে আবার পাহাড়ে গিয়ে উঠব।'

॥ দ্বাদশ পর্ব ॥

হাসি, কি হুঙ্কার, কি হাহাকার

পূর্বাচলে ফুটল প্রভাত-সূর্যের রক্তারক্ত অগ্নিরাগ এবং নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গকণ্ঠে যথারীতি আবৃত্ত হল আলোক-কাব্যের বিভিন্ন পদ।

প্রাতরাশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে কামাথি এসে বললে, 'কর্তা, 'সাফারি'রা কেউ পাহাড়ে উঠতে রাজি নয়। 'আস্কারি'-রা নিমরাজি বটে, কিন্তু তারাও খুঁত খুঁত করছে।'

রোলাঁ বললেন, 'কেন?'

—'বলে, পাহাড়ে আছে নানান বিভীষিকা! তাদের সব চেয়ে ভয় কামা মুনটুদের। বলে, তারা হচ্ছে প্রেতাত্মা, বনমানুষদের দেহে আশ্রয় নিয়ে মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায়!'

হো হো করে হেসে উঠে রোলাঁ বললেন, 'কামাথি, তোমারও কি ওই বিশ্বাস?'

কামাথি নত হয়ে সেলাম ঠুকে বললে, ' 'বোয়ানা' (প্রভু), আমার বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, আমি আপনার হুকুমের দাস।'

কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল, আপাতত কেবল আমাদের ছয়জনকে (রোলাঁ, বিনয়বাবু, বিমল, আমি, কমল ও রামহরি) নিয়ে গঠিত হবে অনুসন্ধান সমিতি। প্রাথমিক তদন্তকার্য শেষ করে ফিরে এসে আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

অতএব তখনকার মতো শিবিরে রইল সেপাই ও কুলির দল। এবং তাদের ভার অর্পণ করা হল কামাথির উপরেই। সকলকেই জানিয়ে গেলুম, বড়ো জোর চব্বিশ ঘণ্টা আমরা থাকব পাহাড়ের উপরে। বলা বাহুল্য, এবারে বাঘাও হল আমাদের সাথি। তাকে সঙ্গে না আনাই উচিত ছিল!

প্রকৃতির পরনে তখনও রয়েছে মেঘরুচি বসন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে ঝরছে ইলশে-গুড়ুনি, বাতাস যেন হিমশিলা।

সৌভাগ্যক্রমে অল্প খোঁজাখুঁজির পরেই পাহাড়ে ওঠবার একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল। কাঠুরিয়া, মধুসংগ্রাহক ও স্থানীয় শিকারিদের অগম্য ঠাঁই নেই। নিশ্চয়ই তাদের পদক্ষেপেই এই পথের উৎপত্তি।

সেই পথ—যা সুপথ নয়, কুপথ—ধরেই আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। বরাবরের মতো এবারেও আমাদের অগ্রণী হল বাঘা। সে অগ্রবর্তী হলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি এই ভেবে যে, অন্তত পুরোভাগ থেকে কোনও আকস্মিক বিপদ আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারবে না।

পা চালাতে চালাতে চলছে আমাদের মুখও। বিনয়বাবু বলছিলেন: 'মঁসিয়ে রোঁলার বিশ্বাস, আজও এই অঞ্চলে নৃতত্ত্বে বিখ্যাত 'রোডেশিয়ান' মানুষদের বংশধররা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অনুমান করা হয়, রোডেশিয়ান মানুষরা পনেরো-ষোলো হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত! আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।'

কমল বললে, 'কিন্তু আমরা তো এখন রোডেশিয়া প্রদেশে নেই!'

—'না। আমরা আছি কঙ্গো প্রদেশে। কিন্তু দক্ষিণ দিকে কঙ্গোর সীমান্তেই আছে রোডেশিয়া। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ ছিল যাযাবর। তারা চাষবাস

করতে জানত না, শিকার বা বনের ফলমূল আহরণের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করত। এক জায়গায় খাদ্যাভাব হলেই অন্য জায়গায় বা দেশে গিয়ে বসবাস করত। সুতরাং স্মরণাতীতকালে রোডেশিয়ান মানুষরা যে কঙ্গোয় এসে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পণ্ডিতদের মত হচ্ছে, রোডেশিয়ান মানুষদের চিহ্ন হাজার হাজার বৎসর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

—'সে কথাও জোর করে বলা যায় না। অনুসন্ধান-কার্যের সুবিধার জন্যেই পণ্ডিতরা এক এক জাতের মানুষকে বিশেষ নামে ডাকেন—যেমন নিয়ানডার্থাল, রোডেশিয়ান, হিডেলবার্গ প্রভৃতি। এরা যে পরে ভিন্ন ভিন্ন নামে পৃথিবীতে অজ্ঞাতবাস করেনি, এমন কথাই বা কেমন করে বলব? দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্যাখো, আজও অস্ট্রেলিয়ার গভীর জঙ্গলে এমন সব অসভ্য মানুষ আছে, যাদের সঙ্গে রোডেশিয়ান মানুষদের অনেক লক্ষণই মিলে যায়। অথচ কোথায় রোডেশিয়া আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া!'

—'রোডেশিয়ান মানুষদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

—'মোটামুটি পারি। মঁসিয়ে রোলাঁর মুখেও তার আভাস তোমরা পেয়েছ। দেহের তুলনায় তার মুখ বড়ো নাক চ্যাপটা। ভারী চোয়াল। খর্ব গ্রীবা। চ্যাটালো বুকের পাটা। দেহ প্রকাণ্ড। রোমশ গা। পেশিবদ্ধ বলিষ্ঠ মূর্তি। হঠাৎ দেখলে গরিলা বলে ভ্রম হয়।'

—'তারা কি নরভুক?'

—'অসম্ভব নয়। তাদের চেয়ে অগ্রসর অসভ্যরা আজও মানুষের মাংস খেতে আপত্তি করে না।'

—'তাহলে তারা জীবনযাপন করে হিংস্র পশুর মতো?'

—'নিশ্চয়ই। তবে তাদের মস্তিষ্ক গরিলা আর ওরানউটানের চেয়ে উন্নত। পৃথিবীতে আজও কোনও কোনও জাতের অসভ্য মানুষ আছে যারা আগুনের ব্যবহার জানে না। অথচ এটা প্রমাণিত হয়েছে, পনেরো-ষোল হাজার বৎসর আগে যে নিয়ানডার্থাল মানুষদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল, তারা আগুনের ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। রোডেশিয়ানরাও তাদের সমসাময়িক। অপেক্ষাকৃত সভ্য আদিম বাসিন্দারা ক্রমোন্নত অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করতে পেরেছিল, বিশেষ বিশেষ কাঠ ঘর্ষণের ফলে আগুনের জন্ম দেয়। সভ্যতার দিকে আরও এগিয়ে তারা জানলে যে অগ্নি-উৎপাদক পাথর (চকমকি) থেকে আরও তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় এই রকম কাঠ আর পাথরের নামই হচ্ছে 'অগ্নিকাষ্ঠ' ও 'অগ্নিপ্রস্তর'। বর্তমান কালেও কোনও কোনও পশ্চাৎপদ অসভ্য জাতির মধ্যে ওই দুই উপায়েই অগ্নি উৎপাদন করবার নীতি প্রচলিত আছে। নিয়ানডার্থাল মানুষরা চকমকি পাথরের অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করত। মঁসিয়ে রোলাঁর পোষা মুনটুর হাতেও ছিল পাথরের বর্শা। নিয়ানডার্থাল মানুষরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত, এদিক দিয়েও

সম্ভবত কামা মুনটুদের মিল আছে, যাদের খোঁজে আমরা এই পাহাড়ে উঠেছি, তারাও হয়তো গুহাবাসী জীব। আদিম কালের মানুষরা শত্রু আর বন্য জীবদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে হয় গুহায় নয় জলের উপরে বাসা বাঁধত।'

কমল বলল, 'জলের উপরে মানে নৌকায়?'

—'না। জলের ভিতরে মোটা মোটা খোঁটা পুঁতে তার উপরে পাটাতন পেতে ঘর বানিয়ে বাস করা হত। সুইজারল্যান্ড আর ইতালিতে এই রকম প্রাগৈতিহাসিক বসতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। তবে এ ভাবে যারা বাস করত তারা যে গুহাবাসী আদিম মানুষদের চেয়ে উন্নত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

বেলা ক্রমে দুপুরের দিকে গড়িয়ে চলেছে। বৃষ্টি ধরেছে বটে, কিন্তু আকাশের গায়ে তখনও জড়ানো মেঘের চাদর। বাতাসে বেড়ে উঠছে শীতের আমেজ। সকলে অনেক চড়াই আর উতরাই পার হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আদিম মানুষদের কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না।

প্রাণীদের মধ্যে ক্রমাগত সাড়া ও খেদা দিচ্ছে কেবল পাখিরা—কখনও একা একা, কখনও দলে দলে। আমাদের দেশে পরিচিত পাখিদের মধ্যে দেখলুম দাঁড়কাক, কাঠঠোকরা, তিত্তির, ঘুঘু ও বুলবুলি প্রভৃতি। চড়াই পাখির মতো দেখতে একরকম পাখি, কিন্তু শিস দেয় কেনারির মতো। বিদেশি পাখিদের মধ্যে দেখা গেল থ্রাশ, টুর‍্যাকো, স্রাইক ও টিটমাউস প্রভৃতিকে। সায়েবরা যাদের সানবার্ড বা সূর্যপাখি বলে, তাদেরও কয়েক জাত আছে। তারা মধুপায়ী। আরও যে কত অজানা পাখি। তাদের গলায় গানের সুর, গায়ে রামধনুর নিছনি। কখনও কানে ঝরে সুরবাহারের মাধুরী, কখনও চোখে লাগে স্বপনের রংবেরং!

কমল পেটে হাত দিয়ে বায়না ধরলে, 'জঠরানলে পুড়ে মরি রামহরিদা, আগুন নেবাও, ঠান্ডা করো!'

—'তোমার জঠরানল তো রাবণের চিতা, কখনও নেবে না! কিন্তু খাবে কী?'

—'আছে কী?'

—'হাতে গড়া রুটি, ভাজাভুজি, আমের চাটনি!'

—'আবার হাতে রেখে বলছ কেন দাদা? তুমি শেষ রাতে উঠে যখন মাংস রাঁধছিলে, আমি কি তার সুগন্ধ পাইনি?'

—'একটুখানি হরিণের মাংস ছিল তাই দিয়ে কোর্মা রেঁধেছি। আর মেটুলি-চচ্চড়ি।'

—'আবার মেটুলি-চচ্চড়ি?—শাবাশ! ধন্য! ব্রাভো!'

আমরাও উদরের শূন্যতা অনুভব করছিলুম, সেইখানেই সার বেঁধে বসে পড়লুম বিনাবাক্যব্যয়ে। অগ্রবর্তী বাঘাও ব্যাপার বুঝে আবার পশ্চাৎপদ হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘুরতে লাগল রামহরির পিছনে পিছনে। বাঘা বেশ জানে কখন কার খোসামোদ করা উচিত।

একটি পরম সুখী পরিবারের মতো আমরা যখন একাগ্র মনে ডানহাতের কাজ সারছি

এবং রামহরির রন্ধন নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠছি, তখন সহসা হল অত্যন্ত ছন্দপতন—বাঘার কণ্ঠে জাগল বেসুরো চিৎকার।

সামনের দুই থাবা দিয়ে একখানা হরিণের হাড্ডি বেশ বাগিয়ে ধরে বাঘা মাথা কাত করে চর্বণানন্দ উপভোগ করছিল বটে, কিন্তু তার চক্ষু (এবং বোধ করি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও) ছিল অত্যন্ত জাগ্রত, কারণ চেঁচিয়েই সে তিরবেগে ছুটে গেল পাহাড়ের যেখানে, সেখানে দোতলা সমান উঁচু পাথুরে প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। লাফের পর লাফ মেরে বাঘা সেই খাড়া প্রাচীরের উপরে ওঠবার জন্যে অসম্ভব চেষ্টা করতে লাগল!

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি দেখেছি—আমি দেখেছি! আবার একটা গরিলামুখো খত্তালচোখো দানব! বাঘা চ্যাঁচাতেই একলাফে অদৃশ্য হল!'

তার পরেই কানফাটানো প্রাণদমানো হা হা হা হা হা হা ধ্বনি—সেটা হুঙ্কার, না হাসি, না হাহাকার, কিছুই বোঝা গেল না।

এমন সময়ে কোর্মা-কারি কিছুই মুখে রোচে না, হুড়মুড় করে উঠে পড়ে আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দুক তুলে নিলুম। কিন্তু শত্রু কোথায়? কেবল মেঘচ্ছায়ায় মেদুর পাহাড় আর সবুজ বন। সেই উদ্ভট হাসি বা হুঙ্কার বা হাহাকারও আর শোনা গেল না।

রামহরি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'কী গো, শুনলে তো? এইবারে ফিরবে, না মরবে?'

—'ফিরবও না, মরবও না, আরও এগিয়ে দেখব! আমরা এত সহজে ভয় পাবার ছেলে নই!' বলতে বলতে বিমল অটল পদে এগিয়ে চলল সামনের দিকে, নির্ভীক মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব। তার সঙ্গে পদচালনা করলুম আমরাও।

বাঘা কিন্তু নিজের পাওনাগণ্ডা ভোলবার পাত্র নয়—বিপদ-আপদেও মাথা ঠিক রাখতে পারে। পুনর্বার যাত্রা করবার আগে পরিত্যক্ত হাড্ডিখানা আবার মুখে তুলে নিয়ে চলল।

বিনয়বাবু বললেন, 'একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমরা আর বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছি না—আদিম মানুষদের সন্ধানে ঠিক পথই ধরতে পেরেছি, যদিও তারা এগিয়ে যাচ্ছে আলেয়ার মতো!'

রোলাঁ মাথা নেড়ে বললেন, 'না বিনয়বাবু, তারা আলেয়ার মতো এগিয়ে যাচ্ছে কি পিছনের ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আসছে, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তারা হয়তো আমাদের চোখে চোখেই রেখেছে!'

রোলাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই যেন কোথা থেকে জাগ্রত হল আবার সেই অবর্ণনীয় হা হা হা হা অট্টরোল!

বাঘা বিষম ক্রোধে সর্বাঙ্গের লোম ফুলিয়ে একদিকে দৌড়ে যাবার চেষ্টা করলে, আমি তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত হাতে চেপে ধরলুম তার চামড়ার গলাবন্ধ।

॥ ত্রয়োদশ পর্ব ॥

নরভুকদের আত্মপ্রকাশ

সে দিনের কথা ভুলিনি। ভুলতে পারব না। সে হচ্ছে আগুন-রেখা দিয়ে জ্বলজ্বলে করে আঁকা জ্বালাময় স্মৃতিচিত্র।

আবার সেই বিকট অট্টরোল শুনলুম বটে, কিন্তু তার উৎপত্তি কোথায়, আবিষ্কার করতে পারলুম না। কেবল লক্ষ করলুম, দূরের একটা জঙ্গলের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ব্যস্ত ভাবে শূন্যে উড়ে গেল। যাকে আমরা ধরতে চাই, ওই জঙ্গলের মধ্যেই কি আছে তার ভীতিকর উপস্থিতি?

দ্রুতপদে সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম। পাতি পাতি করে খুঁজলুম। সব খাঁ খাঁ। গাছের উপরে একটাও পাখি নেই। গাছের নীচেও নেই একটা জীব। বিজনতায় যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা।

রোলাঁ হতাশ ভাবে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওরা যেচে ধরা না দিলে আমরা কিছুতেই ওদের ধরতে পারব না!'

আমি বললুম, 'হিমালয়ের পৃথিবী বিখ্যাত তুষার মানুষদের কথা স্মরণ করুন। কত লোক নাকি তাদের দেখেছে, কিন্তু ধরতে গিয়ে কেউ তাদের খুঁজে পায়নি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা হিমালয়ে গিয়ে যে ভয়ংকরদের দেখেছিলুম, হয়তো তারাই হচ্ছে তথাকথিত তুষার মানুষ।'

বললুম, 'কিন্তু তার কোনও সঠিক প্রমাণ নেই।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবুর অনুমান, কামা মুনটুরা গুহাবাসী জীব। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে পাহাড়ের কোথাও না কোথাও তাদের গুহাগুলো আমরা আবিষ্কার করতে পারব। তারা পালালেও তাদের গুহাগুলোও তো আর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারতে পারবে না!'

কমল বললে, 'গুহায় কখনও বাস করিনি, আজকের রাতটা গুহার ভিতরে কাটাতে পারলে মন্দ হয় না!'

কথা কইতে কইতে এইবারে আমরা একটা অনতিবৃহৎ উপত্যকার উপরে এসে পড়লুম। তখন মাথার উপরে থেকে থেকে বিদ্যুতের আলো-আলপনা ও মেঘডম্বর, দুইদিকে ছায়াম্লান জঙ্গল-সবুজ পাহাড়ের গড়ানে গা এবং তার মাঝখানে তৃণশয্যা-বিছানো সমতল ভূমি। বেশ স্বস্তিবোধ করলে আমাদের চড়াই-উৎরাই-শ্রান্ত দেহগুলো।

কমল বললে, 'বাঃ, একটি ঝরনাও আছে যে!'

ঠিক একটি ছোট্ট রুপোলি লহর। শৈলরন্ধ্র টুটে বেরিয়ে হাত দশেক নীচে ঝিরঝিরিয়ে ঝরতে ঝরতে গিরিতটে বাজাতে চায় যেন সেতারের টুং টাং! রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র কথা মনে হল!

এখানেও পায়ে বিছুটির ঝোপ জড়িয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফুরন্ত বংশবন। তার উপরে মাথা তুলেছে 'মুসুঙ্গুরা' বা বন্য গোলাপ গাছ, তার পাতা ছোটো ছোটো, ফুলের রং হলদে, উচ্চতা পঞ্চাশ-ষাট ফুট। আর এক জাতের অগুন্তি গাছ আছে, স্থানীয় ভাষায় নাম হচ্ছে 'মুগেসি'—বিলাতি নামে বুঝায় 'কাগজি বল্কল গাছ'। তার উচ্চতা সত্তর থেকে একশো ফুট পর্যন্ত। ডালে বাহার দেয় থোলো থোলো গোলাপি-মেশানো বেগুনি ফুল—গড়ন তাদের 'লিলি'র মতো। দেখলুম কালোজাম জাতীয় এক ফলগাছ, স্থানীয় নাম 'মুফেরি'। এখানে সেখানে দেখা যায় এক জাতের ঝুলন্ত লতা, নাম 'রুহুনগাঙ্গেরি', তাতে ফোটে হলুদবরন ফুল।

চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে করতে উপত্যকার প্রায় শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি, আচম্বিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে আবার জাগ্রত হল সেই ভৈরব হা হা হাস্য, কি হুঙ্কার কি হাহাকার!

এবারে অট্টরোলের তরঙ্গ ধেয়ে এল আমাদের পিছন দিক থেকে।

রোলাঁ বললেন, 'তবে কি ওই জীবটাকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে এসেছি?'

বিমল ভুরু কুঁচকে নীরবে মাথা চুলকাতে লাগল।

কমল বললে, 'আমরা বোধহয় হতভাগাদের আড্ডা ছাড়িয়ে এসেছি! ফিরে চলুন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোথায় তারা থাকতে পারে? দু-দিকেই নজর রেখেছি, পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটা গুহাও নেই।'

রোলাঁ বললেন, 'হয়তো ওরা গুহায় থাকে না। হয়তো ওরা গেছো জীব।'

বিনয়বাবু ঘন ঘন মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'উঁহুঁ, হতেই পারে না!'

রোলাঁ বললেন, 'কেন?'

—'আপনার মুখে বারংবার কামা মুনটুর হুবহু বর্ণনা শুনেছি। তার হাত-পায়ের গড়ন নাকি মানুষের মতো। বৃক্ষবাসী জীবের তা হয় না।'

রোলাঁ নিরুত্তর। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল তিনি সুখী নন। ওঁরা দুজনেই নৃতত্ত্বে পণ্ডিত। আর কে না জানে, পণ্ডিতেরা হচ্ছেন উড়ো তর্কে তুখোড়। তর্ক পেলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যান। এত সহজে রোলাঁ তর্কে ক্ষান্তি দিলেন দেখে বাঁচলুম। বোধহয় বড়োই ভয় পেয়েছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এখানে কি একাধিক কামা মুনটুর আবির্ভাব হয়েছে? বিমলের কাছে সেই সন্দেহই প্রকাশ করলুম।

বিমলও বললে, 'আমারও তাই মনে হয়। ওদের মতলবটা কী?'

সহসা আমাদের ডান দিক থেকে জেগে উঠল সেই রোমাঞ্চকর হা হা হা হা ধ্বনি।

তারপর আবার বাম দিক থেকেও সেই ভয়াল চিৎকার!

তারপর কখনও সুমুখ, কখনও পিছন, কখনও এপাশ, কখনও ওপাশ থেকে উঠতে লাগল সেই অমঙ্গল্য অট্টরোল!

বাঘা বারংবার চমকে চমকে দিকে দিকে ছুটেই আবার থমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে

লাগল—এবং তারপর দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারার মতো সারমেয়-ভাষায় ধমকের পর ধমক দিতে লাগল অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশে!

বিমল গম্ভীর মুখে বললে, 'ওরা চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

কমল বললে, 'কিন্তু কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না, ওরা কোথায় আছে?'

—'জঙ্গলের নীচের দিকটা আগাছার ঝোপেঝোপে আচ্ছন্ন, ও-সব জায়গায় বড়ো বড়ো জানোয়াররাও লুকিয়ে থাকতে পারে।'

—'কিন্তু ওরা চ্যাঁচায় কেন? আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে?'

—'না। আমাদের ভয় দেখিয়ে ওদের লাভ নেই।'

—'তবে?'

—'ওরা আমাদের আক্রমণ করতে চায়।'

—'কেন? আমরা তো ওদের অনিষ্ট করিনি।'

বিমল তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'কেন? হরিণরা আমাদের অনিষ্ট করে না, তবু আমরা তাদের আক্রমণ করি কেন?'

কমল শিউরে উঠে বললে, 'বিমলদা, তুমি হাসছ! ওরা আমাদের পেটে পুরতে চায়, আর তুমি হাসছ!'

রামহরি করুণ কণ্ঠে বললে, 'ওরে বাবা রে, এ কী হাসির ব্যাপার রে!'

রোলাঁ ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'বিমলবাবু, বিমলবাবু, এখন উপায় কী?'

—'এক উপায় আক্রান্ত হলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমাদের বন্দুক আছে, ওদের নেই।'

—'কিন্তু ওদের দলে যদি শত শত লোক থাকে, আমাদের ছয়টা বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে পারব?'

—'জনকয় লোককে বধ করলেও ঠেকাতে পারা সম্ভব নয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের মরতেই হবে।'

—'তবেই তো!'

—'কিন্তু আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে সরাসরি ওদের সঙ্গে লড়ব না।'

—'তবে?'

—'একটা উপায় নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি। ...কুমার!'

—'বলো!'

—'ওইদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।' বিমল অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

খানিক তফাতেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গহ্বরের মতো জায়গা। আন্দাজ—চওড়ায় ছয়-সাত আর গভীরতায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত।

বিমল বললে, 'ওর মধ্যে আশ্রয় নিলে কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণের জন্যে, কিন্তু তারপর?'

—'মৃত্যু!'

—'খাসা পরিণাম!'

—'একেবারে অতটা হতাশ হবেন না বিনয়বাবু। মনে রাখবেন, কামা মুনটুরা বন্দুকের মহিমা জানে না। গহ্বরের মুখে যখন ধড়াদ্ধড় করে সঙ্গীদের মাটির উপরে হতাহত হয়ে আছড়ে পড়তে দেখবে, তখন ওদের জানোয়ারি সাহস আর নরমাংস খাবার লোভ কর্পূরের মতো উবে যাবে বলেই মনে করি!'

॥ চতুর্দশ পর্ব ॥

পঞ্চভূতের হামলা

বরাবরই দেখে আসছি বিপদ যত বেশি ঘনিয়ে ওঠে, বিমলের মেজাজ হয়ে পড়ে তত বেশি প্রশান্ত। মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও নিতান্ত সহজ ভাবেই সে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলতে পারে।

কমল বললে, 'বিমলদা, তাহলে আমরা কি এখনই ওই গহ্বরে—'

কিন্তু তার অসমাপ্ত ভাষণ ডুবিয়ে দিয়ে এইবারে চারিদিক থেকে একসঙ্গে সম্মিলিত শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশ জাগানো উচ্চণ্ড কোলাহল—পাহাড়ের শিখরে শিখরে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি! বিপুল জনতার সেই মিলিত কণ্ঠস্বর যে অর্থপ্রকাশ করতে লাগল, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রইল না—সে হচ্ছে হিংস্র, বুভুক্ষু ও মারাত্মক হুহুঙ্কার!

আমি বললুম, 'বিমল, এইবার ওরা বোধহয় আক্রমণ করবে!'

বাক্যহীন মুখে কেবল মাথা নেড়ে বিমল আমার কথায় সায় দিলে।

বেশ বোঝা গেল, সেই গর্জমান জনতা এগিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। একদিক থেকে নয়, চারিদিক থেকে! শেষটা বেড়াজালে বন্দি হব নাকি?

রোলাঁ বললেন, 'বিমলবাবু, ওরা দেখতে পাবার আগেই কি আমাদের ওই গহ্বরের ভিতরে লুকিয়ে পড়া উচিত নয়?'

বিমল হাস্য করে বললে, 'লুকোবেন? লুকোচুরির সময় আর নেই। ভাবছেন কি ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওরা জঙ্গলে জীব, জঙ্গলের আড়াল থেকে আমাদের সব গতিবিধি লক্ষ করছে।'

—'তাহলে গহ্বরে ঢুকে আমাদের লাভ?'

আমি বললুম, 'বিমলের 'স্ট্র্যাটিজি' কি জানেন? গহ্বরের মুখ সংকীর্ণ, ওরা দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে পারবে না। তিন-চার জন মিলে ঢোকবার চেষ্টা করলেই আমাদের গুলি খেয়ে ভূমিসাৎ হবে। এইভাবে আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওদের বাধা দিতে পারব।'

—'ঠিক, ঠিক!'

এইবারে দেখা গেল হানাদারদের! জঙ্গল, ঝোপঝাপ, বড়ো বড়ো পাথরের ও গাছের আড়াল থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল দৈত্যের মতো বিকটদর্শন সব মূর্তি! বস্ত্রহীন, বর্শাধারী, লম্বকেশ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অমানুষ ও দীর্ঘায়ত মূর্তি—চ্যাঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, আস্ফালন করছে, ছুটে আসছে—দিকে দিকে, পরে পরে, দলে দলে—তাদের সংখ্যা গণনা অসম্ভব!

বিমল বললে, 'গহ্বরে, গহ্বরে!'

সবাই বেগে গহ্বরের দিকে ছুটে চললুম, সর্বশেষে আমি।

পথে পড়ল একটা ঝোপ। তার কাছে আসতেই যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! একটা বিষম গুরুভার দেহ অতর্কিতে এমন ভাবে আমার উপরে লাফিয়ে পড়ল যে চক্ষে অন্ধকার দেখে আমি ঠিকরে লম্বমান হলুম মাটির উপরে! উঠে বসবার উপক্রম করে পরমুহূর্তেই দেখি, প্রায় গরিলার মতো একটা করালবদন সুবৃহৎ মূর্তি আমার দিকে নিক্ষেপ করলে এক দীর্ঘ বর্শাদণ্ড!

বর্শার অমোঘ আঘাতে আমার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত, কিন্তু কোথা থেকে বিদ্যুতের ঝটকার মতো এসে সেই নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের গতিপথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার প্রভুভক্ত বাঘা—বর্শা ভেদ করলে তার দেহ! তারপরেই তার অন্তিম চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ এবং একটা দানবীয় আর্তনাদ!

তারপরেই শুনলুম আমার হাত ধরে সজোরে টানতে টানতে বিমল বলছে, 'ওঠো কুমার, শিগগির ওঠো!'

—'আমার বাঘা, আমার বাঘা!'

—'ওই ওরা এসে পড়ল! বাঘার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কি মরতে চাও?' বিমল আমাকে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিলে।

আমার পায়ের তলায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে বাঘার বর্শাবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহ। এবং তার পাশেই মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে সেই দানব-দেহটা—বুলেটে তার বক্ষ ভেদ করে বিমলের বন্দুক নিয়েছে বাঘার মৃত্যুর প্রতিশোধ। প্রতিশোধ? কিন্তু একটা নিকৃষ্ট দানবের তুচ্ছ মৃত্যু দিয়ে কি বাঘার মতো মহান জীবের মহিমময় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া যায়? আমার বাঘা যে অতুলনীয়!

বাঘা প্রাণ দিলে আমার জন্যেই, কিন্তু তার দিকে আর ফিরে তাকাবারও সময় নেই। দিকে দিকে ছুটন্ত পদশব্দ ক্রমেই নিকটস্থ! আবার একটা বর্শাদণ্ড সোঁ করে আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে গেল।

—'চলে এসো কুমার, চলে এসো!' বিমল ছুটল—আমিও তার পিছনে পিছনে!

সবাই মিলে গহ্বরের পিছন দিকে গিয়ে বন্দুক তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলুম—সকলের দেখাদেখি আমিও যন্ত্রচালিতের মতো বন্দুক ধরলুম বটে, কিন্তু আমার শোকাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত মনে তখন আত্মরক্ষার কোনও ইচ্ছাই ছিল না।

ওদিকে সেই মৃতের জগতেও নিদ্রাছুটানো কর্ণভেদী হুঙ্কারের ধুন্ধুমার একেবারে কাছে এসে পড়ল এবং সেইসঙ্গে শোনা যেতে লাগল শত শত ধাবমান এলোমেলো পায়ের শব্দ—ধুপধাপ ধুপধাপ!

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'গহ্বরের মুখে কারুকে দেখলেই গুলি চালাবে!'

প্রথমেই আবির্ভূত হল তিনটে উন্মত্তের মতো তাণ্ডবে মত্ত দানব-মূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছয়টা বন্দুকের এককালীন অগ্নিবৃষ্টির চোটে তারা ভূতলশায়ী হল গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো!

কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধগুলো তবু দমল না—বোধ করি কার্য ও কারণ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদের মতো তীক্ষ্ণ ছিল না, কারণ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তারা বেপরোয়া পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বারংবার! আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও বিশ্রামলাভের অবকাশ পেলে না—অক্ষত, তেরিয়ান হানাদারদের ক্রুদ্ধ ও স্পর্ধিত হই-হই রবে, আহতদের পাশবিক আর্তনাদে এবং বন্দুকের অশ্রান্ত গর্জনে কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম! একে সেই কুয়াশামাখা মেঘমলিন দিনের আলো ছিল রীতিমতো অস্পষ্ট, তার উপরে অবিরাম অগ্নিবর্ষণের ফলে বারুদের ধূম্রকুণ্ডলী নিবিড়তর হয়ে বেরিয়ে যাবার পথে গহ্বরের মুখটা এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে দিলে যে, শত্রুদের কারুকেই আর চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু তবু আমরা অন্ধের মতো বর্ষণ করতে লাগলুম বুলেটের পরে বুলেট—আমাদের অস্ত্র তখন কেবল শব্দভেদী!

এমন হুলুস্থূলুকাণ্ড আরও কতক্ষণ চলত জানি না, কিন্তু আচম্বিতে দানবদের চিৎকার হয়ে উঠল অত্যন্ত আতঙ্কিত! শত শত পায়ের শব্দ গহ্বরের মুখ থেকে সরে যেতে লাগল ত্বরিত-গতিতে—আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, দানবগুলো কি অবশেষে প্রাণের ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হল?

অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল, তারা প্রাণভয়ে সত্যসত্যই পলায়ন করেছে বটে, তবে আমাদের জন্যে নয়!

চারিদিক গমগম করতে লাগল আর এক অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর শব্দ বিভীষিকায়! যেন সংখ্যায় অসংখ্য কোনও অজানা ভয়ংকরের দল উপত্যকার উপরে গুরু গুরু মস্ত মস্ত দুরমুশ আছড়াতে আছড়াতে ধেয়ে আর ধেয়ে আসছে পাহাড় কাঁপিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ, তীক্ষ্ণ শব্দে শিঙা বাজিয়ে!

প্রথমটা আমরা হতভম্ব হয়ে গেলুম।

তারপর রোলাঁ বলে উঠলেন, 'ও যে হাতির বৃংহিত!'

বিনয়বাবু বললেন, ‘একটা-দুটো নয়, অনেক হাতির চিৎকার!’

—‘ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! শুনেছেন তো, এই পাহাড়ের বাঁশবন হচ্ছে হাতিদের চরবার জায়গা—তারা বাঁশপাতা খেতে ভারী ভালোবাসে। আজও তারা এখানে চরতে এসেছিল। হাতিরা সহজেই খেপে যায়, আচমকা একটা পটকার শব্দও তারা সহ্য করতে পারে না। আজ হঠাৎ তাদের নির্জন, নিরুপদ্রব চারণভূমি কামা মুনটুদের বিজাতীয় তর্জন-গর্জনে আর আমাদের বন্দুকগুলোর দুমদাম শব্দে অশান্তিময় হয়ে ওঠাতে তারা একেবারে খেপে গিয়ে দল বেঁধে তেড়ে এসেছে। এখন তাদের সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই!’

গহ্বরের মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল কুণ্ডলিত ধোঁয়ার যবনিকা। দানবদের কোনও সাড়াশব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু গহ্বরের ভিতরে বসে বসেই বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলুম এক বিস্ময়কর ও বিচিত্র বিপুলতার মিছিল! ঊর্ধ্বে প্রহারোদ্যত শুণ্ড তুলে উত্তেজিত মত্ত মাতঙ্গরা ক্রুদ্ধ বৃংহিত ধ্বনি করতে করতে ধেয়ে চলেছে—হাতিরা যে এত বেগে ছুটতে পারে, তাদের নাদুসনুদুস ভারী দেহগুলো দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব!

তারপর মিছিল ফুরুল। সমস্ত গণ্ডগোল থেমেথুমে গেল। বাইরের মেঘ ও কুয়াশার সঙ্গে মিলল দিনান্তকালের ম্লানিমা।

তবু এত শীঘ্র বাইরে বেরুবার ভরসা হল না। কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই। সবাই বোধকরি ভাবছে বাঘার কথা।

না ভেবে উপায় কী! বাঘাকে আমরা তো পশুর মতন দেখতুম না, সে ছিল আমাদের পরিবারেরই একজন—আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, সুখ-দুঃখের সাথির মতো।

সেই প্রথম যৌবনে আসামে রূপনাথের গুহায় আমরা যেদিন যকের ধন আনতে গিয়েছিলুম, বাঘারও অ্যাডভেঞ্চার আরম্ভ তখন থেকেই। তারপর সে আমাদের সঙ্গে ভারতে আর ভারতের বাইরে কত না দেশেই (এমনকি পৃথিবীর বাইরেও) কত না জায়গায় গিয়েছে, কতবার মানুষের মতোই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছে, বারে বারে আমাদের কত সাংঘাতিক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, আমাদের বিভিন্ন অভিযানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন সেসব বিচিত্র কাহিনি!

এতদিন পরে সেই বাঘা আমার জীবনরক্ষার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিলে—মৃত্যু তার বীরের মতো! আজ তার শেষ অ্যাডভেঞ্চার!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠলুম—দূর থেকে জলদ গর্জনের মতো ভেসে এল আগ্নেয়াস্ত্রের একটানা গর্জন! একসঙ্গে বহু বন্দুকের বিস্ফোরণ—কোথায় যেন কারা তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে!

আমরা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম, প্রত্যেকেরই চক্ষে একই প্রশ্ন—এ আবার কী?

দ্রুতপদে সকলেই গহ্বরের অন্ধকার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। সেখানেও বেলাশেষে আলোকের অভাব এবং মেঘাস্পদ আকাশে আরও জমে উঠেছে মেঘের ঘটা। ক্ষণে ক্ষণে

বিদ্যুতের জ্বলজ্বলে হিজিবিজির সঙ্গে ঘন ঘন বেজে বেজে উঠছে বজ্রের মেঘমল্লার, এবং বাতাস ক্রমেই হয়ে উঠছে অধিকতর প্রদৃপ্ত ও তুহিনশীতল। ঝড়বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ।

তখনও সমান ভাবে শব্দিত হচ্ছে অজ্ঞাত হস্তে পরিচালিত বন্দুকগুলো—ধ্রুম্ ধ্রুম্ ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম্...

বিনয়বাবু বললেন, 'কারা বন্দুক ছোড়ে? কোথা থেকে ছোড়ে? কেন ছোড়ে?'

গুহামুখের দৃশ্য ভয়াবহ। দানবদের যে মৃতদেহগুলো সেখানে ছিল ভূতলশায়ী, বৃহৎ হস্তীযূথের পদমর্দিত হয়ে সেগুলো এখন পরিণত হয়েছে তালগোল-পাকানো আকারহীন, [illegible], বীভৎস মাংসপিণ্ডে! এবং তারই মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে হতভাগ্য [illegible] দেহাবশেষ! সে দৃশ্য সহ্য করা যায় না।

দুইদিকে পাহাড়ের উচ্চ দেওয়াল। উপত্যকার ভিতরে নেই জনপ্রাণী—পাখিরাও বাসায় ফিরে গিয়েছে।

[illegible] ঢালু গা বেয়ে ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বিমল বললে, '[illegible] কুমার, টঙে না চড়লে কিছুই দেখা যাবে না। আর সবাই নীচেই থাক।'

[illegible] কষ্টে কোনওমতে প্রায় আশি-নব্বই হাত উপরে যেতেই চোখে জাগল বিদায়ী [illegible] পৃথিবীর গাঢ়ছায়াচ্ছন্ন প্রায় অদৃশ্য দৃশ্য!

[illegible] থেমে গিয়েছে বন্দুকের শব্দ। কেবল অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার-[illegible] একটা ধু ধু অগ্নিকাণ্ডের দাউ দাউ শিখা!

'[illegible], কুমার, ওইখানেই আমাদের ছাউনি থাকবার কথা!'

—[illegible] কি আগুন লেগেছে আমাদের তাঁবুগুলোয়?'

'[illegible]নি লাগেনি, নিশ্চয় আগুন কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ হচ্ছিল ওইখানেই—[illegible] বিদ্রোহীদের সঙ্গে!'

—[illegible]মার কি বিশ্বাস, বিদ্রোহীরা আবার আমাদের সন্ধান পেয়েছে?'

—'তা ছাড়া আর কী? বন্দুক গর্জনের ঘটাটা শুনলে না? দস্তুরমতো যুদ্ধ। দু-পক্ষই [illegible]। আমাদের দল ভারী নয়, হেরেছে তারাই। তারপর বিদ্রোহীরা লুটপাট করে আমাদের [illegible] আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো তারা এখন আমাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

তারপরেই গড় গড়, ঝন ঝন, ঝম ঝম—আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! এতক্ষণ ধরে [illegible]তে মিলে যে একটা কোনও অঘটন ঘটাবার জন্যে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করছিল, সেটা আমরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু এমন দুর্দান্ত দুর্যোগ ছিল আমাদের [illegible]নাতীত। পড়ে গেলুম যেন খণ্ডপ্রলয়ের আবর্তে—বজ্রবিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ঝড়, শিলাপাত ও [illegible]কার একসঙ্গে যোগ দিয়ে পৃথিবীকে করে তুললে অমানুষের নরকধাম! অতবড়ো শিলার আকার আর বৃষ্টির ফোঁটা আগে কখনও দেখিনি এবং ঝড়ের তোড়ে দেহ যেতে চায় উড়ে। চক্ষু প্রায় অন্ধ, সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত!'

[illegible] আজ উন্মত্ত? প্রকৃতির বিরাট পাগলা গারদে জেগেছে দুর্দম বিদ্রোহ?

—'এখানে থাকলে মারা পড়ব কুমার, পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও।'

—'পালিয়ে যাব কোথায়?'

—'আপাতত গহ্বরে।'

—'তারপর? আমরা যে নিরাশ্রয়?'

—'কে বলে আমরা নিরাশ্রয়? আমাদের আশ্রয় যে বিপুল ধরণী! মনে নেই, বিশ্বকবি বলেছেন—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'?'

অবশেষ

আর বেশি কিছু বলবার নেই।

বিমলের অনুমান সঠিক! আমাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল মউ মউ বিদ্রোহীরা। কুলিরা আগেই পালায়। কিছুক্ষণ লড়াই করে সেপাইরাও পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। আহত কামাথি কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে।

বাঘার মতো রোলাঁরও এই শেষ অ্যাডভেঞ্চার। ফেরবার পথে জঙ্গলে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরে। নাইরোবির হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েও ফল না পেয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। কলকাতায় এসে আমরা খবর পাই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কেবল বাঘা আর রোলাঁ নয়, আমাদেরও এই শেষ অ্যাডভেঞ্চার। বাঘা আমাদের মন ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

রামহরি বার বার বলে, 'বাঘার জন্যে দুঃখ করব না, সে তো বুড়ো হয়েছিল, আর দু-দিন পরে মরতই। বাঘার জন্যে দুঃখ করব না—সে পরের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, এ তো মরণের মতো মরণ! বাঘার জন্যে দুঃখ করব না, কিন্তু বাঘাকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে গো, থাকব কেমন করে?'

রামহরি কাঁদে আর চোখের জল মোছে। তারপর আবার কাঁদে। আমাদেরও চোখের পাতা ভিজে আসে।